सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গো শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

সমাজ বিজ্ঞান

ভারত এবং সমসাময়িক বিশ্ব

দশম শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

এন সী ই আর টী
NCERT

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার।

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ২০২০

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ইতিহাস
দশম শ্রেণির পাঠ্যবই
(এন সি ই আর টি-র India and the Contemporary World – II পাঠ্যবইয়ের ২০১৭ সালের অনূদিত সংস্করণ)

প্রকাশক : অধিকর্তা,
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

মূল্য : ১২৫ টাকা মাত্র

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
লক্ষ্মণ দেবনাথ (শিক্ষক)
রাণা বণিক

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহঅধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহঅধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর

পাঠ্যপুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন :

শ্রী দেবাশিস চৌধুরী, শিক্ষক

শ্রীমতী সুজাতা পাল, শিক্ষিকা

শ্রীমতী বিপাশা ব্যানার্জী, শিক্ষিকা

শ্রী সঞ্জীব দেব, শিক্ষক

শ্রী অম্লান দেব, শিক্ষক

শ্রী দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, শিক্ষক

ভাষা-পরিমার্জনায়

শ্রী প্রবুদ্ধ সুন্দর কর, শিক্ষক

শ্রী বিশ্বনাথ রায়, শিক্ষক

শ্রীমতী এমেলী নাগ, শিক্ষিকা

শ্রীমতী শুক্লা সিংহ, শিক্ষিকা

শ্রী গৌতম রুদ্র পাল, শিক্ষক

Foreword

The National Curriculum Framework (NCF) 2005 recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

NCERT appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the Advisory Group on Social Science, Professor Hari Vasudevan and the Chief Advisor for this book, Professor Neeladri Bhattacharya for guiding the work of this committee. Several teachers contributed

to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G. P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director

New Delhi — National Council of Educational

20 November 2006 — Research and Training

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks in Social Science for the Secondary Stage

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, Calcutta University, Kolkata

Chief Advisor

Neeladri Bhattacharya, *Professor,* Centre for Historical Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Chapter V)

Members

Brij Tankha, *Professor,* Department of East Asian Studies, University of Delhi (Chapter II)

G. Balachandran, *Professor,* Graduate Institute of International Studies, Geneva (Chapter IV)

Janaki Nair, *Professor,* Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata (Chapter VI)

Monica Juneja, *Professor,* Maria-Goeppert-Mayer Guest Professor, Historisches Seminar, University of Hanover, Germany (Chapter I)

P.K. Dutta, *Professor,* Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata (Chapter VIII)

Rashmi Paliwal, Eklavya, Hoshangabad

Rekha Krishnan, *Head of Senior School,* Vasant Valley School, New Delhi

Sekhar Bandyopadhyay, *Professor,* Faculty of Humanities and Social Sciences, Victoria University of Wellington, New Zealand (Chapter III)

Shukla Sanyal, *Reader,* Department of History, Calcutta University, Kolkata (Chapter I)

Tanika Sarkar, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Chapter VII)

Udaya Kumar, *Professor,* Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata (Chapter VIII)

Member-Coordinator

Kiran Devendra, *Professor,* Department of Elementary Education, NCERT, New Delhi

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

Acknowledgements

This book is the result of a collective effort of a large number of historians, teachers and educationists. Each chapter has been written, discussed and revised over many months. We would like to acknowledge all those who have participated in these discussions.

A large number of people have read chapters of the book and provided support. We thank in particular the members of the Monitoring Committee who commented on an earlier draft; Kumkum Roy suggested many changes in the text; G. Arunima, Gautam Bhadra, Supriya Chaudhuri, Jayanti Chattopadhyay, Sangeetha Raj, Sambuddha Sen, Lakshmi Subramaniam, A.R. Venkatachalapathy, T.R. Ramesh Bairy, C.S. Venkiteswaran and Sahana helped with Chapter VIII. Purushottam Agarwal helped write the sections on the Hindi novel. Ngun Quoc Anh translated Vietnamese texts for Chapter III.

Illustrating the book would have been impossible without the help of many institutions and individuals: the Library of Congress Prints and Photographs Division; Rabindra Bhawan Photo Archives, Viswabharati University, Shantiniketan; Photo Archives, American Embassy, New Delhi; Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi; National Manuscript Mission Library, New Delhi; Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata; Ashutosh Collection of the National Library, Kolkata; Roja Muthaiah Research Library Trust, Chennai; India Collection, India International Centre; Archives of Indian Labour, V.V. Giri National Institute of Labour, New Delhi; Photo Archives, University of West Indies, Trinidad. Jyotindra and Juta Jain allowed generous access to their vast collection of visual images now stored at the CIVIC Archives; Parthiv Shah provided several photographs from his collection. Prabhu Mohapatra supplied visuals of indentured labourers; Muzaffar Alam procured material from the Library of Chicago; Pratik Chakrabarty scanned images from the Kent University Library; Anish Vanaik and Parth Shil did photo research in New Delhi.

Shalini Advani did many rounds of editing with care and ensured that the texts were accessible to children. Shyama Warner's sharp eye picked up innumerable slips and lapses in the text. We thank them both for their total involvement in the project.

We have made every effort to acknowledge credits , but we apologise in advance for any omission that may have inadvertently taken place.

Credits

Photographs and pictures

We would like to acknowledge the following:

Institutions and Photo Archives

Archives of Indian Labour, V.V. Giri National Institute of Labour (V: 18, 19)

Ashutosh Collection of the National Library, Kolkata

Collection Jyotindra and Juta Jain, Civic Archives (III: 11, 13, 14; V: 25, 26a, 26b, 27; VII: 17)

Cultural Heritage Administration (CHA), Cheongju Early Printing Museum, Republic of Korea (VII: 155, 156)

Library of Congress Prints and Photography Division (IV: 20; VII: 40)

Manuscript Mission Collection (VII: 14, 15, 16)

Photo Archive, American Library, New Delhi (IV: 21, 23)

Photo Archives, University of West Indies, Trinidad (IV: 14, 15, 16)

Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting (images for Chapter III photographs)

Roja Muthaiah Research Library Trust, Chennai

Sahitya Akademi, Kolkata (many images for Chapter VIII)

Journals

The Illustrated London News (IV: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13; V: 4, 5, 6, 8, 12; VI: 2, 7, 9, 10, 11, 12)

Illustrated Times (V: 12)

Indian Charivari (VII: 18)

Graphic: (IV: 13)

Books

Breman, Jan and Parthiv Shah, *Working the Mill No More* (V: 21)

Chaudhuri, K.N., *Trade and Civilization in the Indian Ocean* (map in Chapter IV)

Dwivedi, Sharda and Rahul Mehrotra, *Bombay: The City Within* (III: 1; VI: 16, 18, 22)

Evenson, Norma, *The Indian Metropolis: A View Toward the West* (VI: 19, 20, 21, 23)

Goswami, B.N., *The Word is Sacred; Sacred is the Word* (VII: 14, 15, 16)

Hall, Peter, *Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century* (VI: 6)

Harvey, David, *Paris: Capital of Modernity* (VI: 15)

Jones, G.S., *Outcast London: A Study in the Relationship between Classes in Victorian Society* (VI: 13)

Karnow, Stanley, *Vietnam: A History* (III: 10, 11, 13, 15, 17, 20)

Ruhe, Peter, *Gandhi* (III: 2, 3, 5, 8)

Sennett, Richard, *Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilisation* (VI: 1, 14)

The Golden Shoe: Building Singapore's Financial District (VI: 24)

Introduction

We live in a world where the existence of nations is taken for granted. We see people as belonging to nations and having a nationality, and we assume that this sense of belonging has existed from time immemorial. We consider countries as the same as nations, and use the two terms as synonyms, making little distinction between them. We think of countries as unified entities, each with a demarcated international boundary, a defined territory, a national language, and a central government.

Yet if we were to travel in a time capsule to the mid-eighteenth century and look for nations as we know them today, we would not find them. If we were to ask people about their nationality, about their national identity, they would not understand our questions. For at that time, nations did not exist in their modern form. People lived within kingdoms, small states, principalities, chiefdoms and duchies, not within nations. As Eric Hobsbawm, a famous historian, once said, the most remarkable fact about the modern nation is its modernity. The history of its existence is no more than 250 years old.

How did the modern nation come into being? How did people begin to see themselves as belonging to a nation?

The sense of belonging to a nation developed only over a period of time. The first three chapters (in Section I) of this book will trace this history. You will see how the idea of nationalism emerged in Europe, how territories were unified, and national governments formed. It was a process that took many decades, involved many wars and revolutions, many ideological battles and political conflicts. From a discussion of Europe (Chapter I) we will shift our focus to the growth of nationalism in Indo-China and India. In both these regions, nationalism was shaped by the experience of colonialism and the anti-imperialist movement. But the national movements in these countries took on forms that were also widely different. Chapters II and III will help you understand how nationalism in colonial countries can develop in a variety of ways, glorify contrasting ideals, and be linked to different modes of struggle.

The story of nationalism in these chapters will move at several levels. You will of course read about great leaders like Giuseppe Mazzini, Ho Chi Minh and Mahatma Gandhi. But we cannot understand nationalism only by knowing about the words and deeds of important leaders, and the big and dramatic events they led and participated in. We have to also look at the aspirations and activities of ordinary people, see how nationalism is expressed in small events of everyday life, and shaped by a variety of seemingly dissimilar and unrelated social movements. To understand how nationalism spreads, we need to know not only what the leaders said, but also how their words were understood and interpreted by people. If we are to think about how people begin to identify with a nation, we must see not only the political events that are critical to the process, but also how nationalist sensibilities are nurtured by artists and writers, and through art and literature, songs and tales.

In Section II, we will shift our focus to economies and livelihoods. Last year you read about those social groups – pastoralists, forest dwellers and peasants – who are often seen as survivors from past times when in fact they are very much part of the modern world we live in. This year we will focus on developments that are seen as symbolising

modernity – globalisation, industrialisation, urbanisation – and see the many sides of the history of these developments.

In Chapter IV you will see how the global world has emerged out of a long and complicated history. From ancient times, pilgrims, traders, travelers have traversed distances, carrying goods, information and skills, linking societies in ways that often had contradictory consequences. Items of food and species of plants spread from one region to another, transferring information and taste, as well as disease and death. As Western powers carried the flag of 'civilisation' deep into different parts of Africa, precious metals and slaves were taken away to Europe and America. When coffee and sugar were grown in the Caribbean plantations for the world market, an oppressive system of indentured labour came into being in India and China to supply workers for the plantations.

Chapter VI similarly will look at the many sides of the development of cities as they have come up in different parts of the world. Enchanted by the growth of cities, visitors to big cities could often see only the bridges and buildings, the roads and new modes of transport, and the array of glittering shops selling diverse goods. Cities seem to be places where trade and industries expand, people come in search of work and opportunities of employment open up. While looking at this history of growth, however, we should not forget the lives of those who do not find any job, or those who survive by vending and hawking on the streets, living in makeshift shelters or crowded tenements. Chapter VI tries to capture the many contrasting experiences of the city.

Section III will introduce you to the histories of print culture and the novel. Surrounded by things that appear in print, we might find it difficult today to imagine a time when printing was still unknown. Chapter VII will trace how the history of the contemporary world is intimately connected with the growth of print. You will see how printing made possible the spread of information and ideas, debates and discussions, advertising and propaganda, and a variety of new forms of literature. The novel, for instance, could become popular only because it could be printed and sold in large numbers. As novels were widely read, they began to influence the minds of people, shape identities and behaviour, and became connected to the culture and politics of the time. We often do not realise how our attitudes to the world are moulded by the literature we read.

When we discuss such themes of everyday life, we begin to see how history can help us reflect on even the seemingly ordinary things in the world.

Like the history book you read last year, *India and the Contemporary World II*, has eight chapters divided into three sections. You are *required* to read only five chapters: two each from Sections I and II, and one from Section III.

NEELADRI BHATTACHARYA
Chief Advisor – History

সূচিপত্র

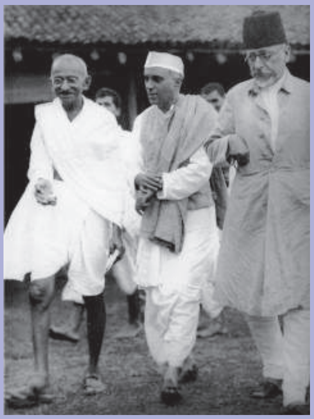

ভাগ I: ঘটনাবলি ও প্রক্রিয়াসমূহ

I. ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব 3

II. ইন্দোচিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 29

III. ভারতে জাতীয়তাবাদ 53

ভাগ II: জীবিকা, অর্থনীতি এবং সমাজ

IV. ভূমণ্ডলীয় বিশ্বের সৃষ্টি 77

V. শিল্পায়নের যুগ 103

VI. কাজকর্ম, জীবনযাত্রা ও বিশ্রাম 127

ভাগ III: প্রাত্যহিক জীবন, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি

VII. মুদ্রণ সংস্কৃতি এবং আধুনিক পৃথিবী 153

VIII. উপন্যাস, সমাজ এবং ইতিহাস 177

ভাগ I

ঘটনাবলি ও প্রক্রিয়াসমূহ

ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

(The Rise of Nationalism in Europe)

চিত্র 1 — ফ্রেডারিক সরোঁ (Frédéric Sorrieu) কর্তৃক চিত্রিত বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ও সমাজিক স্বপ্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চুক্তি, 1848.

1848 খ্রিস্টাব্দে, ফ্রেডারিক সরোঁ নামে একজন ফরাসি চিত্রকার চারটি চিত্র অঙ্কন করেন। এই চিত্রগুলোতে শিল্পীর একটি স্বপ্নের প্রতিফলন প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এটিকে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক প্রজাতন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করেছেন। প্রথম ছবিটির (চিত্র নং 1) বিষয়বস্তু ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রী পুরুষসহ সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষ একটি দীর্ঘ মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীকের (স্ট্যাচু অব লিবার্টির) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এগিয়ে যাচ্ছিল। তোমাদের হয়তো মনে থাকবে যে, ফরাসি বিপ্লবের সময়কার শিল্পীরা স্বাধীনতাকে একটি নারীর প্রতীকরূপে কল্পনা করেছিল। এখানে উক্ত নারীর একহাতে ছিল আলোকিত মশাল এবং অন্য হাতে ছিল মানুষের অধিকারের সামগ্রিক সনদ। এই মূর্তির সামনের অংশের মাটিতে কতগুলো চূর্ণবিচূর্ণ ভগ্নাবশেষ ছিল যেগুলোকে সার্বভৌমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতীকরূপে দেখানো হয়েছে। সঁরোর কাল্পনিক চিন্তাধারায় (Utopian) সারা পৃথিবীর লোকেরা সুনির্দিষ্ট জাতি হিসেবে বিভাজিত

নতুন শব্দ

Absolute – স্বৈরতান্ত্রিক : বস্তুতপক্ষে এমন একটি সরকার অথবা শাসনব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ইতিহাসে রাজতান্ত্রিক সরকার বলতে এমন একটি সরকারকে বোঝানো হয়েছে যা ছিল কেন্দ্রীভূত, সামরিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল এবং দমনমূলক।

কার্যাবলি

এমন এক আদর্শপূর্ণ সমাজের কল্পনা যার কোনো বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই।

ছিল যাদের চিহ্নিত করা হত তাদের পতাকা এবং তাদের জাতীয় পোশাক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীকের অনেক আগেই আমেরিকা এবং সুইজারল্যান্ড জাতি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল যারা এই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিল। বৈপ্লবিক ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দ্বারা পরিচিত ফ্রান্স তখন সবেমাত্র মূর্তির কাছে পৌঁছেছিল। এর ঠিক পেছনেই ছিল কালো, লাল এবং স্বর্ণালী পতাকা বহনকারী জার্মানির লোকেরা। মজার ব্যাপার হল, সরোঁ যখন এই ছবিটি অঙ্কণ করেছিলেন তখনো ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে জার্মানিদের অস্তিত্ব ছিল না। তারা যে পতাকা বহন করেছিল সেটি ছিল ১৮৪৮ এ গণতান্ত্রিক সংবিধানের আওতায় জার্মান ভাষাভাষী লোকদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি রাষ্ট্রে পরিণত করার উদারবাদী প্রত্যাশার অভিব্যক্তি মাত্র। জার্মান জাতির পরেই রয়েছে অস্ট্রিয়া, সিসিলির দুটি রাজ্য, লম্বার্ডি, পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং রাশিয়ার জনসাধারণ।

এই অধ্যায়ে সরোঁ দ্বারা চিত্রিত 1 নং চিত্রের অনেক কাল্পনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ এমন একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল যা ইউরোপের রাজনৈতিক ও মনন জগতে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তনের সর্বশেষ পরিণতি ছিল ইউরোপের বহু রাষ্ট্রীয় বংশের সাম্রাজ্যের পরিবর্তে এক জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব। ইউরোপে দীর্ঘকাল আগে থেকেই এমন একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম নেয় যেখানে কেন্দ্রীয় শক্তি নির্দিষ্ট একটি ভূ-খণ্ডের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করত। কিন্তু একটি জাতি-রাষ্ট্রে কেবলমাত্র তার শাসকরাই নয় বরং অধিকাংশ নাগরিকের সাধারণ পরিচয় এবং ইতিহাস অথবা বংশ সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। এই ধারণা সুদূর অতীত থেকে ছিল না, এটি গড়ে উঠেছিল সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এবং নেতাদের ও সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। এই অধ্যায়ে সেইসব বিবিধ প্রক্রিয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে যার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ জাতি রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

উৎস - ক

আর্নেস্ট রেনান এর মতে জাতি কী ?

1882 সালে ফরাসি দার্শনিক আর্নেস্ট রেনান (১৮২৩-৯২) সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে জাতির রূপরেখা তুলে ধরেন। পরবর্তী সময়ে এই ভাষণটি 'Qu'est-ce qu'une nation?' (অর্থাৎ জাতি কি?) নামক প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয় এবং সুখ্যাতি লাভ করে। এই প্রবন্ধে রেনান রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্যদের প্রস্তাবিত এই ধারণার সমালোচনা করেন যে, একই ভাষা, বর্ণ, ধর্ম বা অঞ্চলের ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে ওঠে।

অতীতের সুদীর্ঘ প্রয়াস, ত্যাগ এবং নিষ্ঠার সমন্বয়েই একটি জাতি চূড়ান্ত রূপ পায়। বীরত্বপূর্ণ অতীত, মহৎ ব্যাক্তিবর্গ এবং গৌরব হল সেইসব সামাজিক পুঁজি যার উপর ভিত্তি করে একটি জাতির ধারণা তৈরি হয়। একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠার প্রয়োজনীয় শর্তাবলি হল অতীতের একই রকম গৌরব, বর্তমানে কাজ করার একই রকম ইচ্ছা, সম্মিলিতভাবে কর্ম সম্পাদন, ভবিষ্যতে সম্মিলিতভাবে আরও কাজ করার ইচ্ছা। তাই জাতি হল পারস্পরিক সংহতির ধারণা .... যার অস্তিত্ব প্রতিদিন জনমত সংগ্রহের (**plebiscite**) মত ... একটি অঞ্চলের পরিচয় তার অধিবাসীরা; অঞ্চল সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার শুধু ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদেরই রয়েছে। কোনো দেশকে অধিকার করা কিংবা কোনো দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আধিপত্য বজায় রাখা একটি জাতির আসল উদ্দেশ্য হতে পারে না। জাতির অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষন এবং তা প্রয়োজনীয়ও। জাতির অস্তিত্ব স্বাধীনতার অঙ্গিকার এবং এই স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে যদি পৃথিবীতে একটিমাত্র আইন এবং একটিমাত্র প্রভুর অস্তিত্ব থাকে।

নতুন শব্দ

Plebiscite – (গণভোট) একটি প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার যার মাধ্যমে একটি অঞ্চলের সকল লোককে একটি প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে বলা হয়।

আলোচনা কর :

একটি জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রেনানের মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা করো। তাঁর মতে জাতি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ?

1 ফরাসি বিপ্লব ও রাষ্ট্রের ধারনা :

1789 সালে ফরাসি বিপ্লবের পর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। তোমাদের হয়তো মনে আছে, 1789 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে সম্পূর্ণভাবে রাজার আধিপত্য ছিল। ফরাসি বিপ্লবের ফলে যে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিবর্তন এসেছিল তার ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার কাছ থেকে ফরাসি নাগরিকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ফরাসি বিপ্লব ঘোষণা করেছিল যে, এখন সাধারণ মানুষ জাতি গঠন করবে এবং তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরা রচনা করবে।

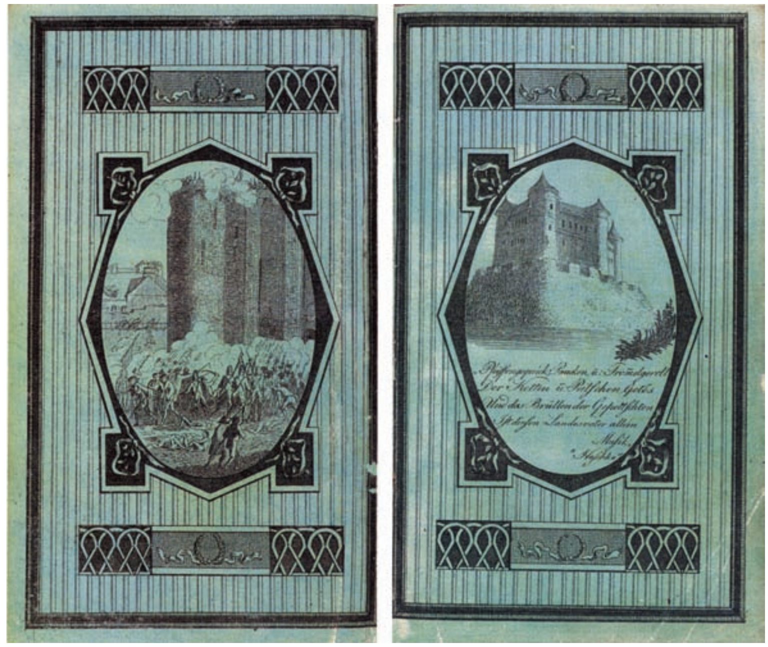

চিত্র 2 — 1798 সালে সাংবাদিক আন্দ্রেস রেবম্যান দ্বারা পরিকল্পিত জার্মান বর্ষপঞ্জির আবরণ
ফ্রান্সে বাস্তিল বিপ্লবী দুর্গে বিপ্লবী জনতার প্রবেশের চিত্রকে বাস্তিল দুর্গের অনুরূপ একটি দুর্গের সামনে অঙ্কণ করা হয়েছে। এই দুর্গ জার্মানির ক্যাসেল প্রদেশে স্বৈরাচারী শাসনের পরিচয় বহন করে। এই চিত্রের সাথে একটি বাণী ও লেখা হয়েছে "মানুষকে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা নিজেদের মুঠোয় নিয়ে আসা উচিৎ।" রেবম্যান মেঁজ (Mainz) জার্মান জ্যাকোবিন দলের সদস্য ছিলেন।

শুরু থেকেই, ফরাসি বিপ্লবীরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যা ফ্রান্সের মানুষদের মনে সমষ্টিগত পরিচয়ের ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে। পিতৃভূমি (*la patrie*) এবং নাগরিক (*le citoyen*) এর ধারণাগুলো একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের ধারণার উপর জোর দিয়েছিল যাতে একটি সংবিধানের অধীনে সবাই সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। একটি নতুন ফরাসি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা সাবেকিয় রাজদণ্ডের স্থলে প্রতিস্থাপন করার জন্য নির্বাচিত করা হয়। এস্টেট জেনারেলের সদস্যরা সক্রিয় নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং এর নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় পরিষদ' করা হয়। নতুন স্তুতি রচনা করা হয়েছিল, নতুন শপথ নেওয়া হয়েছিল। শহিদদের একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা হয় যেটি তার এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন প্রণয়ন করে। অভ্যন্তরীণ আমদানি রপ্তানি শুল্ক পদ্ধতি তুলে দেওয়া হয় এবং ওজন মাপার একটি অভিন্ন ব্যবস্থা চালু করা হয়। আঞ্চলিক উপভাষাগুলোকে কম গুরত্ব দেওয়া হয় এবং যেহেতু প্যারিসে কথ্য এবং লেখ্য ভাষা হিসেবে ফরাসি ভাষা ব্যবহৃত হত সেহেতু ফরাসি ভাষা জাতীয় ভাষায় পরিণত হয়।

বিপ্লবীরা এটাও ঘোষণা করেছিল যে, ফরাসি জাতির লক্ষ্য এবং ভবিতব্য ছিল ইউরোপের জনগণকে স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্ত করা। অন্যভাবে বলা যায় ফ্রান্স ইউরোপের অন্যান্য জনগণকে রাষ্ট্রগঠন করতে সাহায্য করবে।

ফ্রান্সের ঘটনাবলির খবর যখন ইউরোপের অন্যান্য শহরে পৌঁছায় তখন ছাত্র এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্য সদস্যরা জ্যাকোবিন ক্লাব গঠন করতে শুরু করে। তাদের কার্যক্রম ও প্রচারাভিযানগুলো সেইসব ফরাসি সৈন্যদের জন্য পথ তৈরি করেছিল যারা 1790 এর দশকে হল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড এবং ইতালির বৃহৎ এলাকায় পৌঁছেছিল। বিপ্লব শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ফরাসি সৈন্যরা বিদেশে জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার করতে শুরু করেছিল।

চিত্র 3 — 1815 খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসের পরবর্তীকালের ইউরোপ

যে বিশাল অঞ্চল নেপোলিয়ানের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল সেখানে তিনি এমন অনেক সংস্কারের সূচনা করেছিলেন যেগুলো ফ্রান্সে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে এনে নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি সমগ্র ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকরী করার জন্য বিপ্লবী নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 1804 খ্রিস্টাব্দের নাগরিক সংহিতা সাধারণত নেপোলিয়ন সংহিতা নামে পরিচিত। এটি জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধার সমাপ্তি ঘোষণা করে, নেপোলিয়ন সংহিতা আইনের সমতা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত করে। ফরাসি নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে ও এই সংহিতা চালু করা হয়েছিল। নেপোলিয়ন ডাচ প্রজাতন্ত্র, সুইজারল্যান্ড, ইতালি এবং জার্মানির প্রশাসনিক বিভাগকে সরলীকরণ করেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করেন এবং কৃষকদের ভূমিদাস প্রথা এবং ঋণ থেকে মুক্ত করেন। শহরেও সমবায় সংঘের নিয়ন্ত্রণ লোপ করা হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা হয়। কৃষক, কারিগর, শ্রমিক এবং

চিত্র 4 — জার্মানির জেব্রুকেন এ স্বাধীনতার বৃক্ষ রোপন :
জার্মান চিত্রশিল্পী কার্লকেস্পার ফ্রিটসের আঁকা এই রঙিন ছবির বিষয় হল ফরাসি সেনাদের দ্বারা জিব্রুকেন শহর দখল। ফরাসি সৈন্যরা নীল, সাদা এবং লাল পোশাকের দ্বারা পরিচিত ছিল এবং তাদের অত্যাচারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। যারা কৃষকদের গোরুর গাড়ি (বাঁদিকে) ছিনতাই করে কয়েকজন যুবতি মহিলাকে বিরক্ত করছিল এবং একজন কৃষককে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছিল। স্বাধীনতার বৃক্ষের ওপর জার্মান ভাষায় লেখা একটি ফলক লাগানো আছে যার অনুবাদ হল : 'আমাদের থেকে স্বাধীনতা ও সমতা গ্রহণ কর — এটি মানবতার একটি আদর্শ রূপ।' এটি এই দাবিকে ব্যঙ্গ করত যে, তারা যে অঞ্চলে যেত সেখানে রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে মুক্তিদাতা হয়ে যেত। এই ফলকের লেখাগুলো ফরাসিদের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে।

নতুন ব্যবসায়ীরা নতুনভাবে প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে লাগল। ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে ছোটো ছোটো পন্য উৎপাদকরা বুঝতে পেরেছিল যে, অভিন্ন আইন, সঠিক মান সম্মত ওজন ব্যবস্থা এবং একটি সাধারণ জাতীয় মুদ্রা চালু হলে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পণ্য পরিবহন করা সহজসাধ্য হবে।

যাইহোক, বিজিত অঞ্চলের স্থানীয় জনগণ ফরাসি শাসনের প্রতি মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। প্রথম দিকে হল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ডের মতো অনেক জায়গায় এবং ব্রাসেলস্ মেঁনজ, মিলান এবং ওয়ারসর মতো কিছু শহরে ফরাসি সৈন্যবাহিনীকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাগত জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রথমদিকের এই উৎসাহ শীঘ্রই শত্রুতায় পরিণত হল, যখন এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক স্বাধীনতার অনুরূপ ছিল না। অবশিষ্ট ইউরোপ জয় করার জন্য বর্ধিত কর, নাগরিক জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ (censorship) জোর করে ফরাসি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা এসব কিছুর ফলে প্রশাসনিক সুবিধা লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হতে দেখা যায়।

চিত্র 5 — রাইনল্যাণ্ডের দূত লাইপজিগ থেকে ফিরে আসার পথে সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছিল।
এখানে নেপোলিয়ানকে 1813 খ্রিস্টাব্দে লাইপজিগের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার পথে একজন পত্রবাহক হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁর ঝুলি থেকে পরে যাওয়া প্রতিটি চিঠিতে সেইসব অঞ্চলের নাম লেখা আছে যে অঞ্চলগুলোতে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন।

2 ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব :

তোমরা যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের মানচিত্র দেখ তাহলে দেখতে পাবে যে সেখানে আজকের মতো কোনো 'জাতি-রাষ্ট্র' ছিল না।

আজকের দিনে যেসব দেশকে আমরা জার্মানি, ইতালি এবং সুইজারল্যান্ড হিসেবে জানি সেই দেশগুলো তখন ডাচ, কেন্টন রাজতন্ত্রের মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং সেই সব শাসকদের স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল ছিল, পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অধীনে ছিল এবং সেইসব অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির লোকেরা বসবাস করত। তারা নিজেদের একটি যৌথ পরিচয় দিতে বা একটি সাধারণ সংস্কৃতির অংশীদার হিসেবে স্বীকার করত না। তারা প্রায়শই, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত এবং তারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সদস্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ছিল হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের অধীনে যেটি বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে জুড়ে তৈরি হয়েছিল। এতে আল্পস অঞ্চলের টিরোল, অস্ট্রিয়া এবং সুদেতান অঞ্চলের পাশাপাশি বোহেমিয়া অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানকার অভিজাতরা প্রধানত জার্মান ভাষায় কথা বলত। হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যে লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়ার মতো ইটালীয় ভাষাভাষী প্রদেশ ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাঙ্গেরির অর্ধেক জনগোষ্ঠী মেগার ভাষায় কথা বলত এবং বাকি অর্ধেক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলত। গ্যালিসিয়ার অভিজাতরা পোলিশ ভাষায় কথা বলত। এই তিনটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছাড়া হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের সীমানার ভেতর কৃষক শ্রেণির লোকেরা বসবাস করত - যেমন উত্তরে বোহেমিয়ান এবং স্লোভাক, কার্নিওলাতে স্লোভেস, দক্ষিণে কোয়েট এবং পূর্বদিকে ট্রান্সসিলভানিয়ায় বসবাসকারী রোমান জনগোষ্ঠী। এই ভিন্নতা রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণাকে খুব সহজে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি, এই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে একসূত্রে গাঁথার একমাত্র উপায় ছিল, সম্রাটের প্রতি সবার আনুগত্য প্রদর্শন।

জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল?

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

১৭৯৭
নেপোলিয়ান ইটালি আক্রমণ করেন। নেপোলিওনিক যুদ্ধ শুরু।

১৮১৪-১৮১৫
নেপোলিয়ানের পতন, ভিয়েনা শান্তি চুক্তি।

১৮২১
গ্রিকরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে।

১৮৪৮
ইউরোপে বিপ্লব : অর্থনৈতিক কষ্টের সম্মুখীন হয়ে কারিগর, শিল্প শ্রমিকরাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা সংবিধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি জানাতে শুরু করে। ইটালীয়, জার্মান, ম্যাগার, পোলিস, চেক প্রমুখ জাতি 'জাতি-রাষ্ট্র' গঠনের দাবি জানায়।

১৮৫৯-১৮৭০
ইটালির ঐক্যসাধন

১৮৬৬-১৮৭১
জার্মানির ঐক্যসাধন

১৯০৫
স্লাভ জাতীয়তাবাদ হ্যাবসবার্গ ও অটোমান সাম্রাজ্যের শক্তি সংগ্রহ করে।

2.1 অভিজাত শ্রেণি এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি

সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে জমির মালিক ছিল অভিজাত সম্প্রদায়, যারা ইউরোপ মহাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী শ্রেণি ছিল। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা একটি সাধারণ জীবনশৈলীর দ্বারা ঐক্যবদ্ধ, যা আঞ্চলিক বিভাজনকে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত করেছিল। তারা গ্রামীণ অঞ্চলে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল এবং শহরে তাদের প্রাসাদ ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং উচ্চ সমাজের মধ্যে তারা ফরাসি ভাষায় কথা বলত। তাদের পরিবার প্রায়শই নিজেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত। তবে এই প্রভাবশালী অভিজাতরা সংখ্যাগত দিক দিয়ে খুবই নগণ্য ছিল। জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষক। পশ্চিমাঞ্চলে বেশির ভাগ জমিতে ভাড়াটে কৃষক এবং ছোটো ছোটো জমির মালিকরা চাষ করত। অন্যদিকে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে জমিগুলো বড়ো বড়ো জমিদারদের মালিকানায় ছিল যেগুলোতে ভূমি দাসরা চাষ করত।

পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে বিভিন্ন অংশে শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে শহরের বিকাশ এবং বণিক শ্রেণির উত্থান হয়েছিল যার অস্তিত্ব নির্ভর করত বাজারের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্স এবং জার্মানির কিছু কিছু অঞ্চলে তা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর ফলে নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণির উৎপত্তি হয় : শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলো শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং পেশাদারদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে এই গোষ্ঠীগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত সংখ্যায় ছিল খুবই নগণ্য। অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সুবিধা বিলুপ্তির পর শিক্ষিত ও উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

2.2 উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়?

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের জাতীয় ঐক্যের ধারণা উদারনৈতিক মতাদর্শের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। *উদারনীতি* (*liberalism*) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'liber' থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে মুক্ত (free)। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের কাছে 'উদারনীতি'র অর্থ ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সমতা। রাজনৈতিকভাবে, উদারনীতিবাদ এমন একটি সরকার গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল যা জনগণের সম্মতির উপর নির্ভর করে গঠিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের পর উদারনীতিবাদ বলতে বোঝায় সংসদের মাধ্যমে সংবিধান ও প্রতিনিধিমূলক সরকার দ্বারা স্বৈরাচারী শাসক ও পাদরিদের বিশেষ অধিকারের অবসান। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে উদারপন্থীরা ও ব্যাক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর জোর দিয়েছিল। পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অংশে শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে শহরের বিকাশ এবং বণিক শ্রেণির উত্থান হয়েছিল, যার অস্তিত্ব নির্ভর করত বাজারের উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স এবং জার্মানির কিছু কিছু অঞ্চলে তা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর ফলে নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণির উৎপত্তি হয়। শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলো শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং পেশাদারদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে এই গোষ্ঠীগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত সংখ্যায় ছিল খুবই নগণ্য। অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সুবিধা বিলুপ্তির পর শিক্ষিত ও উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কিন্তু, আইনের চোখে সমানাধিকার থাকা সত্ত্বেও সার্বজনীন **ভোটাধিকার (suffrage)** স্বীকৃত ছিল না। মনে রাখতে হবে, বিপ্লবী ফ্রান্সে প্রথমবার উদারনৈতিক প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক প্রয়োগ হয় এবং সেখানে ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার একমাত্র সেইসব পুরুষদেরই ছিল - যারা সম্পত্তির অধিকারী ছিল। সম্পত্তিহীন পুরুষ এবং সমস্ত নারীদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। জ্যাকোবিনদের শাসনকালে অল্পদিনের জন্য সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা ভোটাধিকার লাভ করেছিল।

নতুন শব্দ

Suffrage – ভোটাধিকার

যাই হোক নেপোলিয়ন সংহিতার ফলে পুনরায় সীমিত সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার ফিরে এসেছিল এবং মহিলাদের অধিকার হ্রাস করে তাদেরকে পিতা ও স্বামীর অধীনে রাখা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারী ও সম্পত্তিহীন পুরুষরা সমান রাজনৈতিক অধিকার দাবি করে প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, উদারনীতি, বাজারের স্বাধীনতা, পণ্য ও মূলধনের গতিবিধির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার পক্ষপাতী ছিল। এটি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি জোরালো দাবি। চলো, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের উদাহরণ গ্রহণ করি। নেপোলিয়ানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অগণিত ছোটো ছোটো প্রদেশের 39টি রাজ্য নিয়ে এক মহাসংঘ তৈরি হয়। এই রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব মুদ্রা ও ওজন মাপার পদ্ধতি চালু ছিল। 1833 খ্রিস্টাব্দে হেমবার্গ থেকে নুরেমবার্গে পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে একজন ব্যবসায়ীকে 11টি সীমাশুল্ক বাধা অতিক্রম করতে হত এবং প্রত্যেকবার প্রায় 5 শতাংশ করে সীমাশুল্ক দিতে হত। যেহেতু প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব ওজন ও মাপ পদ্ধতি ছিল, সেহেতু ওজন ও মাপের হিসাব করতে প্রচুর সময় ব্যয় হত। উদাহরণস্বরূপ, কাপড় মাপার একক ছিল এলি (*elle*) যার দৈর্ঘ্য অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হত। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে এক এলি কাপড় কিনলে পাওয়া যেত 54.7 সেন্টিমিটার কাপড়, মেঁঞ্জ (Mainz) এ পাওয়া যেত 55.1 সেন্টিমিটার, নুরেমবার্গে 65.6 সেন্টিমিটার এবং ফ্রাইবার্গে পাওয়া যেত 53.5 সেন্টিমিটার কাপড়।

নতুন নতুন ব্যবসায়ীরা এই ধরনের পরিস্থিতিগুলোর অর্থনৈতিক বিনিময় এবং বিকাশের বাধা হিসেবে বিবেচনা করে এমন একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল যেখানে জনগণ, পণ্য এবং মূলধন বিনা বাধায় আসা যাওয়া করতে পারে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে, প্রাশিয়ার উদ্যোগে একটি শুল্কসংঘ বা *জোলভারিন* (*zollverein*) গঠিত হয় এবং জার্মাণির অধিকাংশ রাজ্য এতে যোগ দেয়। এই সংঘ শুল্ক অবরোধ বাতিল করে এবং দুটি মুদ্রা চালু করে। আগে 30টি মুদ্রা চালু ছিল। এছাড়া ও রেলপথ বিস্তারের কাজে আরো গতিশীলতা আসে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোকে জাতীয় ঐক্যের সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলে। এই সময়ে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের একটি তরঙ্গ ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের ভাবনাকে আরো শক্তিশালী করেছিল।

2.3 1815 সালের পরবর্তীকালে নতুন রক্ষণশীলবাদ

1815 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর, ইউরোপীয় সরকারগুলো **রক্ষণশীল** মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। রক্ষণশীলবাদীরা বিশ্বাস করতেন রাজ্য ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী সংস্থাগুলো যেমন রাজতন্ত্র, চার্চ, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, সম্পত্তি এবং পরিবারকে রক্ষা করা উচিত। তবে অধিকাংশ রক্ষণশীলবাদীরা প্রাক্-বিপ্লব যুগের দিনগুলো ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী ছিলেন না। নেপোলিয়ন কর্তৃক শুরু হওয়া পরিবর্তন থেকে তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিকীকরণ আসলে রাজতন্ত্রের মতো

উৎস - খ

অর্থনীতিবিদ্‌রা জাতীয় অর্থব্যবস্থার পরিভাষায় চিন্তা করতে শুরু করল। রাষ্ট্র কীভাবে বিকাশ লাভ করবে এবং কোন্ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জাতি গঠন করতে ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে তারা আলোচনা করছিল।

জার্মানির তুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড: ফ্রেডরিখ লিস্ট 1834 খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন : "জোলভারিনের লক্ষ্য হচ্ছে, জার্মানদের অর্থনৈতিকভাবে একসূত্রে বেঁধে রাখা। এটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যতটা বাহ্যিকভাবে তার স্বার্থকে রক্ষা করে শক্তিশালী করে তুলবে, বস্তুগতভাবে ততটাই আভ্যন্তরিন উৎপাদনশীলতাকে উদ্দীপিত করবে। স্বতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বার্থকে সংমিশ্রণের মাধ্যমে জাতীয় অনুভূতি জাগানো এবং বাড়ানো উচিত। জার্মানবাসীরা এটা বুঝতে পেরেছিল যে, একটি মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জাতীয় অনুভূতিকে উৎপন্ন করার একমাত্র উপায়।"

আলোচনা কর :

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যেসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা সম্ভবপর বলে লিস্ট মনে করেছিলেন সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

নতুন শব্দ

Conservatism (রক্ষণশীলতা) --- এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন যা ঐতিহ্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠান ও প্রচলিত রীতিনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে দ্রুত পরিবর্তনের বদলে ধীরে ধীরে পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেয়।

ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে পারে। এটা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আরো কার্যকর এবং শক্তিশালী করতে পারে। একটি আধুনিক সেনাবাহিনী, দক্ষ আমলাতন্ত্র গতিশীল অর্থব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্রবাদ ও ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ — ইউরোপে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারে।

1815 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মতো ইউরোপীয় দেশগুলো যারা সম্মিলিতভাবে নেপোলিয়ানকে পরাজিত করেছিল, সেইসব দেশের প্রতিনিধিরা ইউরোপের সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য ভিয়েনাতে মিলিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার চ্যান্সেলর ডিউক মেটার্নিক। সেইসব দেশের প্রতিনিধিরা 1815 খ্রিস্টাব্দে 'ভিয়েনা চুক্তি' সম্পাদন করেন এবং এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়ানের বিভিন্ন যুদ্ধের দ্বারা ইউরোপে যে পরিবর্তন ঘটেছিল সেইগুলোর বেশির ভাগকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা। ফরাসি বিপ্লবের ফলে বুরবোঁ রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল। সেই রাজবংশকে পুনরায় ফ্রান্সের মসনদে বসানো হয় এবং ফ্রান্স সেইসব অঞ্চলগুলোকে হারিয়ে ফেলেছিল যে সমস্ত অঞ্চল নেপোলিয়ানের অধীনে ফ্রান্সের সাথে যুক্ত হয়েছিল। ফ্রান্সের সীমান্তে অনেক রাষ্ট্রকে সারিবদ্ধভাবে প্রতিস্থাপন করা হয় যাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্স সাম্রাজ্য বিস্তার করতে না পারে। এর জন্য উত্তরে নেদারল্যাণ্ড রাষ্ট্র স্থাপন করা হয়েছিল যার মধ্যে বেলজিয়ামও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দক্ষিণ দিকে পিডমন্টে জেনোয়াকে যুক্ত করা হয়েছিল। প্রাশিয়াকে পশ্চিম সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ নতুন অঞ্চল দেওয়া হয়েছিল এবং অস্ট্রিয়াকে উত্তর ইটালির নিয়ন্ত্রণে

কার্যাবলি

ভিয়েনা কংগ্রেসের ফলে ইউরোপের মানচিত্রের যে পরিবর্তন হয়েছিল তা চিহ্নিত কর।

আলোচনা কর :

ব্যাঙ্গকার তাঁর চিত্রের মাধ্যমে কী বর্ণনা করতে চেয়েছিল ?

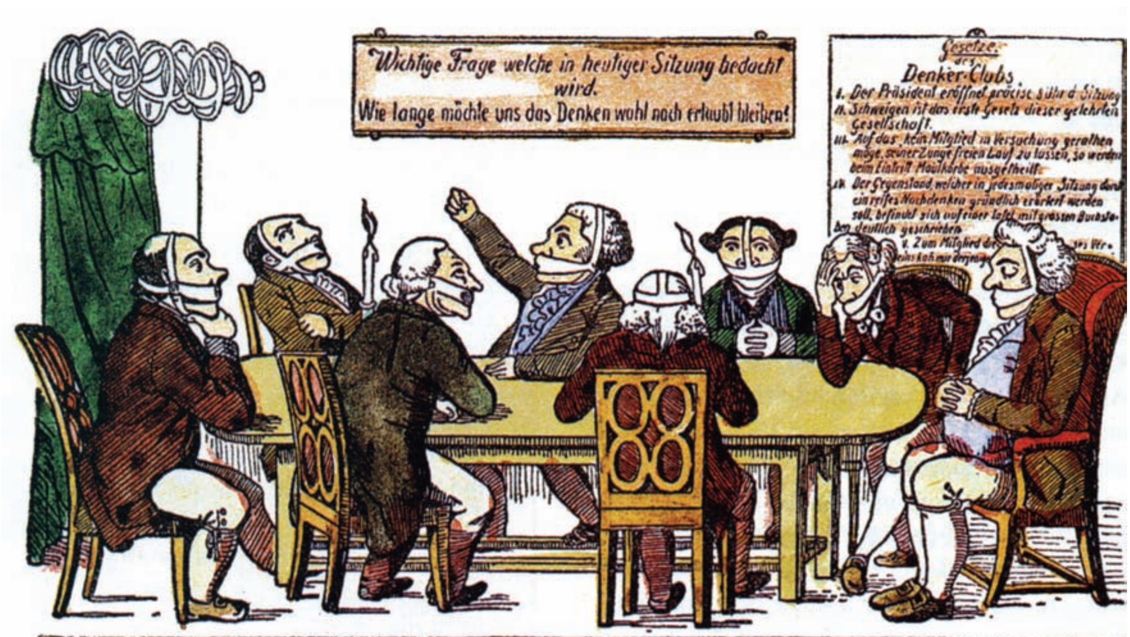

6 নং চিত্র – চিন্তাবিদ্‌দের ক্লাব, 1820 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময় অজ্ঞাতনামা চিত্রশিল্পীর আঁকা ব্যঙ্গচিত্র
বাঁদিকের শিলালিপিতে লেখা আছে: আজকের সভায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : আমাদের কতক্ষণ চিন্তা করতে দেওয়া হবে?
ডানদিকের বোর্ডে ক্লাবের নিয়মগুলোর তালিকা রয়েছে যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত :
1. এই শিক্ষিত সমাজের প্রথম অনুশাসন হল নীরবতা।
2. ক্লাবের সদস্যদের বক্তৃতা দিতে প্ররোচিত করে এমন পরিস্থিতি এড়াতে ক্লাবে প্রবেশ করা মাত্র তাদের মোহর (muzzles) বিলি করা হবে।

রাখা হয়। কিন্তু নেপোলিয়ান 39 টি রাজ্য নিয়ে যে জার্মান মহাসংঘ স্থাপন করেছিলেন সেটিকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল। পূর্বদিকে রাশিয়াকে পোল্যান্ডের যেখানে প্রাশিয়াকে স্যাক্সনীর কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল। প্রধান লক্ষ্য ছিল নেপোলিয়ান কর্তৃক উৎখাত হওয়া রাজতন্ত্রকে পুর্নস্থাপন করা এবং ইউরোপে একটি নতুন রক্ষণশলীল ব্যবস্থা চালু করা।

1815 সালে প্রতিষ্ঠিত রক্ষণশীল সরকার স্বৈরাচারী ছিল। তারা সমালোচনা এবং মতবিরোধকে সহ্য করত না এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বাধা দিতে চেয়েছিল যেগুলো স্বৈরাচারী সরকারগুলোর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। সরকার সেন্সরশিপের আইন চালু করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল সেইসব সংবাদপত্র, বই, নাটক এবং গানকে নিয়ন্ত্রণ করা যেগুলো ফরাসি বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার ধারণাগুলোকে প্রতিফলিত করত। ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতি তখনো উদারপন্থীদের অনুপ্রাণিত করছিল। নতুন রক্ষণশীল ব্যবস্থার সমালোচনাকারী উদারপন্থীদের দ্বারা গৃহীত একটি মুখ্য দাবি ছিল — সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

2.4 বিপ্লবীগণ

1815 খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীবছরগুলোতে, নিপীড়নের ভয়ে অনেক উদারপন্থী-জাতীয়তাবাদীরা আত্মগোপন করেছিল। অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্রে বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এবং তাদের মতবাদকে প্রচার করার জন্য অনেক গুপ্ত সংস্থার উদ্ভব হয়েছিল। সেই সময় বিপ্লবী তাদেরকেই বলা হত যারা ভিয়েনা কংগ্রেসের পরবর্তিকালে প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করত, এবং স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য লড়াই করত। অধিকাংশ বিপ্লবী জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে দেখত।

এমনই একজন ব্যাক্তি ছিলেন ইটালির বিপ্লবী জোসেফ ম্যৎসিনী। তিনি 1807 খ্রিস্টাব্দে জেনোয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি কার্বোনারী নামক একটি গুপ্ত সংগঠনের সদস্য হয়েছিলেন। 1831 খ্রিস্টাব্দে 24 বছর বয়সে যুবাবস্থায় লিগুরিয়াতে বিপ্লব করার জন্য তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি আরও দুটি গুপ্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমটি মার্সেইয়ে (Marseilles) ইয়ং ইটালি এবং দ্বিতীয়টি বর্নে ইয়ং ইউরোপ, যেগুলোর সদস্য ছিল পোলাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি এবং জার্মানির সম-মনোভাবাপন্ন যুবকরা। ম্যাৎসিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র হল মানবজাতির সহজাত সংগঠন। তাই ইটালি কিছু ছোটো ছোটো রাজ্য এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এই রাজ্যগুলোকে যুক্ত করে একটি বৃহত্তর জোটের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্র গঠন করা প্রয়োজন ছিল। এই একীকরণই ইটালিয় মুক্তির একমাত্র ভিত্তি হতে পারত। ইটালির এই মডেল অনুসরণ করে জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ম্যাৎসিনির রাজতন্ত্রের প্রতি বিরোধ এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে রক্ষণশীলরা ভয় পেয়েছিল। মেটারনিক তাঁকে 'আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু' বলে বর্ণনা করেছেন।

চিত্র 7 — 1833 খ্রিস্টাব্দে বর্নে যোসেপ ম্যাৎসিনি এবং ইয়ং ইউরোপের প্রতিষ্ঠাতা।
গিয়াকোমো মন্টেগাজার আঁকা চিত্র।

3 বিপ্লবের যুগ : 1830-1848

যখনই রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থাগুলো তাদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন ইটালি এবং জার্মান রাজ্যগুলো, অটোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো, আয়ারল্যান্ড এবং পোল্যান্ডে উদারবাদ ও জাতীয়তাবাদ বিপ্লবের সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয়। এই বিপ্লবগুলোর নেতৃত্বে ছিলেন উদারতন্ত্রী জাতীয়তাবাদীরা যারা বাছাই করা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত যাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, করণিক এবং মধ্যবিত্ত ব্যবসায়িকগোষ্ঠী।

1830-এর জুলাই মাসে ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। 1815-এর পরে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার সময় বুরবোঁ রাজারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; এখন উদারবাদী বিপ্লবীরা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে লুই ফিলিপ্পিকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করে। মেটারনিক একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, ‘যখন ফ্রান্স হাঁচি দেয় তখন সমগ্র ইউরোপে ঠান্ডা অনুভূত হয়’। জুলাই বিপ্লব ব্রাসেলসে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল যার ফলে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যায়।

একটি ঘটনা যা সমগ্র ইউরোপের শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির মধ্যে রাষ্ট্রীয় ভাবনা গড়ে তুলেছিল সেটা হল গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে গ্রিস ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের একটি অংশ। ইউরোপে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের উত্থান গ্রিসবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই সংগ্রাম 1821 সালে শুরু হয়। গ্রিসের জাতীয়তাবাদীরা, গ্রিসের নির্বাসিত অধিবাসী এবং অনেক পশ্চিম ইউরোপীয়রা যাদের প্রাচীন গ্রিক সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি ছিল তাদের সমর্থন লাভ করেছিল। কবি এবং শিল্পীরা গ্রিসকে ইউরোপীয় সভ্যতার দোলনা বলে প্রশংসা করেন এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনমত গড়ে তুলেন। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন তহবিল গড়ে তুলেন এবং পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন যেখানে 1824 খ্রি. জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ পর্যন্ত 1832 খ্রিস্টাব্দের কনস্টান্টিনোপলের সন্ধি দ্বারা গ্রিস একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

3.1 ভাবপ্রবণ কল্পনা এবং জাতীয় ভাবনা

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ শুধুমাত্র যুদ্ধ ও রাজ্য সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে ঘটেনি। সংস্কৃতি, একটি জাতির ধারণা সৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্প এবং কবিতা, গল্প এবং যন্ত্রসংগীত জাতীয়তাবাদী ভাবনা গড়তে এবং বর্ণনা করতে সাহায্য করে।

ভাববাদের দিকে লক্ষ করা যাক, এটা এমন এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল যা এক বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিকাশ করতে চেয়েছিল। সাধারণত ভাববাদী শিল্পী এবং কবিগণ বিজ্ঞানের গুণকীর্তনকে সমালোচনা করেন এবং তার পরিবর্তে আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান এবং রহস্যময় ভাবনার উপর জোর দেন। তাদের চেষ্টা ছিল

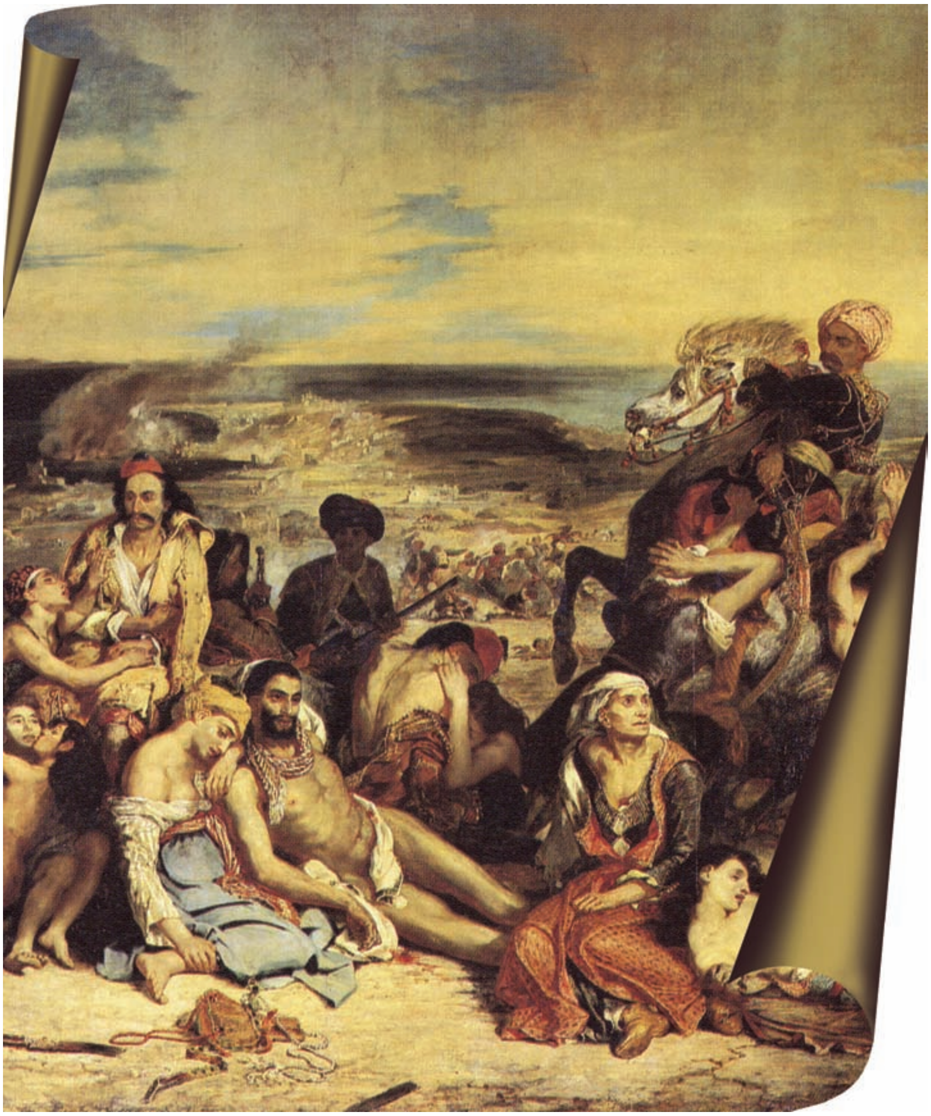

চিত্র ৪ — কিওসে নির্বিচারে হত্যা, ইউজিন ডেলাক্রোয়া, ১৮২৪
ফরাসি কাল্পনিক চিত্র শিল্পীদের মধ্যে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিত্রশিল্পী ছিলেন ডেলাক্রোয়া। এই বিরাট চিত্র (4.19 মি × *3.54* মি) এমন এক ঘটনাকে চিত্রিত করে বলা হয় যেখানে কিওস দ্বীপে *20,000* গ্রিসবাসীকে তুর্কিরা হত্যা করে। ডেলাক্রোয়া ঘটনাটিকে নাটকীয় রূপ দিয়ে নারী এবং শিশুদের দুঃখকে কেন্দ্রবিন্দু করে উজ্জ্বল রং প্রয়োগ করে দর্শকদের ভাবাবেগকে মোহিত করার চেষ্টা করেন এবং গ্রিসবাসীদের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলেন।

একটি সমষ্টিগত ঐতিহ্যের বোধ এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক অতীতকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

জার্মান দার্শনিক জোহান গট ফ্রাইড (1744-1803) এর মতো ভাববাদীরা দাবি করেন যে, প্রকৃত জার্মান সংস্কৃতিকে সাধারণ লোকের (*das volk*) মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে। রাষ্ট্রের (*volksgeist*) প্রকৃত আত্মা লোকগীতি, লোক কবিতা এবং লোকনৃত্যের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সুতরাং, লোক সংস্কৃতির এইরূপকে সংগ্রহ

এবং লিপিবন্ধ করা জাতি গঠন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন ছিল।

স্থানীয় ভাষা ও স্থানীয় লোকসাহিত্যকে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র প্রাচীন জাতীয় ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল না। বরং আধুনিক জাতীয়তাবাদী বার্তাকে অধিকাংশ নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ছিল। এটা বিশেষ করে পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল যাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মতো শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিল। যদিও স্বাধীন অঞ্চলরূপে পোল্যান্ডের তখন কোনো অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু সংগীত এবং ভাষার মাধ্যমে তাদের জাতীয় ভাবধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছিল। উদাহরণ হিসাবে ক্যারোল কুর্পিনস্কি জাতীয় সংগ্রামকে তার অপেরা এবং সংগীতের মাধ্যমে গুণকীর্তন করেন এবং পোলোনেইস ও মাজুরকার মতো লোকনৃত্যকে জাতীয়তাবাদী প্রতীকে পরিণত করেন।

ভাষা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা উন্মেষে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাশিয়ার অধিকারের পর পোলিশ ভাষাকে বিদ্যালয় থেকে জোরপূর্বক তুলে দিয়ে রাশিয়ার ভাষাকে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিল। 1831-এ রাশিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় যাকে অচিরেই দমন করা হয়েছিল। এরই অনুকরণে পোল্যান্ডের অনেক পাদরিগণ ভাষাকে জাতীয় বিরোধিতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। চার্চের সমাবেশ এবং অনেক ধর্মীয় নির্দেশনায় পোল্যান্ডের ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলস্বরূপ রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ, রাশিয়ায় ধর্মপ্রচারে অনীহা প্রকাশ করায় শাস্তি হিসেবে অনেক ধর্মযাজক ও বিশপদের গারদে পুরে দেয় অথবা সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। রাশিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে পোলিশ ভাষার ব্যবহারকে সংঘর্ষের প্রতীকরূপে দেখা যেতে লাগল।

3.2 ক্ষুধা, কষ্ট এবং গণ অভ্যুত্থান

1830-এর দশক ছিল ইউরোপে অর্থনৈতিক মহাসংকটের বছর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে জনসংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। সে সময় অধিকাংশ দেশেই কাজের চাইতে বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। গ্রামীণ এলাকার লোক শহরের ভিড়ে ঠাসা বস্তিতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। শহরের ক্ষুদ্র উৎপাদকদের প্রায়শই ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত যন্ত্রোৎপাদিত সস্তা দ্রব্যের কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ইংল্যান্ডের শিল্পায়ন ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য দেশ থেকে অনেক বেশি উন্নত ছিল। বিশেষ করে এই প্রতিযোগিতা বস্ত্র উৎপাদনে পরিলক্ষিত হয়। কারণ এগুলো মূলত তৈরি হত ঘরে অথবা ছোটো ছোটো কারখানায় এবং শুধুমাত্র আংশিকভাবে মেশিনে তৈরি হত। ইউরোপের সেইসব অঞ্চলে যেখানে অভিজাতরা তখনও ক্ষমতায় আসীন ছিল সেখানে কৃষকরা সামন্ত করের বোঝা এবং বিভিন্ন বাধা নিষেধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি অথবা ফসলের উৎপাদন কম হলে শহর এবং দেশে চরম দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে।

বক্স 1

গ্রিম ভাইরা : লোককথা এবং জাতিগঠন

গ্রিমস্ ফেয়ারি টেইলস্ একটি বিখ্যাত নাম। জ্যাকব এবং উইলহেল্ম গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন জার্মানির হানা ও নগরে, যথাক্রমে 1785 এবং 1786 খ্রিস্টাব্দে। যখন দুই ভাইই আইন নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন তখন শীঘ্রই তাদের মধ্যে পুরানো রূপকথার গল্প আহরণের প্রতি আগ্রহের জন্ম নেয়। তারা ছয় বৎসর ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান, গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রূপকথার গল্পগুলো লিখে ফেলেন যেগুলো বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল। এগলো শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। 1812 খ্রিস্টাব্দে প্রথম তারা তাদের সংগৃহীত রূপকথার প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময় দুই ভাইই উদারনৈতিক রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষভাবে মনযোগী হন। এই সময় তাঁরা জার্মান ভাষায় 33 সংখ্যার অভিধানও প্রকাশ করেন।

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় ফরাসি কর্তৃত্বকে জার্মান সংস্কৃতির হুমকি স্বরূপ দেখেন এবং তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সংগৃহীত রূপকথাগুলি খাটি এবং প্রামাণিক জার্মান আধ্যাত্মের বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা রূপকথার সংকলন এবং জার্মান ভাষার উন্নতির প্রচেস্টাকে ফরাসী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এবং জার্মান জাতীয় পরিচিতি তৈরির অঙ্গ হিসেবে মনে করেন।

আলোচনা কর :

জাতীয় পরিচিতি গঠনে ভাষা এবং জনপ্রিয় ঐতিহ্যগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করো।

চিত্র 9 — কৃষক বিদ্রোহ, 1848 ।

1848 সাল ছিল এরকমই একটি বছর। খাদ্য সংকট এবং বেকারত্ব প্যারিসবাসীকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় অবরোধের সৃষ্টি হয় এবং লুই ফিলিপ্পি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। জাতীয় সভা এক গণতন্ত্র ঘোষণা করে 21 বছরের উপরে সমস্ত পুরুষদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি দেয় এবং কাজের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে। কাজ প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রীয় কারখানা গড়ে তোলা হয়। 1845 সালে সাইলেসিয়ায় তাঁতীরা ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ঠিকাদাররা তাঁতিদের কাঁচামাল যোগান দিত এবং উৎপাদিত বস্ত্র তাঁতীদের কাছ থেকে খুব কম দাম দিয়ে ক্রয় করত। সাংবাদিক উইলহেলম্ ওয়ল্ফ্ সাইলেসিয়া গ্রামের ঘটনাবলিকে এভাবে বর্ণনা করেন —

> এই গ্রামগুলোতে (18,000 অধিবাসী সম্বলিত) সূতি বস্ত্রের বয়ন হল সবচেয়ে বিস্তৃত পেশা ... শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা ছিল চরমে। কাজের জন্য উদ্গ্রীব লোকদের সুযোগ নিয়ে ঠিকাদাররা চুক্তিবদ্ধ মালের দাম কমিয়ে দিত ...
>
> 4 ঠা জুন 2 টায় তাঁতীদের এক বড়ো সংখ্যা তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং প্যারিসে তাদের ঠিকাদারদের বাড়ি পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বেশি মজুরি দেওয়ার দাবি করে অভিযান চালায়। সেখানে তাদের সঙ্গো হয় ঘৃণ্য ব্যবহার করে, নয় তাদের ধমক দেওয়া হয়। এরপর তাদের মধ্যে একদল জোর করে ঘরে প্রবেশ করে জানালা, আসবাবপত্র, চিনামাটির তৈরি জিনিসপত্র ভেঙে ফেলে, আরেকদল ভাণ্ডার ঘরে ঢুকে কাপড় লুট করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ... ঠিকাদার তার পরিবারসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামে পালিয়ে যায় কিন্তু সেখানে গ্রামবাসীরা এমন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। সে 24 ঘন্টা পরে সেনাকে সঙ্গো নিয়ে ফিরে আসে। তারপর সেনার সঙ্গো সংঘর্ষে এগারজন তাঁতীর মৃত্যু হয়।

আলোচনা কর :

সাইলেসিয়ার তাঁতীদের বিক্ষোভের কারণ বর্ণনা কর। সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর মতামত জ্ঞাপন করো।

কার্যাবলি

কল্পনা করো তুমি একজন তাঁতী যে ঘটনাগুলো যেভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছিল সেভাবে দেখেছ। তুমি যা দেখলে তার উপর একটি প্রতিবেদন লেখো।

3.3 1848: উদারবাদীদের বিদ্রোহ

1848 সালে ইউরোপের অনেক দেশে গরীব, বেকার এবং ক্ষুধার্ত কৃষক ও শ্রমিকদের বিদ্রোহের পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিদ্রোহ চলছিল। ফ্রান্সে 1848 এর ফেব্রুয়ারির ঘটনায় রাজাকে পদত্যাগ করতে হয় এবং সমস্ত পুরুষের সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক গণতন্ত্রের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইউরোপের অন্যান্য অংশে যেখানে তখনও স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি যেমন জার্মানি, ইটালি, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য সেখানে উদারবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারী পুরুষরা নিয়মতন্ত্রবাদের দাবির সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের দাবিকে জুড়ে দেয়। তারা বাড়ন্ত গণবিক্ষোভকে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করার দাবিতে কাজে লাগায়। এই জাতি রাষ্ট্র সংবিধান, সংবাদপত্রে স্বাধীনতা এবং সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতার মতো সংসদীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

জার্মান অঞ্চলের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশাদাররা, ব্যবসায়ীগণ এবং ধনী ব্যক্তিরা। তারা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট শহরে আসল এবং সর্ব জার্মান জাতীয় সভার পক্ষে ভোট দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 1848-এর 18ই মে 831 জন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁদের নির্ধারিত জায়গায় বসার জন্য উৎসবের মতো মিছিল করে এগিয়ে যান এবং সেন্ট পল চার্চের ফ্র্যাঙ্কফুর্ট সংসদে সমবেত হন। তাঁরা জার্মান রাষ্ট্রের জন্য একটি খসড়া সংবিধান রচনা করেন। এই রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকবে সংসদে দায়বন্ধ এক রাজতন্ত্র। যখন চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে প্রাশিয়ার রাজা সম্বোধন করে রাজমুকুট প্রদান করা হয়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নির্বাচিত সভার বিরোধিতা করার জন্য অন্য রাজাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। যখন অভিজাত ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিরোধ বেড়ে গেল তখন সংসদের সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেল। মধ্যবিত্ত শ্রেণিরা যারা শ্রমিক ও কারিগরদের দাবির বিরোধিতা করেছিল তারাই সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং ফলে তারা শ্রমিক ও কারিগরদের সমর্থন হারিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীকে ডাকা হয় এবং সভা ভেঙে দিতে বাধ্য হয়।

উদারবাদী আন্দোলনে মহিলাদের অধিক রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের বিষয়টি বিতর্কিত ছিল অথচ এই আন্দোলনে এক বিরাট সংখ্যক নারী সক্রিয়ভাবে অনেক বছর আগে থেকে অংশগ্রহণ করত। নারীরা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল; পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেছিল এবং রাজনৈতিক বৈঠক ও বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিল। তা সত্ত্বেও সভার নির্বাচনের সময় তাদের ভোটাধিকার অস্বীকার করা হয়েছিল।'

নতুন শব্দ

নারীবাদী — সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্ত্রী-পুরুষের রাজনৈতিক সমতায় বিশ্বাসের উপর আগ্রহবোধ এবং নারীর অধিকারের প্রতি সচেতনতা।

উৎস-গ

নারীদের স্বাধীনতা ও সমতাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে?

উদারতন্ত্রী রাজনীতিজ্ঞ কার্ল ওয়েলকার যিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য, নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গীগুলো প্রকাশ করেন : 'প্রকৃতি পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা কাজ করার জন্য তৈরি করেছে ... পুরুষদের অধিক শক্তিশালী দুইয়ের মধ্যে পুরুষকে নির্ভিক ও স্বাধীন এবং পরিবারের রক্ষাকর্তা, খাদ্য যোগানদার, আইন, উৎপাদন, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্র প্রভৃতি সর্বজনিক কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। মহিলারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, নির্ভরশীল এবং ভীতু, পুরুষ তাদের রক্ষা করবে। তার স্থান হল বাড়িতে, শিশুর যত্ন, পরিবারের যত্ন নেওয়া, ... আমাদের কি আর অন্য কোনো প্রমাণের দরকার আছে যে এরকম পার্থক্য দেওয়ার পর, লিঙ্গের মধ্যে সাম্যতা পরিবারের একতাকে বিপজ্জনক করে তুলবে এবং পরিবারের গরিমাকে ধ্বংস করবে?

লুইস অটো পিটারস (Louise Otto-Peters, 1819-95) ছিলেন সক্রিয় রাজনীতিবিদ্ যিনি একটি মহিলাদের পত্রিকা এবং পরবর্তীকালে এক নারীবাদী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর পত্রিকার (21 এপ্রিল, 1849) প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় ছাপা হয় :

চলো আমরা প্রশ্ন করি কতজন পুরুষ যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন-মরণ ভাবনার সঙ্গে জড়িত, সমগ্র মানুষের সমগ্র মানব জগতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত থাকবে? যখন এই প্রশ্নটি করা হয় তারা সকলেই খুব সহজে উত্তর দেবে "হ্যাঁ"। যদিও তাদের অক্লান্ত প্রচেস্টা কেবলমাত্র অর্ধেক মানবজাতি অর্থাৎ পুরুষের উপকারের জন্য। কিন্তু স্বাধীনতা অবিভাজ্য। এইজন্যই স্বাধীন পুরুষদের পরাধীনদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা সহ্য করা উচিত নয়।

এই পত্রিকার একজন অখ্যাত পাঠক 1850-এর 25শে জুন সম্পাদককে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন : যেখানে নারীদের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত যা তারা ভোগ করেন সেখানে তাদের রাজনৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করা সত্যিই হাস্যকর এবং অযৌক্তিক। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন এবং বিভিন্ন দায় দায়িত্ব ও পালন করেন যদিও এর জন্য পুরুষদের মতো তাঁরা বিশেষ কোনো সুবিধা পেতেন না — কেন এই অন্যায়? এটা কি লজ্জার কথা নয় যে একজন সবচেয়ে বোকা গবাদি পশুপালকের ও ভোটদানের অধিকার রয়েছে কেবলমাত্র একজন পুরুষ বলে। অন্যদিকে প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও, রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণে অনেক বেশি অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও একজন খুবই প্রতিভাশালী নারী এই অধিকার থেকে বঞ্চিত; কেন?

Source

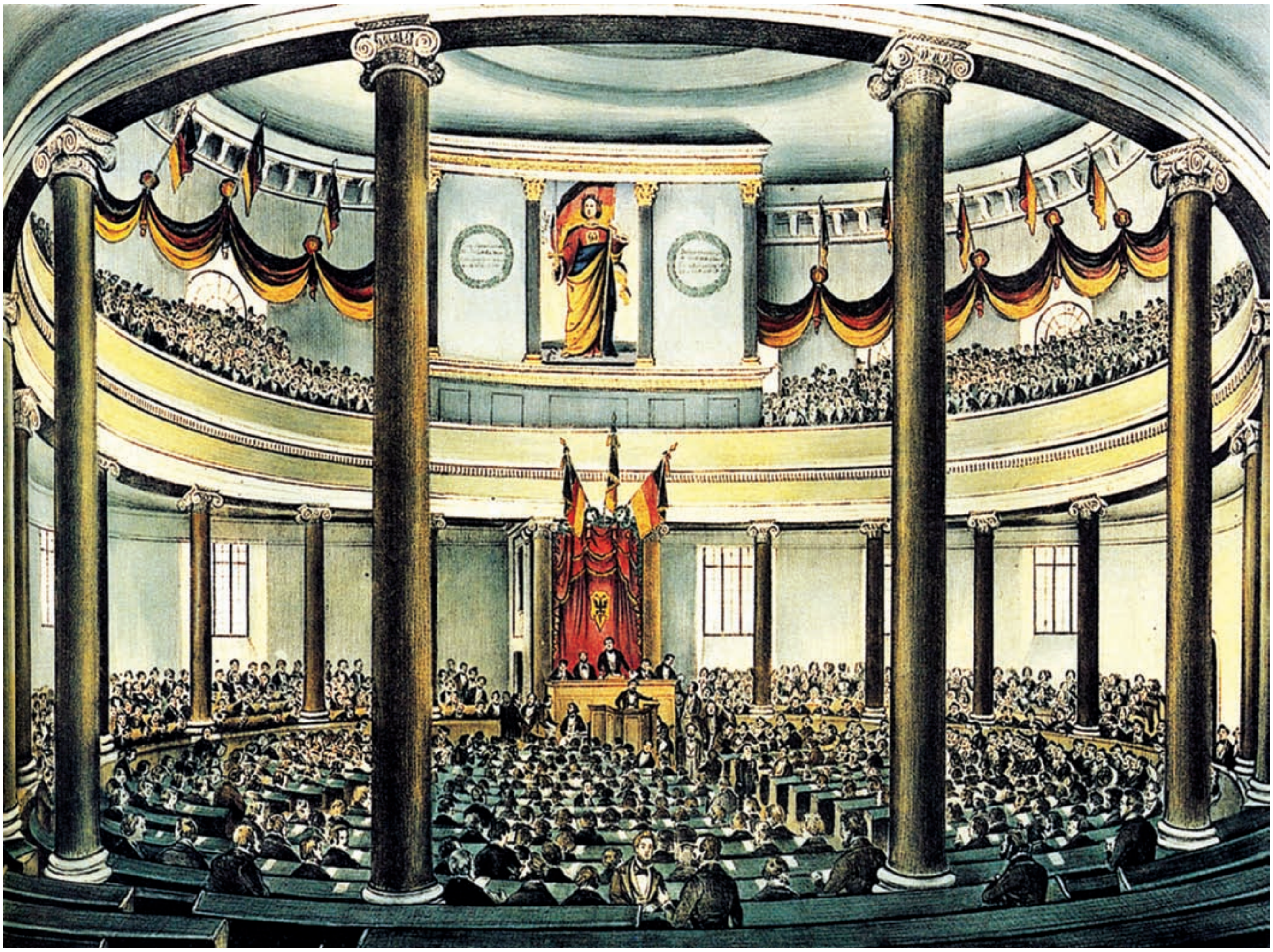

চিত্র 10 — সেন্ট পল চার্চে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট সংসদ।
সমসাময়িক রঙিন চিত্র। উপরে বাঁদিকে প্রদর্শনী কক্ষে মহিলাদের লক্ষ্য করো।

যখন সেন্ট পলের চার্চে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট সংসদের সভা আহ্বান করা হয় তখন নারীদের শুধুমাত্র দর্শক হিসেবে গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে থাকার অনুমতি দেওয়া হত। যদিও রক্ষণশীল শক্তি ১৮৪৮-এ উদারবাদী আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম ছিল কিন্তু তারা পুরোনো ব্যবস্থাকে বহাল রাখতে পারে নি। রাজারা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন যে, উদার-জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের ক্ষমতা দানের মাধ্যমেই বিপ্লব ও দমন চক্রের সমাপ্তি ঘটবে।

১৮৪৮ এর পরে তাই মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা যে পরিবর্তনের সূচনা করেন তা পশ্চিম ইউরোপে ১৮১৫-এর পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। এভাবে হ্যাবসবার্গ অঞ্চল এবং রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দুটোকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৬৭ সালে হ্যাবস্‌বার্গ শাসকরা হাঙ্গেরীয়বাসীদের আরও বেশি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মঞ্জুর করলেন।

আলোচনা কর :

নারীর অধিকারের প্রশ্নে উপরে উল্লিখিত তিনজন লেখকের ব্যক্ত চিন্তার তুলনা করো। এর দ্বারা উদারবাদী মতাদর্শ সম্পর্কে কী প্রকাশ পায়?

নতুন শব্দ

মতাদর্শ — এক বিশেষ ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রতিফলনের ধারনাসমূহ।

4 জার্মানি এবং ইটালির গঠন

4.1 জার্মানি — সেনাবাহিনী কি একটি জাতির স্থপতি হতে পারে ?

1848 এরপর ইউরোপে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং বিপ্লব থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। সমগ্র ইউরোপে রাষ্ট্রশক্তি বাড়াতে এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনে রক্ষণশীলরা প্রায়শই জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে ব্যবহার করতেন।

এটা এই প্রক্রিয়ায় লক্ষ করা যায় যেখানে জার্মানি এবং ইটালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যেভাবে তুমি দেখেছ জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জার্মানির মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, যারা 1848 -এ জার্মানি মহাসংঘের বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করে এক নির্বাচিত সংসদ দ্বারা শাসিত জাতি রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করে। যদিও জাতি তৈরির এই উদারবাদী উদ্যোগ রাজতন্ত্র এবং সামরিক শক্তি মিলে দাবিয়ে রাখে যাদের প্রাশিয়ার অধিকাংশ ভূস্বামী (Junkers নামে পরিচিত) সমর্থন করত।

তারপর থেকে প্রাশিয়া জাতীয় ঐক্যের আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অটো ভন বিসমার্ক প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের সহযোগিতায় এই একীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। সাত বছরে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তিনটি যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে প্রাশিয়ার একীকরণ হওয়ার প্রক্রিয়া পূর্ণ হয়। 1871 এর জানুয়ারী মাসে ভার্সাইয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম জার্মানির সম্রাট ঘোষিত হন।

1871 এর 18ই জানুয়ারি সকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জার্মান রাজ্যগুলোর রাজপুত্রগণ, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিবর্গ, প্রধানমন্ত্রী অটো ভন বিসমার্ক সহ প্রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীগণ ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদের ঠাণ্ডা শিশমহলে প্রাশিয়ার প্রথম কাইজার উইলিয়ামের নেতৃত্বে নতুন জার্মান সাম্রাজ্য ঘোষণা করার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন।

জার্মানিতে রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রাশিয়ার রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই নতুন রাজ্য জার্মানির মুদ্রা, ব্যাংকিং, আইন এবং বিচার সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রাশিয়ার বিভিন্ন উপায় এবং পদ্ধতি প্রায়শই অবশিষ্ট জার্মানির পক্ষে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে।

চিত্র 11 — ভার্সাইয়ের হল অফ মিরর্শে জার্মান সাম্রাজ্যের ঘোষনা, এটোঁ ভন ওয়ার্নার। *চিত্রের মাঝখানে কাইজার এবং প্রাশিয়ার সেনাপ্রধান জেনারেল ভন রুন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের নিকটে বিসমার্ক। এই বিরাট চিত্র (2.7 মি. x 2.7মি.) চিত্র শিল্পী কর্তৃক বিসমার্ককে 1885 তে তাঁর 70 তম জন্মদিনে উপহার দেওয়া হয়েছিল।*

Fig. 12 — Unification of Germany (1866-71).

4.2 ঐক্যবদ্ধ ইটালি

জার্মানির মতো ইটালিরও রাজনৈতিক বিখণ্ডীকরণের এক দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। ইটালীয়রা অনেক রাজবংশীয় রাজ্যে এবং বহু রাষ্ট্রীয় হ্যাবসবর্গ সাম্রাজ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালি সাতটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল যার মধ্যে একমাত্র সার্ডিনিয়া — পিডমন্ট ইটালিয় রাজবংশের দ্বারা শাসিত ছিল। উত্তরাংশ ছিল অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবার্গের অধীনে, মধ্যাঞ্চল ছিল পোপের শাসনে এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চল ছিল স্পেনের বুরবোঁ রাজাদের নিয়ন্ত্রণে। এমনকি ইটালিয় ভাষা ও একটি সাধারণ ভাষায় রূপান্তরিত হতে পারে নি এবং তখনও অনেক আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভাষা প্রচলিত ছিল।

1830 এর দশকে যোসেফ ম্যাৎসিনি ঐক্যবদ্ধ ইটালীয় প্রজাতন্ত্রের জন্য এক সুসংগত কার্যক্রম তৈরি করার চেষ্টা করে। তিনি তাঁর লক্ষ্যগুলোকে প্রসার করার জন্য ইয়ং ইটালি নামে এক গোপন সমিতিও গড়ে তোলেন। 1831 এবং 1848 -এর বৈপ্লবিক আন্দোলনের ব্যর্থতা মানে হল যে, এখন যুদ্ধের মাধ্যমে ইটালীয় রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব সার্ডিনিয়া-পিড-মন্টের শাসক রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের উপর এসে পড়ে। এই অঞ্চলে শাসক অভিজাত বর্গের দৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ ইটালি তাদের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সম্ভাবনা প্রদান করে।

প্রধানমন্ত্রী ক্যাভুর যিনি ইটালির অঞ্চলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলনে নেতৃত্ব

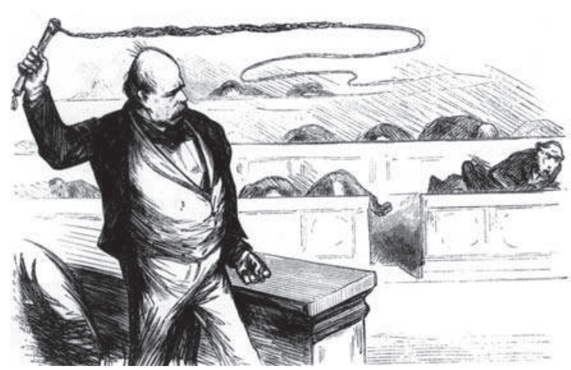

চিত্র 13 — জার্মান রাইকস্ট্যাগ (সংসদ)-এ অটো ভন বিসমার্কের ব্যঙ্গাচিত্র, ফিগারো থেকে, ভিয়েনা, 5 ই মার্চ, 1870.

কার্যাবলি

ব্যঙ্গাচিত্রটি বর্ণনা করো। এখানে বিসমার্ক এবং সংসদের নির্বাচিত ডেপুটিদের মধ্যে কীরকম সম্বন্ধ দেখা যায়? এখানে চিত্রশিল্পী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলোর কি ব্যাখ্যা করতে চান?

দেন, তিনি না ছিলেন বৈপ্লবিক না ছিলেন গণতন্ত্রবাদী। ইটালীয় অভিজাতবর্গের অনেক সম্পদশালী এবং শিক্ষিত সদস্যদের মত তিনি ইটালীয় ভাষার চাইতে ফরাসি ভাষার অনেক ভালো বলতে পারতেন। ফ্রান্সের সঙ্গে এক কৌশলি কূটনৈতিক চুক্তির দ্বারা, যার পিছনে ক্যাভুরের হাত ছিল, সার্ডিনিয়া-পিডমন্ট 1859-এ অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। নিয়মিত সৈন্য বাহিনী ছাড়া ও প্রচুর সংখ্যক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। 1860-এ তারা দক্ষিণ ইটালী এবং দুই সিসিলির রাজ্যে অভিযান চালায় এবং স্পেনীয় শাসকদের বিতাড়িত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষকদের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। 1861 সালে ভিক্টর দ্বিতীয় ইমানুয়েল ঐক্যবন্ধ ইটালির রাজা ঘোষিত হন। যদিও ইটালির অধিকাংশ অধিবাসী যাদের মধ্যে নিরক্ষর তার হার খুব বেশি তখনও উদারবাদী জাতীয়তাবাদী আদর্শবাদ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। দক্ষিণ ইটালিতে অধিকাংশ কৃষকরা যারা গ্যারিবল্ডিকে সমর্থন করেছিল তারা ইটালিয়া (Italia) সম্পর্কে শুনেই নি এবং বিশ্বাস করত যে, *'লা টালিয়া' (La Talia)* ছিলেন ভিক্টর ইমানুয়েলের স্ত্রী।

কার্যাবলি

চিত্র 14 (ক) এর দিকে তাকাও। তুমি কি মনে কর এই অঞ্চলগুলোর যে-কোনো একটিতে বসবাসকারী লোকেরা নিজেদের ইটালীয় ভাবে? চিত্র 14(খ) পরীক্ষা কর। ঐক্যবন্ধ ইটালীর একটি অংশে পরিণত হওয়া প্রথম অঞ্চল কোন্‌টি ছিল? কোন্ অঞ্চলটি সর্বশেষ যুক্ত হয়েছিল? কোন বছর অধিকাংশ রাজ্য যুক্ত হয়েছিল?

চিত্র 14 (ক) — ঐক্যবন্ধ হওয়ার পূর্বে ইটালীয় রাজ্যগুলো, 1858.

চিত্র 14 (খ) — ঐক্যবন্ধ হওয়ার পর ইটালি।
মানচিত্রে বিভিন্ন রাজ্যগুলোর ঐক্যবন্ধ ইটালীর অংশে পরিণত হওয়ার বছরগুলো প্রদর্শিত হয়েছে।

4.3 ব্রিটেনের আশ্চর্য ঘটনা

কিছু পণ্ডিত যুক্তি দেন যে, রাষ্ট্র বা রাজ্যের আদর্শ হল গ্রেট ব্রিটেন। ব্রিটেনে জাতি রাজ্যের গঠন হঠাৎ বিপর্যয় কিংবা বিপ্লবের ফলে হয়নি। এটা ছিল দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার

ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ছিল না। ব্রিটিশ দ্বীপসমূহে বসবাসকারী লোকদের প্রাথমিক পরিচয় ছিল জনগোষ্ঠীগত যেমন ইংরেজ, ওয়েলশ, স্কট্ বা আইরিশ প্রভৃতি। এই সব জাতিগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু যখন ইংরেজ রাষ্ট্রের সম্পদ, গুরুত্ব এবং শক্তি বৃদ্ধি পেল তখন দ্বীপসমূহের অন্য রাষ্ট্রগুলোর উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল। দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে ইংরেজ সংসদ যা 1688 তে রাজতন্ত্র থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই সংসদের মাধ্যমে একটি জাতি রাজ্য গঠিত হয় যার কেন্দ্রে ইংল্যান্ড ছিল। ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের মধ্যে ইউনিয়ন আইন (1707) এর মাধ্যমে 'ইউনাইটেড কিংডম অফ গ্রেট ব্রিটেন' গঠিত হয়। এর ফলে বস্তুত ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ডের উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে ব্রিটিশ সংসদ ইংরেজ সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ব্রিটিশ পরিচয়ের বিকাশের অর্থ হল যে স্কটল্যান্ডের বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুব্যবস্থিতভাবে দমন করা হয়েছিল। স্কটল্যান্ডের পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী ক্যাথলিক গোষ্ঠীগুলো যখনই তাদের স্বাধীনতা ব্যক্ত করার চেষ্টা করে তাদের কঠোর দমনের সম্মুখীন হতে হয়। স্কটল্যান্ডের পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীদের তাদের গেলিক ভাষা বলতে অথবা তাদের জাতীয় পোষাক পড়তে বাধা দেওয়া হত এবং অধিকাংশ লোককে তাদের জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়।

আয়ারল্যান্ডেরও একই পরিণতি হয়। এই দেশটি ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কঠোরভাবে বিভক্ত হয়। ইংরেজরা অধিকাংশ ক্যাথলিকভুক্ত দেশের উপর আয়ারল্যান্ডের প্রটেস্টান্টদের কর্তৃত্ব স্থাপনে সহায়তা করেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকদের বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দমন করা হয়েছিল। ওয়ল্ফ টোনে এবং তার ঐক্যবদ্ধ আইরিশবাসীদের (1798) নেতৃত্বে অসফল বিদ্রোহের পর আয়রল্যান্ডকে জোর করে 1801-এ ইউনাইটেড কিংডমে সংযুক্ত করা হয়। ইংরেজ সংস্কৃতির কর্তৃত্বের বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে এক নতুন ব্রিটিশ রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। নতুন ব্রিটিশের প্রতীকগুলো ব্রিটিশ পতাকা (Union Jack), জাতীয় সংগীত (God Save Our Noble King), ইংরেজি ভাষাকে সক্রিয়ভাবে উন্নীত করা হয় এবং পুরনো রাষ্ট্রগুলো এই ইউনিয়নের শুধুমাত্র সহযোগী অংশীদার রূপে বেঁচে থাকে।

কার্যাবলি

চিত্রশিল্পী চিত্রে দেখিয়েছেন গ্যারিবল্ডি জুতার তল ধরে রাখছেন যাতে সার্ডিনিয়া-পিডমন্টের রাজা উপর থেকে তাঁর পা প্রবেশ করাতে পারেন. আরেকবার ইটালির মানচিত্রের দিকে দেখা যাক। এই ব্যঙ্গচিত্র কী বলার চেষ্টা করছে?

বক্স 2

যোসেফ গ্যারিবল্ডি [Giuseppe Garibaldi (1807-82)**]** সম্ভবত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইটালীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি উপকূলীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং বাণিজ্যিক নৌবাহিনীর একজন নাবিক ছিলেন। 1833-এ তিনি মাৎসিনির সঙ্গে দেখা করেন এবং নব্য ইতালি আন্দোলনে যোগদান করেন এবং 1834-সালে পিড্-মন্টে প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। এই বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল এবং গ্যারিবল্ডিকে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যেতে হয়, যেখানে তিনি 1848 পর্যন্ত নির্বাসিত জীবন কাটান। 1854 সালে দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলকে তাঁর ইটালীর রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে সমর্থন করেন। 1860 সালে গ্যারিবল্ডি দক্ষিণ ইতালিতে হাজার লোকের বিখ্যাত অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এই অভিযান চলাকালে নতুন স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেছল যাদের সংখ্যা প্রায় 30,000-এ পৌঁছেছিল। তারা লাল কুর্তা বাহিনী হিসেবেই জনপ্রিয় ছিল।

1867 সালে গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের এক সৈন্যদল রোমে প্যাপল রাজ্যে গিয়েছিল। সেখানে তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য ফরাসি সৈন্য অবস্থান করছিল যা ছিল ইটালীর একীকরণের শেষ বাধা। প্রমাণিত হল লাল কুর্তা বাহিনী ফরাসি ও প্যাপলের যৌথ বাহিনীর সমকক্ষ নয়। 1870-এ যখন প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সময় ফ্রান্স তার সৈন্যবাহিনী রোম থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। শুধুমাত্র তখনই প্যাপল রাজ্যগুলো ইটালীতে সংযুক্ত হয়েছিল।

চিত্র 15 – গ্যারিবল্ডি সার্ডিনিয়া-পিডমন্টের রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলকে ইটালি নামক জুতা পড়তে সাহায্য করছেন। 1859-এর ইংরেজি ব্যঙ্গচিত্র।

নতুন শব্দ

জনগোষ্ঠী — একটি সাধারণ জাতিগত, উপজাতিগত বা সাংস্কৃতিক মূল উৎস অথবা পটভূমি যার দ্বারা একটি জাতি পরিচিত হয় অথবা একটি জাতি বলে দাবি করে।

5 রাষ্ট্রের দৃশ্য কল্পনা

একজন শাসককে একটি চিত্র অথবা একটি মূর্তিতে প্রকাশ করা সহজ কিন্তু কে কীভাবে আঁকা যায়? অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশের দ্বারা একটি রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্য কথায় বলতে গেলে তাঁরা দেশকে এভাবে তুলে ধরেন যেন দেশ এক ব্যক্তি। রাষ্ট্রগুলোকে তখন নারীরূপে চিত্রিত করা হত। নারীরূপ যা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করার জন্য বাছা হয়েছিল তা বাস্তবের কোনো নির্দিষ্ট নারী বোঝায় না; বরং রাষ্ট্রের বিমূর্ত ধারণার এক বাস্তব রূপ ছিল। অর্থাৎ নারীর মূর্তি রাষ্ট্রের এক প্রতীকে পরিণত হল।

চিত্র 16 — 1850 এর ডাকটিকিট এখানে ম্যারিয়ানের ছবি প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করছে।

তোমাদের মনে থাকবে যে, ফরাসি বিপ্লবের সময় শিল্পীরা স্বাধীনতা, ন্যায় ও প্রজাতন্ত্রের মতো ধারণাগুলোকে ব্যক্ত করার জন্য নারী প্রতীককে ব্যবহার করেন। এই আদর্শগুলোকে বিশেষ বস্তু অথবা প্রতীকের মাধ্যমে চিত্রিত করেন। তোমাদের মনে আছে স্বাধীনতার প্রতীক হল লাল টুপি অথবা ভাঙা শিকল যেখানে ন্যায় সাধারণত দাড়িপাল্লা হাতে একজন চোখ বাঁধা নারীকে দেখানো হয়।

একই রকম নারী রূপকগুলোকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পীরা রাষ্ট্রকে চিত্রিত করতে আবিষ্কার করেছিলেন। ফ্রান্সে তাকে জনপ্রিয় খ্রিস্টীয় নাম ম্যারিয়ান দেওয়া হয় যা জনগণের রাষ্ট্রের ধারণাকে রেখাঙ্কিত করে। তার বৈশিষ্টগুলো স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্রের চিহ্ন — লাল টুপি, তিনবর্ণ এবং টুপির ফিতা দ্বারা চিত্রিত করাহয়। ঐক্যের জাতীয় প্রতীকগুলোকে স্মরণে রাখার জন্য এবং তার সাথে পরিচিত হবার প্রেরণা যোগানোর জন্য ম্যারিয়ানের মূর্তিগুলোকে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করা হয়। ম্যারিয়ানের ছবিগুলোকে মুদ্রা এবং ডাকটিকিটে অঙ্কিত করা হয়।

একইরকমভাবে জার্মানিয়া জার্মান রাষ্ট্রের প্রতীকে পরিণত হয়। চাক্ষুষ বর্ণনায় জার্মেনিয়া ওক গাছের পাতার মুকুট পরত যেহেতু জার্মান ওক বীরত্বের প্রতীক।

নতুন শব্দ

প্রতীক (Allegory) — যখন একটি বিমূর্ত ধারণা (উদাহরণস্বরূপ লোভ, ঈর্ষা, স্বাধীনতা, মুক্তি) একজন ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। একটি রূপকধর্মী গল্পের দুটো অর্থ আছে, এর একটা আক্ষরিক এবং অন্যটি প্রতীকী।

চিত্র 17 — জার্মানিয়া, ফিলিপ ভেট, 1848.
চিত্র শিল্পী জার্মানিয়ার এই চিত্রটি একটি সুতির কাপড়ের ধ্বজার উপর অঙ্কণ করেন কারণ একে সেন্ট পল চার্চের ছাদের ঝুলানো হবে যেখানে 1848-র মার্চে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট সংসদ আহ্বান করা হয়।

বক্স 3

প্রতীকগুলোর অর্থ

গুণ	গুরুত্ব
ভাঙ্গা শেকল	স্বাধীনতা পাওয়া
ঈগল ছাপ বর্ম	জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতীক — শক্তি
ওক গাছের পাতার মুকুট	বীরত্ব
তরোয়াল	যুদ্ধের জন্য তৈরি
তরোয়ালের উপর জড়িয়ে থাকা জলপাইয়ের ডাল	শান্তির ইচ্ছা
কাল, লাল এবং সোনালি তিনটি বর্ণ	1848-এ উদারবাদী, জাতীয়তাবাদীদের পতাকা, যা জার্মান রাজ্যগুলোর ডিউকরা নিষিদ্ধ করেন।
উদীয়মান সূর্যের রশ্মিগুলো	নতুন যুগের সূচনা

কার্যাবলি

বক্স 3-এ দেওয়া তালিকার সাহায্য নিয়ে ভেট-এর জার্মানীয়ার গুণাবলি সনাক্ত করো এবং ছবির প্রতীকী অর্থ প্রকাশ করো। 1836-এর এক পুরোনো রূপকধর্মী ছবিতে ভেট কাইজারের মুকুটকে চিত্রিত করেন যেখানে তিনি ছেঁড়া শেকল দেখিয়েছেন। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

চিত্র18 — নিপতিত জার্মেনীয়া, জুলিয়াস হুবনার, 1850.

কার্যাবলি

চিত্র 18 তে তুমি যা দেখতে পাচ্ছ তা বর্ণনা করো। রাষ্ট্রের এই রূপকধর্মী দৃশ্যে হুবনার কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে বোঝাতে চেয়েছেন?

চিত্র 19 — রাইন নদীতে প্রহরারত জার্মানিয়া
1860-এ চিত্রশিল্পী লরেঞ্জ ক্লাসেনকে এই চিত্র তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়। জার্মানিয়ার তলোয়ারে খোদিত হয় 'জার্মান তলোয়ার জার্মান রাইনকে রক্ষা করে।'

কার্যাবলি

আরেকবার চিত্র 10 এর দিকে দেখা যাক্। কল্পনা করো তুমি 1848 এর মার্চে ফ্র্যাঙ্কফুর্টের একজন নাগরিক এবং সংসদের সভা চলাকালীন সেখানে উপস্থিত। হল অফ ডেপুটিজে বসা একজন পুরুষ (ক) হিসাবে এবং প্রদর্শনী কক্ষে বসা একজন নারী পর্যবেক্ষক (খ) হিসাবে ছাদে ঝোলানো জার্মানিয়ার ধ্বজাকে তুমি কীভাবে বর্ণনা করবে?

6 জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে জাতীয়তাবাদ তার আদর্শবাদী উদারবাদী প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারাকে আর অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি যা শতাব্দীর প্রথমভাগে ছিল। এটি তখন একটি সংকীর্ণ মতাদর্শে পরিণত হয় যার লক্ষ্য সীমিত ছিল। এই সময়কালে জাতীয়তাবাদী দলগুলো পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল এবং লড়াইয়ের জন্য সর্বদায় প্রস্তুত ছিল। ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তি বর্গ পর্যায়ক্রমে তাদের নিজস্ব লক্ষ্যগুলো পূরণ করার জন্য অধীনস্থ লোকদের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খাগুলোকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন।

1871 এরপর ইউরোপের সবচেয়ে গুরতর জাতীয়তাবাদী উত্তেজনার উৎস ছিল বলকান অঞ্চল। এই অঞ্চলে ভৌগোলিক এবং জাতিগত ভিন্নতা ছিল। এখানে আধুনিক রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস, ম্যাসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হারজে-গোবিনা, শ্লোভেনিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণভাবে স্লাভ নামে পরিচিত। বল্কান অঞ্চলের এক বৃহদাংশ অটোমান সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বল্কান অঞ্চলে আবেগ তাড়িত জাতীয়তাবাদের ধারণার প্রসারের সঙ্গে অটোমান সাম্রাজ্যের ভাঙন এই অঞ্চলকে অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ অঞ্চলে পরিণত করেছিল। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে অটোমান সাম্রাজ্য আধুনিকীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে চেয়েছিল কিন্তু খুব বেশি সফল হয় নি। একের পর এক এর অধীন ইউরোপীয় জাতিরা নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যায় এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বল্কান অঞ্চলের লোকেরা তাদের স্বাধীনতা কিংবা রাজনৈতিক অধিকার জাতীয়তার উপর ভিত্তি করেই দাবী রাখে। ইতিহাসকে ব্যবহার করেছিল এটা প্রমাণ করার জন্য যে, তারা একসময় স্বাধীন ছিল কিন্তু এরপর বিদেশী শক্তিগুলোর দ্বারা অধিকৃত হয়। তাই বলকান অঞ্চলের বিদ্রোহী জাতিরা তাদের সংগ্রামকে দীর্ঘসময় ধরে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার প্রয়াস বলে মনে করে।

যখনই বিভিন্ন স্লাভ জাতিগুলো তাদের নিজেদের পরিচয় এবং স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়, বল্কান অঞ্চল একটি তীব্র লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বল্কান রাজ্যগুলো পরস্পর পরস্পরের প্রতি খুব ঈর্ষা করত এবং প্রত্যেক রাজ্য অন্যদের সরিয়ে নিজের জন্য বেশি এলাকা দখল করার আশা পোষণ করত। পরিস্থিতি আরও বেশি জটিল এই কারণে হয়েছিল যে, বল্কান অঞ্চল বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই সময় ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে ব্যবসা ও উপনিবেশের সঙ্গে নৌসেনা এবং সামরিক বাহিনীর শক্তি নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। বল্কান সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলো প্রবল আকার ধারণ করে। রাশিয়া, জার্মানি, ইংল্যান্ড, অস্ট্রো — হাঙ্গেরির মতো প্রত্যেক শক্তি বল্কান অঞ্চলে অন্যদের প্রভাবমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। এর ফলে এই অঞ্চলে অনেক যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

চিত্র 20 — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণকীর্তন করা এক মানচিত্র।
সবার উপরে দেবদূতদের স্বাধীনতার পতাকা বহন করতে দেখানো হয়েছে। চিত্রের অগ্রভাবে ব্রিটিশ রাষ্ট্রের প্রতীক — ব্রিটানিয়া (Britannia) জয়োল্লাসভাবে পৃথিবীর উপর বসে আছেন। উপনিবেশগুলোকে বাঘ, হাতি, বন এবং আদিম মানব প্রভৃতি ছবিগুলোর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বকে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় গৌরবের ভিত্তি হিসেবে দেখানো হয়।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয়তাবাদ 1914 সালে ইউরোপকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এই সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল সেখানে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিরোধ শুরু হয়। সর্বত্রই যেখানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনন গড়ে উঠেছিল, তারা সবাই জাতীয়তাবাদী ছিল এই অর্থে যে, তারা সবাই স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র গঠন করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা সবাই সামগ্রিক জাতীয় ঐক্যের ধারনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল যা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। জাতীয়তাবাদের ইউরোপীয় ধারণা কোথাও প্রতিফলিত হয়নি কারণ সর্বত্র জনগণ তাদের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট অথচ বিচিত্র জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু সমাজগুলো ‘জাতি রাষ্ট্রে’ সংগঠিত হওয়া উচিৎ এই ধারণাকে স্বাভাবিক এবং সর্বজনীন হিসাবে গৃহীত হয়।

সংক্ষেপে লিখ

Write in brief

1. নিম্নলিখি বিষয়গুলোর উপর টীকা লিখ :
   a) যোসেফ মাৎসিনি
   b) কাউন্ট ক্যামিলো ডে কাভ্যুর
   c) গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ
   d) ফ্র্যাঙ্কফোর্ট সংসদ
   e) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোতে নারীদের ভূমিকা
2. ফরাসীবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত পরিচয় তৈরি করার জন্য ফরাসি বিপ্লবীরা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল ?
3. ম্যারিয়েন ও জার্মানিয়া কারা ছিলেন ? যেভাবে তাঁদের চিত্রিত করা হয়েছে তার গুরুত্ব কী ছিল ?
4. জার্মান একীকরণ প্রক্রিয়ার সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।
5. নিজের শাসিত অঞ্চলগুলোতে শাসনব্যবস্থাকে আরও বেশি দক্ষ করার জন্য নেপোলিয়ন কী কী পরিবর্তন সাধন করেছিলেন ? বর্ণনা করো।

আলোচনা কর :

Discuss

1. 1848 -এর উদারবাদীদের বিপ্লবের অর্থ কী বর্ণনা করো। উদারবাদীরা কোন্ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ধারণাকে সমর্থন করত ?
2. ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উত্থানে সংস্কৃতির অবদান কী ছিল — তিনটি উদাহরমের সাহায্যে দেখাও।
3. যে-কোনো দুটি রাষ্ট্রের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কীভাবে রাষ্ট্রগুলোর উথান ঘটেছিল বর্ণনা দাও।
4. ব্রিটেনে জাতীয়তাবাদের ইতিহাস ইউরোপের অন্যান্য অংশের তুলনায় কীরকম ভিন্ন ছিল ?
5. বল্কান অঞ্চলে কেন জাতীয়তাবাদী উত্তেজনার জন্ম হয়েছিল ?

প্রকল্প

Project

ইউরোপের বাইরের দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী প্রতীকগুলোর সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের করো। এক কিংবা দুটো দেশের ছবি পোস্টারস অথবা যন্ত্র সংগীতের উদাহরণ সংগ্রহ করো যা জাতীয়তাবাদের প্রতীক। এইগুলো ইউরোপীয় উদাহরণগুলো থেকে কীভাবে ভিন্ন ছিল ?

ইন্দোচিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

The Nationalist Movement in Indo-China

1945 সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আগে, আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েতনাম স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু গণপ্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানকার জনগণকে আরও তিন দশক পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ তথা আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ইন্দোচিনের উপর আধারিত এই অধ্যায়ে তোমরা উপসাগরীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভিয়েতনাম সম্পর্কে জানতে পারবে। ইন্দোচিনের জাতীয়তাবাদের উত্থান উপনিবেশিক পরিস্থিতিতে হয়েছিল। ভিয়েতনামের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রিত করে আধুনিক ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আংশিকভাবে উপনিবেশিকতাবাদেরও অবদান ছিল। অন্যদিকে এটাও সত্য ছিল যে, এই রাষ্ট্রের স্থাপন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে হওয়া সংঘর্ষের ফলেই হয়েছিল।

যদি তোমরা ইন্দোচিনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সাথে ভারতবর্ষের ঘটনাগুলোর মিলিয়ে দেখো, তবে তোমরা উপনিবেশিক শাসনের ক্রিয়াকলাপ এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিকাশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য খুঁজে পাবে। এই ধরনের বিভিন্নতা ও সাদৃশ্যগুলো লক্ষ করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কীভাবে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয় এবং সমসাময়িক বিশ্বকে একটি নতুন রূপ প্রদান করে।

চিত্র 1 – ইন্দোচিনের মানচিত্র

1 চিনের অধীনতা থেকে মুক্তি

ইন্দোচিন বর্তমানে, ভিয়েতনাম, লাউস এবং কম্বোডিয়া এই তিনটি দেশ মিলে গঠিত হয়েছে (1 নং চিত্রতে দেখো)। এই সমগ্র অঞ্চলের ইতিহাস দেখার পর জানা যায় যে, প্রথমদিকে এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল এবং সমগ্র অঞ্চলটিতে চিনা সাম্রাজ্যের শক্তিশালী আধিপত্য কায়েম ছিল। বর্তমানে উত্তর এবং মধ্য ভিয়েতনাম বলে পরিচিত দেশটি যখন একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন সেই দেশের শাসকেরা শুধুমাত্র চিনা শাসন ব্যবস্থারই অনুকরণ করেনি। পাশাপাশি তারা চিনা সাংস্কৃতিকেও রপ্ত করে নিয়েছিল।

সামুদ্রিক রেশম পথ (maritime silk route) নামে পরিচিত রাস্তাটির সাথেও ভিয়েতনাম যুক্ত ছিল। এই রাস্তাটি দিয়ে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী, মানুষ এবং মানুষের বিচার ধারার আদানপ্রদান চলত। বাণিজ্যের অন্য রাস্তার মধ্য দিয়ে ভিয়েতনাম সেই দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকত, যেখানে অ-ভিয়েতনামী সম্প্রদায় যেমন - খমের (Khmer) এবং কম্বোডিয়া সম্প্রদায় বসবাস করত।

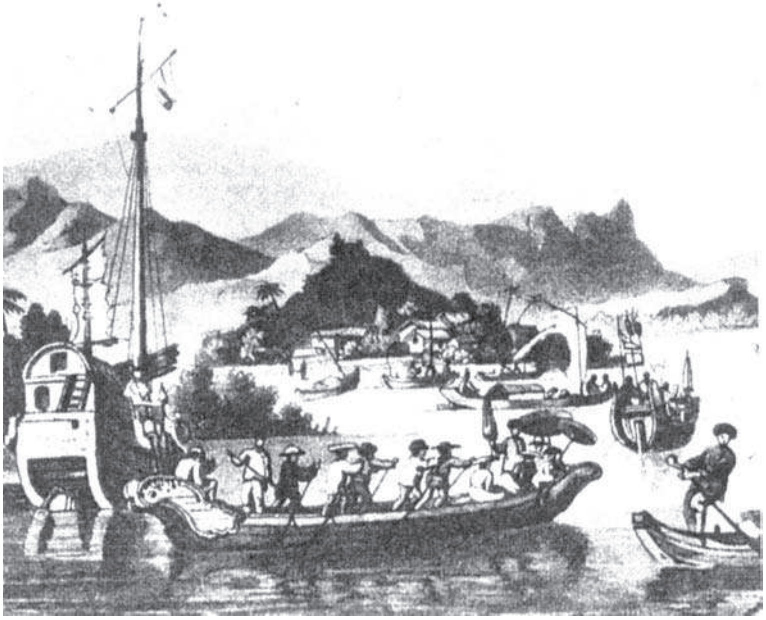

চিত্র 2 – ফাইফো সমুদ্র বন্দর।
পর্তুগীজ বণিকেরা এই সমুদ্র বন্দরটির প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটি একমাত্র বন্দর ছিল, যেটা ইউরোপীয় ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকে ব্যবহার করত।

1.1 উপনিবেশিক আধিপত্য এবং তার প্রতিরোধ

ভিয়েতনামে ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপন হওয়ার পর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিয়েতনামি জনগণের সাথে উপনিবেশিক শাসকদের সংঘর্ষ চলতে থাকে। ফরাসিদের সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ সামরিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ভিয়েতনামি সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ফরাসিদের সুপরিকল্পিত প্রয়াস ছিল। ফ্রান্সবাসী এবং তাদের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভিয়েতনামে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়।

চিত্র 3 – ফ্রান্সিস গার্নিয়ার, যিনি ক্ষমতাসীন নগুয়েন রাজবংশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁকে রাজদরবারি সৈনিকেরা হত্যা করেছিল।
ফ্রান্সিস গার্নিয়ার সেই ফরাসি দলের সদস্যদের একজন ছিল, যারা মেকং নদীর অনুসন্ধান করেছিল। 1873 সালে ফরাসিরা ফ্রান্সিস গার্নিয়ারকে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত টংকিন (Tonkin) অঞ্চলে ফরাসি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিল। তিনি টংকিন এর রাজধানী হ্যানোই (Hanoi) এর উপর হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি মারা যান।

ফ্রান্স 1858 সালে ভিয়েতনামের মধ্যে সৈন্য অভিযান চালায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে ফরাসিরা শক্তিশালীভাবে কব্জা করে। ফরাসি চিন যুদ্ধের পর ফরাসিরা টংকিন এবং অনাম অধিগ্রহণ করে নিয়েছিল এবং 1887 সালে ইন্দোচিনে ফরাসিরা উপনিবেশ স্থাপন করে। পরবর্তী দশকে ফরাসিরা তাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করতে চেয়েছিল অপরদিকে ভিয়েতনামী লোকেরা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল যে, ফরাসিদের হাতে তারা কী কী হারিয়েছে। এই চিন্তা-ভাবনা এবং সংঘর্ষ থেকে ভিয়েতনামে জাতীয়তাবাদীরা ফরাসিদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

চিত্র 4 – ফরাসি অনুসন্ধানকারী বাহিনীর দ্বারা তৈরি করা মেকং নদীর একটি চিত্র। এই অনুসন্ধানকারী দলের মধ্যে ফ্রান্সিস গার্নিয়ার ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
পৃথিবীর সব উপনিবেশিকরা নদীসমূহের অনুসন্ধান করে এবং তার নক্‌শা তৈরি করে। উপনিবেশ স্থাপনকারীরা নদীর গতিপথ, তার উৎসস্থল এবং নদীগুলো কোন্ কোন্ ভূ-খণ্ড দিয়ে প্রবাহিত হত, তা জানার জন্য সচেষ্ট থাকত। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে নদীগুলোকে বাণিজ্য এবং পরিবহণের জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেত। এই অনুসন্ধানী অভিযানের সময় অজস্র ছবি এবং নক্‌শা প্রস্তুত করা হত।

বিখ্যাত দৃষ্টিশক্তিহীন কবি নগুয়েন দিন ছিঁও (Ngyuyen Dinh Chieu) (1822-88) নিজের দেশের পরিস্থিতির উপর শোক ব্যক্ত করে লিখেছেন :

আমি বরং চির অন্ধকার দেখতে রাজি আছি,
কিন্তু আমি রাজদ্রোহীদের মুখ দেখতে রাজি নই।
আমি বরং কোনো মানুষ দেখব না,
কিন্তু কোনো মানষের পীড়া দেখতে চাই না,
আমি বরং কিছুই দেখবো না,
কিন্তু দেশকে টুকরো টুকরো হতে দেখতে চাই না।

1.2 ফরাসিদের মতে উপনিবেশ কেন প্রয়োজন ছিল

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলোকে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করা হত। এছাড়াও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মত ফ্রান্স ও মনে করেছিল যে, পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া সমাজের কাছে সভ্যতার সুফলগুলোকে পৌঁছে দেওয়া 'উন্নত' ইউরোপীয় দেশগুলোর অন্যতম দায়িত্ব ও লক্ষ্য ছিল।

ফরাসিরা মেকং ব-দ্বীপ (Mekong delta) অঞ্চলে কৃষির প্রসারের জন্য খাল নির্মাণ এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা শুরু করে। জলসেচের সুবিশাল ব্যবস্থা তৈরি করা হয়, এবং বেগার শ্রমের মাধ্যমে অনেক খাল ও নালা নির্মাণ করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং ভিয়েতনাম আন্তর্জাতিক বাজারে তার দেশের উৎপন্ন ধান রপ্তানি করত। 1873 সালে কেবলমাত্র 274,000 হেক্টর জমিতে ধান চাষ হত। 1900 সালে ধান চাষের জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 11 লক্ষ হেক্টর, এবং যথাক্রমে 1930 সালে কৃষি জমির পরিমাণ বেড়ে হয় 22 লক্ষ হেক্টর। ভিয়েতনাম ধান উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করত এবং 1931 সালের দিকে ভিয়েতনাম পৃথিবীর মধ্যে ধান রপ্তানিকারক তৃতীয় বৃহত্তম দেশে পরিণত হয়।

ঠিক এইভাবে ব্যবসায়িক পণ্য সামগ্রির পরিবহণে সহযোগিতা সৈন্যবাহিনীর যাতায়াত এবং সমগ্র অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য পরিকাঠামোগত প্রকল্পের রূপায়ণ করা হয়। ইন্দো-চিন দিয়ে অতিক্রম হওয়া একটি বিশাল রেলপথ প্রস্তুত করা হয়, এই রেলপথের মাধ্যমে ভিয়েতনামের উত্তর ও দক্ষিণ অংশ চিনের সাথে যুক্ত হয়। এই সুদীর্ঘ রেলপথটি চিনে অবস্থিত য়ুনান (Yunan) পর্যন্ত যাতায়াত করত এবং 1910 সালের দিকে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়, এছাড়াও সেই সময় আরও একটি রেল লাইনের নির্মাণ করা হয়, যেটা কম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেন (Phnom Penh) হয়ে ভিয়েতনাম থেকে সিয়াম (Siam) (সেইসময় থাইল্যাণ্ডকে এই নামে জানা যেত) দেশ পর্যন্ত যাতায়াত করত।

1920 এর দশকের দিকে, ফরাসি ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা লাভের তাগিদে পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করার জন্য ভিয়েতনাম সরকারের উপর প্রবল চাপ দিতে থাকে।

1.3 উপনিবেশের উন্নতি করার কী প্রয়োজনীয়তা আছে ?

এই ব্যাপারে সবাই একমত ছিল যে, উপনিবেশগুলো তাদের মাতৃভূমির স্বার্থে কাজ করবে। কিন্তু প্রশ্ন হল কীভাবে? প্রভাবশালী লেখক এবং নীতি প্রস্তুতকারক পোল বার্নার্ড (Paul Bernard)-এর মতো কিছু লোকের বিশ্বাস ছিল যে, উপনিবেশগুলোর

কার্যাবলি

খাল নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করেছে এই রকম একজন ভিয়েতনামি শ্রমিক ও একজন ফরাসি উপনিবেশিক এর মধ্যে কথোপকথনের কল্পনা করো। ফরাসি লোকেদের ধারণা ছিল যে, তারা সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকেদের সভ্যতার আলোর মধ্যে নিয়ে এসেছে। যেখানে ভিয়েতনামি শ্রমিকেরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত পোষণ করে। শ্রেণিকক্ষে জোড়া তৈরি করো এবং এই অধ্যায়ে দেওয়া সাক্ষ্য অনুসারে এই কথোপকথনটি মঞ্চস্থ করো।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। তার বক্তব্য ছিল যে, মুনাফা অর্জনের জন্যই উপনিবেশ স্থাপন করা হত। যদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যায়, তবে মানুষের জীবন-জীবিকার ও উন্নয়ন ঘটে, এর ফলে মানুষ অধিক পরিমাণে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। ফলস্বরূপ বাজার সম্প্রসারিত হবে, যাতে করে ফরাসি ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে।

বার্নাডের মতে, ভিয়েতনামে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনেক বাধা রয়েছে। যেমন - দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি ছিল, কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ কম ছিল এবং কৃষকেরা অধিক মাত্রায় ঋণে জর্জরিত ছিল। ভিয়েতনামে গ্রামীণ দরিদ্রতা হ্রাস এবং কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল ভূমি সংস্কারের, যেমনটা জাপানে 1890 এর দশকে হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে সবার কর্মসংস্থান হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। জাপান দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কোনো একটি দেশের অর্থব্যবস্থাকে মজবুত তথা অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে শিল্পায়ন অত্যন্ত আবশ্যক।

ভিয়েতনামের উপনিবেশিক অর্থব্যবস্থা মুখ্যভাবে ধান চাষ ও রাবার বাগানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এইগুলোর উপর ফ্রান্স এবং ভিয়েতনামের মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণির মালিকানা ছিল। এই অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য রেল এবং সমুদ্র বন্দরের পরিষেবা প্রদান করা হয়। রাবার বাগানের কাজে ব্যাপকভাবে চুক্তিবন্ধ (Indentured) ভিয়েতনামি শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হত। বার্নাড এর রায়ের বিপরীতে ভিয়েতনামের শিল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে ফরাসিদের বিশেষ কোনো চেষ্টা ছিল না। গ্রামীণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে জমিদারদের কর্তৃত্ব বজায় ছিল এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার মান অবনমিত হয়।

নতুন শব্দ

চুক্তিবন্ধ শ্রমিক (Indentured labour) — ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাগিচা চাষ এবং কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এক ধরনের শ্রমিক ব্যাপকভাবে নিযুক্ত করা হত। শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করা হত চুক্তিবন্ধ ভাবে, যেখানে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু মালিকদের অধিকার ছিল অসীম। চুক্তি অনুসারে শ্রমিকরা যদি কাজগুলো সম্পূর্ণ না করতে পারত, তাহলে মালিকরা তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারত এবং শ্রমিকদের শাস্তি দিত ও কারাগারে নিক্ষেপ করত।

চিত্র 5 – ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভিয়েতনামে একজন ফরাসি অস্ত্র ব্যবসায়ী জিন ডুপুইস
এমন অনেক লোক ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনের জন্য ভিয়েতনামে ঘুরে বেড়াত। এই অস্ত্র ব্যবসায়ী তাদের একজন ছিল, যিনি ভিয়েতনামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য ফরাসিদের উৎসাহিত করত।

2 উপনিবেশিক শিক্ষার সংকট

ফরাসি উপনিবেশবাদ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শোষণকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেনি। এই উপনিবেশিকতাবাদ 'সভ্য অভিযানের' ধারণার দ্বারাও চালিত ছিল। যেইভাবে ইংরেজরা ভারতবর্ষে 'সভ্য অভিযানের' দাবি করেছিল, ঠিক সেইভাবেই ফরাসিদেরও দাবি ছিল যে, ভিয়েতনামে তারা আধুনিক সভ্যতার সূচনা করেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইউরোপে সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা কায়েম ছিল। অতএব ইউরোপীয়দের দায়িত্ব ছিল যে ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে আধুনিক ধ্যান ধারণার প্রসার ঘটানো, এমনকি এটা করতে গিয়ে যদি স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্ম এবং পরম্পরা প্রভৃতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। কারণ ইউরোপীয় শাসকদের কাছে তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও পরম্পরাগুলো বেশ সেকেলের বলে প্রতীত হয়েছিল এবং ইউরোপীয়দের মনে হয়েছিল যে, এইগুলো আধুনিক বিকাশকে প্রতিহত করছে।

স্থানীয় অধিবাসীদের সভ্য করার ক্ষেত্রে শিক্ষাকে একটি অন্যতম উপায় হিসেবে দেখা হত। কিন্তু ভিয়েতনামে শিক্ষার প্রসারের আগে ফরাসিদের আরও একটি সংকটের সমাধান করতে হয়েছিল। সংকটটা ছিল যে, ভিয়েতনামিদের কতটুকু শিক্ষিত করা হবে? ফরাসিদের শিক্ষিত স্থানীয় শ্রমশক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের একটি ভয় ছিল যে, এই কর্মীদের শিক্ষিত করার ফলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যদি একবার ভিয়েতনামিরা শিক্ষিত হয়ে উঠে, তাহলে তারা উপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে। তাছাড়া ভিয়েতনামে বসবাসকারী ফরাসি নাগরিকদের (যাদের কোলন (colons) বলা হত) একটি ভয় ছিল, যদি ভিয়েতনামিরা শিক্ষিত হয়ে উঠে, তাহলে ফরাসিদের শিক্ষক, দোকানদার এবং পুলিশের মতো চাকুরিগুলো হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। এইজন্যই ফরাসিরা ভিয়েতনামিদের জন্য পুরোপুরি ফরাসি শিক্ষানীতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিরোধী মত পোষণ করেছিলেন।

2.1 আধুনিক চিন্তা-ধারণা

শিক্ষাক্ষেত্রে ফরাসীরা আরেকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ভিয়েতনামের ধনাঢ্য এবং অভিজাত শ্রেণিরা ভীষণভাবে চিনের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ফরাসিদের ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য ভিয়েতনামিদের উপর থেকে চিনের প্রভাবকে মুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ফরাসিরা ধারাবাহিকভাবে ভিয়েতনামের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ইতি টানে, এবং ভিয়েতনামিদের জন্য ফরাসিরা তাদের মতো স্কুল স্থাপন করেছিল। কিন্তু এটা এতটা সহজ কাজ ছিল না। তখন সমাজের ধনাঢ্য এবং অভিজাত শ্রেণিরা চিনা ভাষার ব্যবহার করত, যার অপসারণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চিনা ভাষার পরিবর্তে কোন্ ভাষা স্থান পাবে? চিনা ভাষাকে বাদ দিয়ে মানুষ ভিয়েতনামি ভাষার ব্যবহার করবে, নাকি ফরাসি ভাষার ব্যবহার করবে?

প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে দুটি অভিমত ছিল। কিছু নীতি প্রস্তুতকারক ফরাসি ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার উপর জোর দিয়েছিলেন। ফরাসিরা মনে করত যে, ফরাসি ভাষা শেখার মাধ্যমে ভিয়েতনামি লোকেরা ফ্রান্সের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সাথে পরিচিত হবে। এইভাবে "ইউরোপীয় ফ্রান্সের সাথে এশিয়াটিক ফ্রান্সের" সুদৃঢ় বন্ধন তৈরিতে ভাষাটি সহায়ক হবে। ভিয়েতনামের শিক্ষিত লোকেরা ফরাসি দর্শন এবং আদর্শকে সম্মান জানাবে এবং ফরাসি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে গ্রাহ্য করবে ও ফরাসিদের জন্য মনোযোগ দিয়ে কাজ করবে। ফরাসি ভাষা শিক্ষাদানের

একমাত্র মাধ্যম হওয়ায় অনেকে তার বিরোধিতা করেছেন। তাদের অভিমত ছিল যে, ভিয়েতনামি ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দান এবং ফরাসি ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করতে হবে। তারা চেয়েছিল যে, সামান্য সংখ্যক লোক যারা ফরাসি ভাষা এবং সংস্কৃতি আয়ত্ত্ব করেছিল, পুরস্কার হিসেবে তাদের ফ্রান্সের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে।

তবে স্কুলে নাম নথিভুক্ত করার সামর্থ্য একমাত্র দেশের সামান্য সংখ্যক ভিয়েতনামি অভিজাত শ্রেণিদের কাছেই ছিল এবং স্কুলে ভরতি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীরাই সফলতার সহিত বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত। কারণ অনেক শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত বৎসরের পরীক্ষাতে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করানো হত, যাতে করে তারা ভালো কাজ তথা চাকুরির যোগ্যতা অর্জন করতে না পারে। সাধারণত দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীদের এইভাবেই ফেল করানো হত। 1925 সালের 1.7 কোটি মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল 400 থেকেও কম।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ফরাসিদের গুণকীর্তন করা হত এবং উপনিবেশিক শাসনকে সঠিক বলা হত। ভিয়েতনামিদের আদিম এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় হিসেবে দেখানো হত, যারা দৈহিক শ্রমে সক্ষম ছিল কিন্তু বৌদ্ধিক কাজের জন্য উপযুক্ত ছিল না। তারা কৃষিক্ষেত্র তথা মাঠে কাজ করতে পারত। কিন্তু নিজেদের শাসনকার্য নিজেরা চালাতে পারত না। তাদের কোনো সৃজনশীল ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু তারা অনুকরণে দক্ষ ছিল। স্কুলের শিক্ষার্থীদের শেখানো হত যে, একমাত্র ফরাসি শাসনই ভিয়েতনামে শান্তি সুনিশ্চিত করতে পারে। যখন থেকে ভিয়েতনামে ফরাসি শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন থেকে ভিয়েতনামের কৃষকেরা ডাকাতের ভয় থেকে মুক্তি পায় চারদিকে শান্তি বজায় ছিল এবং কৃষকেরা মন দিয়ে কাজ করতে পারত।

2.2 আধুনিকতার প্রত্যাশা

1907 সালে টনকিন ফ্রি স্কুল (Tonkin Free School) চালু হয়, এই স্কুলে পাশ্চাত্য অনুকরণে শিক্ষা প্রদান করা হত। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিজ্ঞান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ফরাসি ভাষা অন্তর্ভুক্ত ছিল (পঠন পাঠন সন্ধ্যা বেলায় হত এবং প্রত্যেকটি ক্লাসের জন্য আলাদা করে বেতন তথা অর্থ দিতে হত)। এই স্কুলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিতে 'আধুনিকতা' বলতে যা বোঝায়, তা সেই সময়কার প্রচলিত চিন্তাধারার একটি ভালো উদাহরণ। স্কুলগুলোর মতে শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ধারণাগুলোকে রপ্ত করাই যথেষ্ট ছিল না। আধুনিক হওয়ার জন্য ভিয়েতনামিদের পাশ্চাত্য লোকেদের মতো দেখতেও আধুনিক হতে হত। এই স্কুল, শিক্ষার্থীদের পাশ্চাত্য আদব-কায়দা রপ্ত করার জন্য উৎসাহিত করত, যেমন - শিক্ষার্থীদের ছোটো করে চুল রাখার জন্য বলা হত। ভিয়েতনামিদের জন্য তা ছিল নিজেদের পরিচয়কে পুরোপুরোভাবে বদলে দেওয়ার ব্যাপার। কারণ তারা ঐতিহ্যগতভাবে লম্বা চুলই রাখত। এই আমূল পরিবর্তনের গুরত্বকে স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য একটি 'চুল কাটানোর শ্লোক'ও লেখা হয়েছিল

> বাঁ হাতে চিরুনি ধরো, ডান হাতে কাঁচি
> কুচ, কুচ, কাঁপচি, কাঁপচি।
> হুঁশিয়ার, সতর্ক থাকো,
> অবুঝ অভ্যাস ছাড়ো, শিশুসুলভ কাজ কেন কর।
> খোলাখুলিভাবে অকপটে কথা বলো,
> পাশ্চাত্য আদব-কায়দা শেখো।

কার্যাবলি

কল্পনা করো যে, তুমি 1910 সালের টনকিন ফ্রি স্কুলের একজন ছাত্র। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর তোমার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে :

- ভিয়েতনামিদের সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে কী বলা হয়েছে?
- চুল কাটানোর ধরনের ব্যাপারে স্কুলে তোমাদের কী বলা হয়েছে?

চিত্র 6 – একটি স্থানীয় ব্যঙ্গ চিত্রতে এমন ভিয়েতনামিদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হচ্ছে যারা পাশ্চাত্য আদব-কায়দাকে রপ্ত করেছে। ভিয়েতনামিরা নিজেদের সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য পোষাক পরিধান এবং টেনিস খেলা শুরু করেছে।

2.3 স্কুলের মধ্যে বিরোধীতা

স্কুলের পাঠ্যক্রম তথা পাঠ্যপুস্তকগুলোকে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করত না। কখনো কখনো এর উপর প্রকাশ্যে বিরোধিতা হত, আবার কখনো এর নীরব প্রতিবাদও হত। প্রাথমিক শ্রেণিতে যেমনভাবে ভিয়েতনামি শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাতে করে কোন্ শ্রেণিতে কী পড়ানো হচ্ছে তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক ভিয়েতনামি শিক্ষক পাঠদানের সময় চুপি চুপি পাঠ্যপুস্তকের লেখাগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলত এবং পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলোর সমালোচনা করত।

1926 সালে সাইগন নেটিভ বালিকা বিদ্যালয়ে (Saigon Native Girls School) বৃহদাকারের একটি আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলন শুরু হওয়ার নেপথ্যে ঘটনাটি ছিল, যখন একজন ভিয়েতনামি বালিকা শ্রেণিকক্ষের সামনের সারিতে বসে, তখন তাকে বলা হয় আসন ছেড়ে পেছনে গিয়ে বসতে। কারণ সেই আসনে একজন স্থানীয় ফরাসি শিক্ষার্থী বসবে। ভিয়েতনামি বালিকা আসনটি ছাড়তে অস্বীকার করে। স্কুলের অধ্যক্ষও একজন উপনিবেশিক ছিলেন (অর্থাৎ উপনিবেশে বসবাস করা একজন ফরাসি নাগরিক)। তিনি সেই ছাত্রীটিকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেন। অন্যান্য ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা যখন প্রতিবাদ জানায়, অধ্যক্ষ তখন সেই প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদেরও স্কুল থেকে বহিঃষ্কার করে। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবাদী আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পরে। মানুষ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। পরিস্থিতি যখন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তখন সরকার আবার নির্দেশ দেয় যে, বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের যেন পুনরায় স্কুলে ভরতি করানো হয়। স্কুলের অধ্যক্ষ অনিচ্ছা সত্ত্বে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়। সাথে সাথে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আমি সমস্ত ভিয়েতনামিদের আমার পায়ের নীচে পিষে ফেলব। বাহ্! তোমরা আমাকে নির্বাসিত করতে চাও! ভালো করে জেনে রাখো, কোচিন চিনে আর একজনও ভিয়েতনামি বসবাস করছে না, এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরই আমি এই স্থানটি ত্যাগ করব।

অন্য জায়গায় উপনিবেশিক সরকার ভিয়েতনামিদের প্রশাসনিক চাকুরির যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ায়, ভিয়েতনামি ছাত্রছাত্রীরা তার তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষার্থীরা দেশভক্তির ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষিতদের সমাজের কল্যাণ হেতু কাজ করা দরকার। এইরকম চিন্তা ধারার কারণে তাদের সাথে ফরাসিদের এমনকি স্থানীয় অভিজাতদেরও মতবিরোধ তথা সংঘাত হতো, কেননা উভয় গোষ্ঠীর কাছেই মনে হতো যে, তাদের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন। 1920 এর দশকে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দল গঠন করতে থাকে। তারা ইয়ং আন্নান (Young Annan) এর মতো দল গঠন করে। পাশাপাশি এরা 'আন্নানীজ স্টুডেন্ট' এর মতো বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশিত করতে থাকে।

স্কুলগুলো রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়ে উঠেছিল। ভিয়েতনামে শিক্ষাদানের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফরাসীরা তাদের শাসন ক্ষমতাকে আরও মজবুত করতে চেয়েছিল। তারা মানুষের মূল্যবোধ, আদব-কায়দা এবং ধ্যান ধারণা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে থাকে। যাতে করে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় যে, ফরাসি সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ এবং ভিয়েতনামি সভ্যতা নিকৃষ্ট। অন্যদিকে, ভিয়েতনামি বুদ্ধিজীবিরা আশঙ্কা করছিল যে, ফরাসি শাসনে ভিয়েতনাম কেবলমাত্র নিজেদের ভূ-খণ্ডের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণই হারাচ্ছে না, বরং সম্পূর্ণভাবে তাদের পরিচয়ও হারাবে। তাদের সংস্কৃতি এবং প্রচলিত আদব-কায়দার অপমান করা হয় এবং মানুষের মধ্যে মালিক চাকরের একটি মানসিকতা গড়ে তোলা হয়। ফরাসি উপনিবেশীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে হওয়া প্রতিবাদী আন্দোলনটি, ফরাসি উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি বৃহৎ আন্দোলনের অংশতে পরিণত হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

1802

নগুয়েন রাজবংশের অধীনে রাষ্ট্রীয় একতার প্রতীক হিসেবে নগুয়েন অন (Nguyen Anh) সিংহাসনে বসেছিলেন।

1867

কোচিন চিনা (দক্ষিণ) ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হয়।

1887

কোচিন চিনা, অনাম, টোকিন, কোম্বোডিয়া এবং পরবর্তিতে লাউস প্রভৃতি অঞ্চল একত্রিত হয়ে ইন্দো-চিন প্রতিষ্ঠিত হয়।

1930

হো-চি-মিন ভিয়েতনামিয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করে।

1945

ভিয়েতমিন জনবিদ্রোহ শুরু করে। বাও-দাই-কে তার পদ থেকে সরানো হয়। হো-চি-মিন হ্যানয়-এ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। (2 সেপ্টেম্বর)।

1954

দিয়েন-বিয়েন-ফু-তে ফরাসি সৈনিকরা পরাজিত হয়।

1961

কেনেডি দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে আমেরিকার সামরিক সহায়তা বৃদ্ধির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

1974

প্যারিস শান্তি চুক্তি।

1975 (April 30)

এন.এল.এফ-এর সামরিক বাহিনী সাইগন-এ প্রবেশ করে।

1976

আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক গণরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

3 পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, রোগ ব্যাধি এবং প্রাত্যহিক আন্দোলন

শিক্ষা প্রাত্যহিক জীবনের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল না, যেখানে উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এই রকম রাজনৈতিক যুদ্ধ সংগঠিত হত। অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও দেখা যায় যে, উপনিবেশবাসীরা বিভিন্নভাবে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করত।

3.1 হ্যানয় প্রদেশে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব

চলো স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উদাহরণ নিই। যখন ফরাসিরা একটি আধুনিক ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে, তখন তারা হ্যানয় প্রদেশকেও পুনঃনির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই নতুন এবং 'আধুনিক' শহরটির প্রতিষ্ঠার জন্য আধুনিক নির্মাণ কৌশল এবং আধুনিক প্রকৌশলী যন্ত্রবিদ্যার দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। 1903 সালে হ্যানয়-এর নবনির্মিত অংশতে বিউবনিক প্লেগ (bubonic plague) রোগের প্রভাব ছড়িয়ে পরে। উপনিবেশিক অনেক দেশে এই রোগের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার ফলে গুরুতর সামাজিক বিবাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যজনকভাবে হ্যানয় প্রদেশের পরিস্থিতি একটু অন্যরকমই ছিল।

হ্যানয়-এর ফরাসি জনবসতি অংশটিকে একটি সুন্দর এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহররূপে নির্মাণ করা হয়। সেখানে রাস্তা ছিল প্রশস্থ এবং নর্দমা নিকাশী ব্যবস্থা ছিল ভীষণ

চিত্র 7 – আধুনিক হ্যানয়

উপনিবেশীয় হ্যানয়-এর ফরাসি জনবসতি অংশটিতে এই রকমের অট্টালিকা তৈরি করা হত।

ভালো। 'দেশীয় আবাসস্থল' গুলোতে কোন্ আধুনিক সুবিধা ছিল না। পুরোনো শহরের সমস্ত নর্দমার জল সরাসরিভাবে গিয়ে নদীর মধ্যে পড়ত। মুষলধারায় বৃষ্টি তথা বন্যাতে রাস্তাঘাটগুলো প্লাবিত হয়ে যেত। এইভাবে ফরাসি নগরে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেটাই প্লেগ রোগের কারণে পরিণত হয়। শহরের আধুনিক অংশতে বিশাল নিকাশী ব্যবস্থাগুলো আধুনিকতার প্রতীক ছিল। এই বিশাল নিকাশী ব্যবস্থা ইঁদুরদের প্রজননের জন্য আদর্শ এবং নিরাপদ স্থল ছিল। এই নর্দমার নিকাশীগুলো ইঁদুরের অবাধে যাতায়াত করার জন্য সহায়ক ছিল এবং শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ইঁদুরগুলো নির্দ্বিধায় ছুটাছুটি করতে পারত এবং এই নর্দমার জলের পাইপের মধ্য দিয়ে ইঁদুরগুলো ফ্রান্সের সুরক্ষিত ঘরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করত। এই অবস্থায় কী করার ছিল?

3.2 ইঁদুর শিকার

ইঁদুরের এই আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, 1902 সালে ইঁদুর শিকার শুরু হয়। ফরাসিরা এই কাজটির জন্য ভিয়েতনামি শ্রমিকদের নিযুক্ত করে। প্রতিটি ইঁদুর শিকারের বদলে ভিয়েতনামি ঠিকেদারদের পুরস্কৃত করা হতে থাকে। হাজার হাজার ইঁদুর ধরা হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 30 মে-তে 20,000 (কুড়ি হাজার) ইঁদুর ধরা হয়। কিন্তু এর পরেও দেখা যায় ইঁদুরের সংখ্যা কম ছিল না। ভিয়েতনামিদের ইঁদুর শিকারের মাধ্যমে সমষ্টিগত বাণিজ্যের প্রাথমিক ধারণা লাভ হতে থাকে। যারা নর্দমার মধ্যে ঢুকে কাজ করত তারা দেখল, যদি একজোট হয়ে কাজ করে, তবে তারা বেশি পরিশ্রমের জন্য উচ্চ মূল্য আদায় করতে পারবে। তারা এই পরিস্থিতি থেকে মুনাফা আদায়ের জন্য নতুন নতুন পন্থতির আবিষ্কার করতে থাকে। শ্রমের মূল্য তখনই দেওয়া হত, যখন ইঁদুর নিধনের প্রমাণ হিসেবে ইঁদুরের লেজ প্রদান করা হত। এর ফলে অধিক মুনাফা লাভের জন্য ইঁদুর ধরার লোকেরা ইঁদুরের লেজ কেটে জীবিত ইঁদুরকে ছেড়ে দিত, যাতে করে ইঁদুরের সংখ্যা কখনোই হ্রাস পেত না এবং এই প্রক্রিয়া বরাবর চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, কিছু লোক অধিক পরিমাণে টাকা উপার্জনের জন্য ইঁদুর পালন করা শুরু করে।

ভিয়েতনামিদের এই প্রতিরোধ এবং অসহযোগিতা থেকে অধৈর্য্য হয়ে ফ্রান্স ইঁদুর ধরার জন্য টাকা দেওয়ার কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে বিউবনিক প্লেগ রোগটি কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল না। উপরন্তু এইরোগের বিস্তার শুধুমাত্র 1903 সালেই নয়, বরং পরবর্তী কিছু বৎসর পর্যন্ত এই রোগটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পরে। ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ানো এই বিউবনিক প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব বস্তুত ফরাসি ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে দর্শায় এবং ফরাসিদের দ্বারা ভিয়েতনামিদের 'সভ্য করার উদ্দেশ্য' কে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রমাণিত করে। ইঁদুর শিকারিদের কর্মকাণ্ড থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাত্যহিক জীবনে ভিয়েতনামিরা উপনিবেশবাদকে কী কী ভাবে বিরোধিতা করত।

আলোচনা কর :

1903 সালে প্লেগ রোগের বিস্তার এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা থেকে স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি ফরাসি উপনিবেশিক সরকারের চিন্তাধারা তথা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কী জানা যায়?

4 ধর্ম এবং উপনিবেশবাদের বিরোধ

ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপনিবেশিক আধিপত্যের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। ফরাসিরা শুধুমাত্র ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনীই দখল করেনি। উপরন্তু তারা ভিয়েতনামের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে ও নতুন করে তৈরি করতে চেয়েছিল। যদিও ধর্ম উপনিবেশিক শাসনকে শক্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তথাপি এটি প্রতিরোধের নতুন নতুন রাস্তাও খুলে দিয়েছিল। চলো আমরা দেখি যে, কীভাবে এরকম হয়েছিল।

ভিয়েতনামিরা বৌদ্ধধর্ম মতে বিশ্বাসী ছিলেন, যা কনফুসিয়াসবাদ এবং স্থানীয় রীতি-নীতির উপর আধারিত ছিল। ফরাসি মিশনারিরা ভিয়েতনামে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার শুরু করে। ভিয়েতনামিদের ধর্মীয় জীবনের এই রকমের স্বচ্ছন্দ মনোভাব ফরাসিদের অপছন্দ ছিল এবং ফরাসিদের মনে হয়েছিল যে, ভিয়েতনামিদের অতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে পূজা করার অভ্যাসকে সংশোধন করা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে পাশ্চাত্য দেশগুলোর উপস্থিতির বিরুদ্ধে অনেক ধর্মীয় আন্দোলন সংগঠিত হয়। 1868 সালের (Scholors Revolt) স্কলার রিভোল্ট ফরাসি আধিপত্য এবং খ্রিস্ট্রীয় ধর্মের প্রসারের বিরুদ্ধে প্রথমদিকের একটি আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব রাজ দরবারের আধিকারিকদের হাতে ছিল। এই আধিকারিকরা

বাক্স 1

কনফুসিয়াস (551-479 খ্রি: পূর্ব) একজন চৈনিক চিন্তাবিদ্, যিনি সদাচার, ব্যবহারিক জ্ঞান বুদ্ধি এবং সঠিক সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে একটি দার্শনিক ব্যবস্থা বিকশিত করেন। মানুষেরা উনার উপদেশগুলো, যেমন-পিতামাতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং গুরুজনদের আদেশ পালন করা প্রভৃতি রপ্ত করেছিল। তাদের শেখানো হতো যে, রাজা এবং প্রজার মধ্যে সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত, যেই রকম পিতামাতার সাথে তার সন্তানের সম্পর্ক।

চিত্র 8 – ক্যাথলিক মিশনারী ফাদার বোরিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার একটি দৃশ্য।
ফ্রান্সে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়ানোর জন্য ফরাসি শিল্পীরা এইরকম ছবির প্রচার করত।

ক্যাথলিক ধর্ম এবং ফরাসি ক্ষমতার প্রসারের কারণে ক্ষিপ্ত ছিলেন। তারা নগুয়েন (Ngu An) এবং হা তিয়েন (Ha Tien) প্রদেশে ব্যাপকতর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়, এবং এক হাজারেরও বেশি ক্যাথলিকদের হত্যা করে। ক্যাথলিক মিশনারীরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই স্থানীয় লোকদের খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে সচেষ্ট ছিল, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মিশনারীরা প্রায় 3,00,000 লোকেদের খ্রিস্টিয় ধর্মে ধর্মান্তরিত করে। ফরাসিরা আন্দোলনগুলোকে দমন করেছিল বটে, তবে এই বিদ্রোহের ফলে ফরাসিদের বিরুদ্ধে অন্য দেশভক্তদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়।

ভিয়েতনামের অভিজাতরা চিনা ভাষা এবং কনফুসিয়াসবাদে শিক্ষিত হত। কিন্তু কৃষকদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনেকগুলো সমন্বয়মূলক পরম্পরা (Syncretic traditions) থেকেই জন্মেছিল। যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম এবং স্থানীয় ধর্ম বিশ্বাস উভয়েরই সংমিশ্রণ ছিল। ভিয়েতনামে অনেক প্রচলিত ধর্ম ছিল, যার প্রচার ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছে বলে দাবি করা ব্যক্তিরা করত। এদের মধ্যে কিছু ধর্মীয় আন্দোলন ফরাসিদের সমর্থন করত, আবার অনেকে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে হওয়া আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত ছিল।

হোওয়া-হাউ এইরকম একটি আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলন 1939 সালের শুরুর দিকে হয়। উর্বর মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে আন্দোলনটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উনবিংশ শতাব্দীর দিকে এই আন্দোলন উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনের জনপ্রিয় ধর্মীয় ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল।

হোওয়া হাউ আন্দোলনের প্রবক্তার নাম ছিল হুইন-ফু-সো। তিনি যাদু-বিদ্যা এবং গরিব লোকদের সহায়তা করতেন। এছাড়া অপ্রয়োজনীয় ব্যয়-এর বিরুদ্ধে তার উপদেশ সাধারণ লোকেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছিল। তিনি বালিকা বধূদের বেচাকেনা, জুয়া খেলা, মদ্যপান এবং অফিম ব্যবহারের তীব্র বিরোধী ছিলেন।

ফরাসিরা হুইন-ফু-সো এর দ্বারা অনুপ্রাণিত আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করে। তারা হুইন-ফু-সো কে পাগল ঘোষণা করে। ফরাসিরা তাঁকে পাগল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (Mad Bonze) বলে ডাকত।

মজার ব্যাপার ছিল যে, যেই চিকিৎসককে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে পাগল তথা বিকৃত মস্তিষ্ক প্রমাণিত করার, সেই চিকিৎসকই তার অনুগামীতে পরিণত হয়। পরিশেষে 1941 সালে, ফরাসি চিকিৎসকও হুইন-ফু-সো কে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি বলে ঘোষণা করে। ফরাসি সরকার হুইন-ফু-সো কে ভিয়েতনাম থেকে নির্বাসিত করে লাউস প্রেরণ করে তার অগণিত অনুগামীদের বন্দী শিবিরে (concentration camps) নিক্ষেপ করা হয়।

এই ধরনের আন্দোলনের সাথে জাতীয়তাবাদী মূল স্রোতের আন্দোলনের পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক থাকত। রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই এই আন্দোলনগুলোকে সমর্থন করত। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডে উৎকণ্ঠিতও হত। রাজনৈতিক দলগুলোর এই রকম গোষ্ঠীগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং অনুশাসন বজায় রাখতে অনেক সমস্যা হত। তারা তাদের রীতিনীতি এবং প্রথাগুলোকে সমর্থন করত না।

তারপরও সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সমূহের তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না।

নতুন শব্দ

Syncretic (সমন্বয়বাদ) — এটি এমন একটি বিশ্বাস যেখানে বৈসাদৃশ্যতার পরিবর্তে সাদৃশ্যতার উপর লক্ষ করতে গিয়ে, বিভিন্ন ধরনের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মচর্চা সমূহকে একে অপরের সাথে একত্রিত করার প্রয়াস করা হয়।

বন্দি শিবির (Concentration camp) — এক প্রকারের বন্দিশালা তথা কারাগার যেখানে কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই মানুষদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হত। এই শব্দটি শোনার পর অসহ্য যন্ত্রণা এবং বর্বোরচিত অত্যাচারের ছবি মনে ফুটে উঠে।

5 আধুনিকীকরণের কল্পনা

ফরাসি উপনিবেশবাদের বিরোধ বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন রূপে হয়। কিন্তু প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীদের সামনে প্রশ্ন একটিই ছিল অর্থাৎ আধুনিক হওয়ার অর্থ কী? জাতীয়তাবাদী কাকে বলে? আধুনিক হওয়ার জন্য কি পরম্পরা তথা ঐতিহ্যসমুহকে পশ্চাদপদ হিসেবে বিবেচনা করা এবং পুরানো সব চিন্তা ধারণা ও সামাজিক অনুশীলনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন? উন্নয়ণ এবং সভ্যতার প্রতীক হিসেবে 'পাশ্চাত্য'কে বিবেচনা করা এবং পশ্চাত্যের অনুধাবন ও অনুকরণ করা কি আবশ্যক?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ছিল বিভিন্ন ধরনের। কিছু বুদ্ধিজীবিরা মনে করেছিল যে, পাশ্চাত্যের প্রভূত্ব ক্ষমতাকে প্রতিহত করার জন্য ভিয়েতনামি পরম্পরাগুলোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যেখানে অন্য এক বুদ্ধিজীবির দল মনে করত যে, বিদেশী কর্তৃত্বের বিরোধিতা করা অবস্থাতেও ভিয়েতনামিদের পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে অনেক কিছু শেখা প্রয়োজন। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক জটিল বিতর্কের সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে সহজে সমাধান করা যায় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম দিকে, ফরাসি শাসনের বিরোধিতার নেতৃত্ব প্রায়ই কনফুসিয়াস পণ্ডিত কার্যকর্তাদের হাতে থাকত, যাদের মনে হচ্ছিল যে, তাদের নিজের পৃথিবী ধ্বংসের মুখে। কনফুসিয়াস পরম্পরায় শিক্ষিত এইরূপ একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন ফান-বুই-চাও [Phan Boi Chau (1867-1940)] । 1903 সালে উনি বৈপ্লবিক সমাজ (ডুই-তান-হুই) নামক একটি দল গঠন করেন এবং তখন থেকেই তিনি উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের একজন মুখ্য নেতা হয়ে উঠেন। রাজকুমার কুয়াং দি (Cuong De) এই দলের সর্দার ছিল।

ফান-বুই-চাও (Phan Boi Chau) 1905 সালে চিনের সংস্কারক লিয়াং কিচাও [Liang Qichao (1873-1929)] এর সাথে ইয়োকোহামাতে সাক্ষাৎ করেন। ফান-বুই-চাও এর সবচেয়ে প্রভাবশালী পুস্তক '*The History of the Loss of Vietnam*' এটি লিয়াং-কিচাও এর প্রভাব এবং পরামর্শতেই লেখা হয়। ভিয়েতনাম এবং চিনে এই বইটি সর্বাধিক পরিমাণে বিক্রি হয়, এমনকি এর উপর একটি নাটক ও মঞ্চস্থ হয়। এই বইটি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত দুটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল : যথা (i) দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার বিনাশ, (2) এবং দুই দেশের অভিজাত শ্রেণিদেরকে একটি সংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ করা দুটি দেশ যথা-ভিয়েতনাম চিন সম্পর্কের ভাঙ্গান। ফান-বুই-চাও তার পুস্তকে এইরকম দ্বৈত বিনাশের জন্য শোক ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর শোক প্রকাশের ধরন সেইরূপই ছিল, যেই রকমটি পরম্পরাগত অভিজাত শ্রেণির সংস্কারকদের মধ্যে দেখা যেত।

ফান-বুই-চাও এর সাথে অন্য জাতীয়তাবাদীদের বিচার ধারার ব্যাপক পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন ফান-চু-ট্রিন (1871-1926)। তিনি রাজতন্ত্রের তীব্র বিরোধী ছিলেন। ফরাসিদের প্রতিহত করার জন্য রাজ দরবারের সাহায্যের প্রয়োজন তিনি এই ধারণাটির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল একটি গণ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। পাশ্চাত্য দেশের গণতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা ভীষণ ভাবে প্রভাবিত ফান-চু-ট্রিন, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যাত করতে চান নি। স্বাধীনতার

উৎস (ক)

ফান-বুই-চাও এবং ফান-চু-ট্রিন ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের ব্যক্তিগত মতামতের উপর বিতর্ক করে জাপানে একসঙ্গে সময় কাটিয়েছিল। এই আলোচনাগুলো প্রসঙ্গে পরবর্তী সময়ে ফান-বুই-চাও লিখেছেন —

তারপরে দশদিনেরও বেশি সময় ধরে আমরা দুইজন বার বার বিতর্ক করছিলাম এবং আমাদের অভিমত সম্পূর্ণভাবে একে অপরের বিপরীত ছিল। যেমন - ফান-বুই-ট্রিন জনসাধারণের উপযোগী অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রকে উৎখাত করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করত। কিন্তু আমার অভিমত ছিল যে, প্রথমে নিজের দেশ থেকে বিদেশী শত্রুদের বিতাড়িত করতে হবে এবং স্বাধীনতা অর্জন করার পরই আমরা অন্য অধিকারগুলো সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে পারব। আমার পরিকল্পনাতে রাজতন্ত্রের ব্যবহারের উল্লেখ ছিল, যেখানে ফান-চু-ট্রিন ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফান-চু-ট্রিন এর পরিকল্পনা ছিল যে, রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনের জন্য মানুষকে জাগিয়ে তোলা, কিন্তু তার এই পরিকল্পনাটিতে সম্পূর্ণরূপে আমার অসম্মতি ছিল। অর্থাৎ ফান-চু-ট্রিন এবং আমার লক্ষ্য তো একই ছিল, কিন্তু সেই লক্ষ্য প্রাপ্তির পথ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আলোচনা কর :

ফান-বুই-চাও এবং ফান-চু-ট্রিন এর চিন্তাধারার মধ্যে কী সাদৃশ্যতা আছে? তাদের চিন্তাধারার মধ্যে বৈসাদৃশ্য কী ছিল?

নতুন শব্দ

প্রজাতন্ত্র --- সাধারণ জনগণের সম্মতি এবং জন প্রতিনিধিদের উপর ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। রাজতন্ত্রের বিপরীত এইরকম সরকার জনশক্তি তথা তাদের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

প্রাপ্তির জন্য তার কাছে ফরাসি বৈপ্লবিক আদর্শ গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু তার অভিযোগ ছিল যে, ফরাসিরা নিজেরাই এই আদর্শকে যথাযথভাবে পালন করেনি। তার দাবী ছিল যে, ফরাসি সরকার যাতে ভিয়েতনামে আইনসম্মত এবং শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের স্থাপন করে, এছাড়া কৃষি ও শিল্পের বিকাশ করে।

5.1 আধুনিক হওয়ার অন্য উপায় : জাপান এবং চিন

প্রারম্ভিক ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদীদের জাপান এবং চিনের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জাপান এবং চিন শুধুমাত্র পরিবর্তনের প্রতীকই ছিল না, বরং ফরাসী পুলিশদের হাত থেকে পালিয়ে আসা লোকেদের শরণার্থী স্থলও ছিল এবং এই দেশগুলোতে এশিয়ার বিপ্লবীদের জাল বিস্তৃত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের দিকে 'পূর্বে চলো অভিযান' (go east movement) আন্দোলন খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 1907-08 সালের দিকে প্রায় 300 জন ভিয়েতনামী শিক্ষার্থী আধুনিক শিক্ষা নেওয়ার জন্য জাপানে গমন করে। এর মধ্যে অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ভিয়েতনাম থেকে ফরাসিদের বিতাড়িত করা, হাতের পুতুল সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করা এবং ফরাসিদের দ্বারা সিংহাসন চ্যুত হওয়া নগুয়েন রাজবংশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই জাতীয়তাবাদীরা বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র এবং সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা জাপানিদের কাছে এশিয়াবাসী হিসেবে এই আবেদন করেছিল। আধুনিকীকরণের দিক থেকে জাপান অনেক এগিয়ে ছিল এবং জাপানিরা পাশ্চাত্য দেশের উপনিবেশিকতার বিরোধিতা করে। তারই সাথে, 1907 সালে রাশিয়ার উপর জয় লাভ করে জাপান তার সামরিক ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। ভিয়েতনামি শিক্ষার্থীরা টোকিওতেও একটি রেস্টোরেশন সোসাইটির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু 1908 সালের দিকে জাপানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ধরনের কার্যকলাপকে কঠোর হাতে দমন করে। ফান-বুই-চাও সহ অনেককে জাপান থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং তাদের বাধ্য হয়ে চিন ও থাইল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে হয়।

চিত্র 9 – ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্কাশিত করার একটি ব্যাঙ্গাচিত্র।
এই ছবিটিতে দেখানো হচ্ছে জাতীয়তাবাদীরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বীরের মতো এগিয়ে যাচ্ছে, এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বিতাড়িত করছে।

চিনের ঘটনাবলির ক্রমবিকাশও ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। সান-ইয়াৎ-সেন এর নেতৃত্বে পরিচালিত গণ আদোলনের মাধ্যমে চিনের জনসাধারণ দীর্ঘসময় ব্যাপি প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রকে 1911 সালে উৎখাত করেছিল এবং সেখানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। এই ঘটনাবলির ক্রমবিকাশ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভিয়েতনামি শিক্ষার্থীরাও ভিয়েতনামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য (ভিয়েতনাম কুয়ান-ফুক হোই) সংগঠনটি গড়ে তোলে। তখন ফ্রান্স বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপেরও পরিবর্তন হয়। তখন আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমিত ছিল না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি গণ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা।

যাই হোক, শীঘ্রই ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন একটি নতুন ধরনের নেতৃত্বের আধীনে চলে এসেছিল।

6 কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদ

1930 খ্রিস্টাব্দের মহামন্দা ভিয়েতনামের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। রাবার ও চালের মূল্য হ্রাস পায়, গ্রামীণ ঋণ বৃদ্ধি পায়, বেকারত্ব দেখা দেয় ও গ্রামীণ বিদ্রোহ শুরু হয়। নে এন এবং হা-তিন প্রদেশেও বিদ্রোহ হয়। এই প্রদেশগুলি সবচেয়ে দরিদ্র ছিল যেখানে পুরানো মৌলবাদী ঐতিহ্য কায়েম ছিল, যাকে ভিয়েতনামের 'বৈদ্যুতিক ফিউজ' বলা হয়। যখনই কোনো সংকট আসে সর্বপ্রথম সেখানেই অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। ফ্রান্স নির্দয়ভাবে এইসব বিদ্রোহ দমন করে। এমনকি মিছিলের উপর বিমান থেকেও বোমাবর্ষণ করা হয়।

1930 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হো-চি-মিন ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টি (ভিয়েতনাম কাং সান ডেং) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকে ঐক্যবন্ধ করেন। পরবর্তীকালে পার্টির নতুন নামকরণ হয় ইন্দো চিন কমিউনিস্ট পার্টি। তিনি ইউরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সংগ্রামী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে 1940 খ্রিস্টাব্দে জাপান ভিয়েতনাম দখল করে। এই অবস্থায় জাতীয়তাবাদীদের, ফরাসিদের পাশাপাশি জাপানিদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়। দ্য লীগ ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব ভিয়েতনাম যা ভিয়েতমিন নামে পরিচিত হয়। ভিয়েতমিন জাপানি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং 1945 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হ্যানয় পুনরুদ্ধার করে। এরপর ভিয়েতনামে-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় এবং হো-চি-মিন এর চেয়ারম্যান হন।

6.1 নতুন প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনাম

নতুন প্রজাতান্ত্রিক সরকার অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। সম্রাট বাও দাইকে তাদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করে ফ্রান্স পুনরায় ভিয়েতনামের উপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ফরাসি আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে ভিয়েতমিনরা পাহাড়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। আট বছর যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত 1954 খ্রিস্টাব্দে দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধের দ্বারা ফ্রান্স পরাজিত হয়।

1953 খ্রিস্টাব্দের ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার জেনারেল নেভারে আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেন যে, তারা শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কিন্তু 1954 খ্রিস্টাব্দের 7 মে ভিয়েতমিনরা ফ্রান্সের অভিযানকারী বহু সৈনিককে হত্যা করে এবং 16 হাজারেরও বেশি সৈন্যকে আটক করে। 16 জন কর্ণেল ও 1,749 জন কর্মকর্তাসহ সব সৈনিক কর্মচারীবর্গকে আটক করা হয়।

ফ্রান্সের পরাজয়ের পর জেনেভা শান্তি সম্মেলনে ভিয়েতনামিদের দেশের বিভাজনের প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। দেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় উত্তর ও দক্ষিণ

উৎস (খ)

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

নতুন প্রজাতন্ত্রের ঘোষণায় সর্বপ্রথম 1771 খ্রিস্টাব্দে সংযুক্ত রাজ্যের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং 1791 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের নীতিসমূহ পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এর সঙ্গে এটিও যুক্ত করা হয় যে, ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই তাদের মহান নীতিগুলি অনুসরণ করছে না, কারণ তারা আমাদের পিতৃভূমির সীমা লঙ্ঘন করে এবং আমাদের সাথী নাগরিকদের নির্যাতন করে তারা ন্যায় ও মানবতার আদর্শের বিপরীতে কাজ করে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা আমাদের সকল স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা আমাদের উপর অমানবীয় আইন আরোপ করে ... তারা স্কুল এর তুলনায় কারাগার বেশি নির্মাণ করেছে। তারা নিষ্ঠুরভাবে আমাদের দেশপ্রেমিকদের হত্যা করে, তারা রক্তের নদীতে আমাদের বিদ্রোহ ডুবিয়ে দেয়।

তারা জনমতকে অবদমন করে। আমাদের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য রহস্যবাদের সাহায্যে গ্রহণ করে ....

এই কারণে অস্থায়ী সরকারের সদস্য হিসেবে, ভিয়েতনামের সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সাথে আমাদের কোনো সংযোগ থাকবে না। আমাদের অঞ্চলে যে সব অধিকার নিয়ে ফরাসিরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, আমরা ফরাসিদের সেইসব অধিকার বাতিল বলে ঘোষণা করছি।

আমরা সমগ্র বিশ্বে একথা প্রচার করতে চাই যে, ভিয়েতনামের স্বাধীন ও মুক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং কার্যত ভিয়েতনাম মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে গেছে।

Source

নতুন শব্দ

(Obscurantist) অস্পষ্ট — ব্যক্তি বা ধারণা যা বিভ্রান্ত করে।

ভিয়েতনাম। উত্তর ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে অন্যদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে বাত্ত দাই-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিভাজনের পরবর্তী ঘটনাসমুহ ভিয়েতনামকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে, যা মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি পরিবেশেরও ধ্বংস নিয়ে আসে। বাত্ত দাই-এর শাসন শীঘ্রই ন দিন দিয়েম এর নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান দ্বারা উৎখাত হয়। দিয়েম দমনমূলক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। যদি কোনো ব্যক্তি তার বিরোধিতা করত, তাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে জেলে ঢোকানো হত এবং হত্যা করা হত। দিয়েম ১০ নম্বর আদেশকে অপরিবর্তিত রাখেন যার দ্বারা খ্রিস্টান ধর্ম অনুমোদিত হলেও বৌদ্ধ ধর্মকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট (NLF) এই স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা শুরু করে।

উত্তর ভিয়েতনামে হো-চি-মিন সরকারের সহায়তায় এন.এল.এফ দেশের একীকরণের জন্য লড়াই করে।

*চিত্র 10 – **ইন্দোচিনে ফ্রান্সের কমাণ্ডার জেনারেল** নেভারে ভিয়েতনামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। ফলস্বরূপ ফরাসিরা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি রণক্ষেত্র খোলে এবং তাদের সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দেয়। নেভারে পরিকল্পনা দিয়েন বিয়েন ফুর উত্তর-পূর্ব উপত্যাকায় ফরাসিদের উল্টো বিপদে ফেলে ও বিপর্যয় ঘটায়।*

বক্স- 2

দিয়েন বিয়েন ফু এ ফরাসিরা, জেনারেল নগুয়েন গিয়াপ এর নেতৃত্বাধীন ভিয়েতনাম বাহিনী দ্বারা প্রতারিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে সেই বিষয়ে ফ্রান্সের জেনারেল নেভারের কোন পূর্ব অনুমান ছিল না। উপত্যকার যেখানে ফ্রান্সের সৈন্যঘাঁটি ছিল বর্ষায় সেখানে জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই এলাকা জঙ্গলেও ঢাকা ছিল। ফলে সৈন্য ও ট্যাঙ্ক চলাচল করতে পারছিল না এবং ফ্রান্সের সেনাবাহিনী জঙ্গালে লুকানো ভিয়েতমিনদের বিমান বিধ্বংসী কামানেরও সন্ধান করতে পারেনি।

ভিয়েতমিনরা পাহাড়ের উপর তাদের ঘাঁটি থেকে নীচের উপত্যকায় ফরাসী সৈন্যদের ঘিরে ফেলে, ফরাসিরা যেন তাদের খোঁজ না পায় তাই তারা ট্রেন্স এবং সুড়ঙ্গা তৈরি করে চলতে থাকে। অবরুদ্ধ ফরাসি সৈন্যদের নিকট কোন রসদও পৌঁছতে পারছিল না, আঘাতপ্রাপ্ত ফরাসি সৈন্যদেরও সরানো যাচ্ছিল না, ক্রমাগত কামানের গোলাবর্ষণের কারণে ফরাসি বিমানবন্দরও অব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে।

দিয়েন বিয়েন ফু, সংঘর্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে ওঠে। এই সংঘর্ষ ভিয়েতমিনদের এই বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে যে, দৃঢ়নিষ্ঠা এবং সঠিক রণনীতির দ্বারা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধেও লড়াই করা সম্ভব। মানুষদের প্রভাবতি করার জন্য গ্রামে ও শহরে এই সংঘর্ষের কাহিনি শোনানো হতে থাকে।

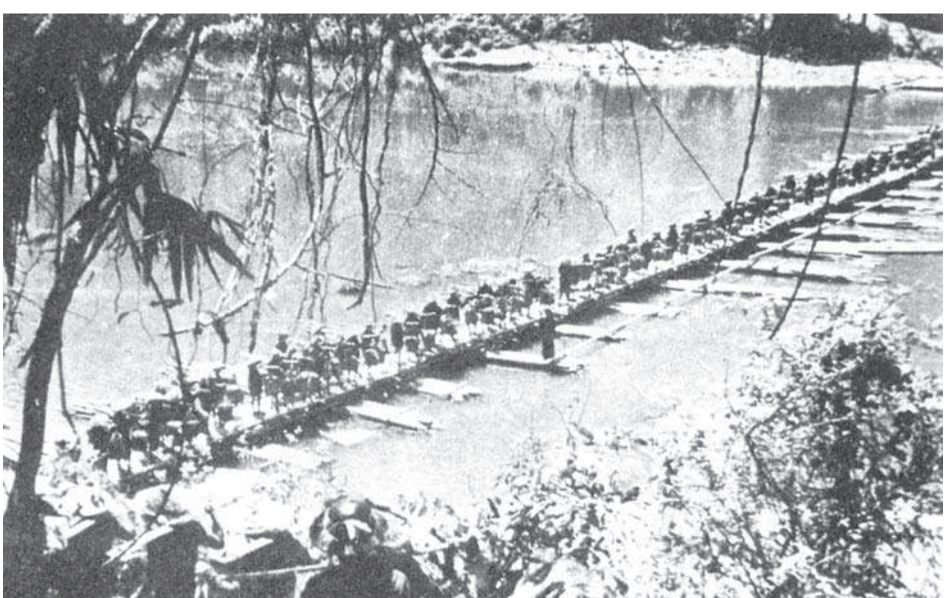

*চিত্র 11 – **দিয়েন বিয়েন ফুতে রসদ সংগ্রহ করা হচ্ছে।***
সাইকেল ও কুলিদের সাহায্যে ভিয়েতমিনরা যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠায় শত্রু পক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তারা জঙ্গাল এবং গুপ্ত রাস্তা ব্যবহার করে।

বক্স- 3

হো চি মিন (1890 - 1969)

হো চি মিনের প্রারম্ভিক জীবন সম্পর্কে খুব কম জানা যায় কারণ তিনি ব্যক্তিগত পরিচয়কে দূরে রাখতে পছন্দ করতেন এবং নিজেকে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি মধ্য ভিয়েতনামে জন্মগ্রহণ করেন সম্ভবত তার নাম ছিল গোয়েন ভান থান। তিনি নেতা সৃষ্টিকারী সেই ফরাসি স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন যেখানে গো দিন দিয়েম, ভো গোয়েন গিয়াপ এবং হাম ভান দং এর মতো নেতা তৈরি হয়। 1920 খ্রিঃ তিনি কিছু দিনের জন্য শিক্ষকতা করেন। 1919 খ্রিঃ তিনি বেকিং শেখেন এবং সাইনান থেকে মাসাইতে চলাচলকারী যাত্রীবাহী জাহাজে চাকরি নেন। তিনি কমিনর্টান এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং লেনিন ও অন্যান্য নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। 30 বছর ইউরোপ, থাইল্যান্ড এবং চিনে থাকার পর 1941 খ্রিঃ তিনি ভিয়েতনাম ফিরে আসেন। 1943 খ্রিঃ তিনি নাম পরিবর্তন করে হো চি-মিন (পথপ্রদর্শক) রাখেন। ভিয়েতনামে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি রাষ্ট্রপতি হন। 1969 খ্রিঃ 3রা সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে সফলভাবে পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন এবং ভিয়েতনাম এর স্বায়ত্বশাসন সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

আমেরিকা এই জোটের শক্তিকে ভয়ের চোখে দেখে। কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধিতে আমেরিকা শঙ্কিত হয় এবং সৈন্য ও অস্ত্র পাঠিয়ে নিস্পত্তিমূলক হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

6.2 আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান

যুদ্ধে আমেরিকার প্রবেশ একটি নতুন পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়, যার ফলে ভিয়েতনামিদের পাশাপাশি আমেরিকানদের চরমমূল্য দিতে হয়। 1965 খ্রিঃ থেকে 1972 খ্রিঃ মধ্যে আমেরিকার 34,03,100 সৈন্য ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক হিসেবে কাজ করে (7, 4,84 জন ছিলেন মহিলা) আমেরিকার কাছে উন্নততর প্রযুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকলেও হতাহতের সংখ্যা ছিল অগণিত।

চিত্র 12 – আমেরিকার সৈন্যরা ধানখেতে ভিয়েতকংদের অনুসন্ধান করছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় 47,244 জন নিহত হয় এবং 3, 03, 704 জন আহত হয় (আহতদের মধ্যে 23, 014 জনকে পূর্ববর্তী সৈনিক প্রশাসন 100% পঙ্গু হিসেবে ঘোষণা করে)

আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের এই পর্ব খুব বর্বরোচিত ছিল। ভারী অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক সহ হাজার হাজার আমেরিকান সৈনিক ভিয়েতনামে প্রবেশ করে এবং তাদের সঙ্গে সেই সময়ের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বোমা B52 ছিল। ব্যাপক আক্রমণ ও রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন নাপাম, এজেন্ট অরেঞ্জ এবং ফসফরাস বোমা ব্যবহারের ফলে অনেক গ্রাম ও গাছপালা ধ্বংস হয় এবং অসংখ্য সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়।

যুদ্ধের প্রভাব আমেরিকাতেও পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই এই যুদ্ধে মার্কিন সরকারের অংশগ্রহণের সমালোচনা শুরু করে কারণ, তাদের মনে হয়েছিল বলপূর্বক এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। যখন দেশের যুবকদের যুদ্ধের জন্য তৈরি করা হচ্ছিল তখন ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের আবশ্যিকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়নি। এর অর্থ এই যে, যুদ্ধে পাঠানো সৈনিকদের বেশির ভাগই অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল না বরং সংখ্যালঘু শ্রেণি এবং গরিব শ্রমিক পরিবারের সদস্য ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম ও চলচ্চিত্রগুলো যুদ্ধের সমর্থন ও সমালোচনা উভয় ক্ষেত্রেই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। হলিউডে যুদ্ধের সমর্থনে অনেক সিনেমা তৈরি হয়, 1968 খ্রিঃ জন ওয়েন এর তৈরি করা ছবি ‘গ্রিণ বেরেটস্’- এই ধরনের চলচ্চিত্র ছিল। অনেকেই মনে করেন যে, এটি যুবকদের যুদ্ধে প্রাণ দিতে উৎসাহিত করার জন্য একটি প্রচারকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র ছিল। অন্যান্য চলচ্চিত্রে সমালোচনা পূর্বক এই যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছিল। ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলার ‘এপোকলিপ্স নাউ’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট নৈতিক বিভ্রান্তিকে প্রতিফলিত করে।

হো চি মিন সরকারের বিজয় পরিকল্পনা সফল হলে তাদের প্রভাবে ঐ এলাকার অন্যান্য অঞ্চলেও কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে— আমেরিকার নীতি নির্মাতাদের এই আশঙ্কাই ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মুখ্য কারণ ছিল।

জাতীয়তাবাদী শক্তিতে ভরপুর ভিয়েতনামী জনগণের কর্মকাণ্ড, তাদের বাড়িঘর, পরিবারকে উৎসর্গ করার মানসিকতা, ভয়ঙ্কর অবস্থায় বসবাস করা এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই সংগ্রামের তীব্র ইচ্ছা— এইসব বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন মার্কিন প্রশাসন করতে পারেনি। আধুনিক প্রযুক্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত একটি ছোট দেশের শক্তির তারা অবমূল্যায়ন করে।

বক্স- 4

এজেন্ট অরেঞ্জ-প্রাণঘাতী বিষ

এজেন্ট অরেঞ্জ ছিল গাছপালা পত্রশূন্য করার ও ধ্বংস করার একটি অস্ত্র, একে এজেন্ট অরেঞ্জ বলার কারণ অরেঞ্জ বা কমলা রং এর ব্যান্ড দিয়ে চিহ্নিত ড্রামগুলোতে তা সংরক্ষিত করা হত। 1961 থেকে 1971 সালের মধ্যে মার্কিন সেনারা মালবাহী জাহাজ থেকে ভিয়েতনামে প্রায় 11 মিলিয়ন গ্যালন রাসায়নিক বিস্ফোরক ও গ্যাস ছড়িয়ে দিতে থাকে। মার্কিন সেনাদের পরিকল্পনা ছিল বন ও ক্ষেত ধ্বংস করা। এতে মানুষের লুকানোর জন্য কোন জঙ্গল না থাকলে তাদের হত্যা করা সহজ হবে। দেশের 14 শতাংশেরও বেশি জমি মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। সেখানকার মানুষ আজ পর্যন্তও এই ধ্বংসকারী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। এজেন্ট কমলার একটি উপাদান, ডাই অক্সিন ক্যান্সারের কারণ এবং শিশুদের মস্তিষ্কের পক্ষে ক্ষতিকারক। একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, যে সব এলাকায় এজেন্ট অরেঞ্জ ছড়ানো হয়েছিল সেখানে বিকলাঙ্গতার ঘটনা অনেক বেশি।

ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের সময় যে পরিমাণ বোমাও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায়ও বেশি ছিল। এই অস্ত্রশস্ত্রগুলো বেশিরভাগ জনবসতি এলাকাগুলোতেই ব্যবহৃত হয়েছিল।

চিত্র 13 – 1972 খ্রিঃ হ্যানয় এ বোমা বর্ষণ করা হয়।

নতুন শব্দ

নাপাম— আগুন বোমায় গ্যাসোলিনকে গাঢ় করার জন্য এক প্রকার জৈব যৌগ নাপাম। এই মিশ্রণ ধীরে ধীরে জ্বলে এবং মানুষের চামড়ার মতো কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসা মাত্র এটি আঠার মতো লেগে যায় এবং পুড়তে শুরু করে। আমেরিকাতে এটি তৈরি হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক বিরোধ উপেক্ষা করে ভিয়েতনামে ব্যাপকমাত্রায় এই অস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

6.3 হো চি মিন গমন পথ

হো চি মিন-এর রাস্তা সম্পর্কে জানার পর আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামীদের যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে। কিভাবে ভিয়েতনামীরা তাদের সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার দ্বারা অধিক সুফল লাভ করে— এটি হল তার প্রতীক। পায়ে হাঁটার রাস্তা ও সড়কের এক বিশাল নেটওয়ার্ক দ্বারা উত্তর থেকে দক্ষিণে সৈনিক ও রসদ পরিবহণ করা হত। 1950 এর দশকে এই পথকে আরও উন্নত করা হয় এবং 1967 খ্রিস্টাব্দের পর প্রতি মাসে প্রায় 20,000 উত্তর ভিয়েতমানের সৈনিক এই পথে দক্ষিণ ভিয়েতনামে পৌঁছায়।

এই রাস্তার বিভিন্ন স্থানে সৈনিক ঘাঁটি এবং হাসপাতাল ছিল। কিছু অংশে ট্রাকে রসদ সরবরাহ করা হত, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কাজ কুলীরা করত। যাদের অধিকাংশই মহিলা ছিল। কুলীদের অধিকাংশই 25 কেজি তাদের পিঠে করে এবং প্রায় 70 কেজি রসদ তাদের সাইকেলে বহন করত।

এই পথের বেশিরভাগ অংশই প্রতিবেশী লাওস এবং কম্বোডিয়ায় ছিল, এবং পথের বেশিরভাগ শাখা রসদ সরবরাহ ব্যাহত করার জন্য আমেরিকার সৈনিকরা নিয়মিত এই পথে বোমা বর্ষণ করে, কিন্তু ক্রমাগত বোমা হামলা চালিয়েও এই গুরুত্বপূর্ণ পথটি ধ্বংস করার প্রচেস্টা ব্যর্থ হয়। কারণ সেখানকার লোকেরা খুব দ্রুত রাস্তা পুনর্গঠন করে নিত।

চিত্র 14 – হো-চি-মিন পথ।
লক্ষ করে দেখো এই রাস্তা লাওস এবং কম্বোডিয়ার সীমা হয়ে প্রসারিত হয়।

চিত্র 15 – ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ
বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রাস্তা শীঘ্রই পুনঃগঠন করা হতো।

চিত্র 16 – হো চি মিনের গমন পথে।

উৎস (গ)

দো স্যাম এর চিঠি

দো স্যাম ভিয়েতনামী কামান বাহিনীর কর্ণেল ছিলেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য 1968 খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া টেট আক্রমণ এর সাথে যুক্ত ছিলেন। নিচে তার চিঠির কিছু অংশ দেওয়া হল। এই চিঠি তিনি যুদ্ধ ঘাঁটিতে বসে নিজের স্ত্রীকে লিখেছিলেন। এই চিঠি প্রমাণ করে জাতীয়তাবাদী ধারণায় ব্যক্তিগত প্রেম, রাষ্ট্রপ্রেম এবং স্বাধীনতার চাহিদা কিভাবে মিলে মিশে যায়। সুখের জন্য ত্যাগ প্রয়োজনীয় মনে হয়।

জুন, 1968

তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ 'তুমি যখন আমার কথা মনে করো তখন তুমি সবচেয়ে বেশি কী ভাবো?' আমি আমাদের বিবাহের সেই পরিবেশ স্মরণ করি...। আমি আমাদের সেই ছোট ঘর এর সুখকর স্মৃতি স্মরণ করি। আমার মনে পড়ে...।

আমাদের বিয়ের ঠিক পরেই আমাদের দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য লড়াই করতে আমাকে চলে যেতে হয়। দেশের দক্ষিণ অংশে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি করার পূর্বে আমরা খুব কম সময় একসাথে কাটিয়েছি। আমি যতই ভাবি, আমি তোমাকে অনুভব করি, তারপর আমার মনে হয়, আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ দম্পতির জন্য সুখ আনতে দেশকে রক্ষা করার জন্য আমাকে আরো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

গতরাতে আমাদের গাড়ি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আজ সকালে আমি একটি পাথরের উপর বসে তোমার জন্য এই চিঠি লিখছি। এখানে চারদিকে জলধারার শব্দ এবং গাছের মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতিও আমাদের আনন্দে সামিল হয়েছে। আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করছি, যখন আমরা বিজয়ী হয়ে ফিরে আসব। তখন আমরা আরও সুখকর জীবন কাটাবো। আমরা কি পারবো না? তোমার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আমার কথা সবসময় মনে রেখো...।

জুন, 1968 দ্বিতীয় পত্র

যদিও তুমি সব সময় আমার মনের মধ্যে আছ কিন্তু আমাকে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমার দেশকে বিজয় এনে দিতে মনযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

আমি নিজেকে কথা দিয়েছি, যখন দক্ষিণ প্রান্ত সম্পূর্ণ মুক্ত হবে এবং আমাদের দেশের মানুষের আনন্দ ও সুখ ফিরে আসবে শুধু তখনই আমি আমাদের নিজেদের সুখের কথা ভাবব। আর শুধুমাত্র তখনই আমি আমার পারিবারিক জীবনে সুখী থাকতে পারব।

হুং ডং ভং, (ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় লিখিত পত্র) ভিয়েতনামী লেখক সংগঠন 2005, গুয়েন কোয়েক আন দ্বারা অনূদিত।

7 রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়ক

সামাজিক আন্দোলনকে বোঝার জন্য উপায় হল এই আন্দোলন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কীভাবে, কতটা প্রভাবিত করে তা জানা। এখন দেখা যাক ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা কী ছিল এবং এর দ্বারা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ সম্পর্কে আমাদের কী ধারণা হতে পারে।

7.1 বিদ্রোহে নারীরা

ঐতিহ্যগতভাবে ভিয়েতনামের মহিলারা বিশেষ করে নিম্নশ্রেণির মহিলারা চিনের মহিলাদের তুলনায় সমাজে বেশি সমতা ভোগ করত। কিন্তু ভবিষ্যৎ নির্ধারন করার ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা ছিল সীমিত এবং সমাজ জীবনে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

যখন ভিয়েতনাম এর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তার শক্তি বৃদ্ধি করছিল, সমাজে মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে থাকে এবং নারীত্বের একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি হয়। লেখক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্‌রা সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নারীদের আদর্শরূপে বর্ণনা করতে থাকে। 1930 খ্রিঃ হ্যাট লিন (Nhat Linh) এর লিখিত বিখ্যাত উপন্যাস কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করে কারণ এতে দেখানো হয়েছে একজন নারী তার জোরপূর্বক করানো বিবাহবন্ধন থেকে বেরিয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে যুক্ত তার পছন্দের এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে। সামাজিক রূপান্তরের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ভিয়েতনামী সমাজে মহিলাদের অংশগ্রহণকে নতুনভাবে চিহ্নিত করে।

7.2 অতীতের বীরাঙ্গণাগণ

অতীতের বিদ্রোহী নারীদের সম্পর্কেও একইভাবে গুণকীর্তন করা হয়। 1943 খ্রিঃ জাতীয়তাবাদী নেতা ফান বই চাও (Phan Boi Chan) 39-43 খ্রিস্টাব্দে চিনা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ট্রাঙ্গা (Trung) বোনদের জীবন নিয়ে এক নাটক লেখেন। এই নাটকে তিনি ট্রাঙ্গা বোনদের দেশপ্রেমিক হিসেবে বর্ণনা করেন যারা ভিয়েতনামকে চিনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে। তাদের বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ কি ছিল এই নিয়ে পণ্ডিতদের মতপার্থক্য থাকলেও ফান এর নাটকের পর ট্রাঙ্গা বোনদের আদর্শ ও গৌরব হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ভিয়েতনামের লোকদের অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি ও তীব্র দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে চিত্র, নাটক এবং উপন্যাসে ট্র্যাঙ্গা বোনদের বর্ণনা করা হতে থাকে। জানা যায় তারা 30,000 এর বেশি সেনা তৈরি করে, দুই বছর পর্যন্ত চিনা শক্তির মোকাবিলা করে এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা বুঝতে পারে পরাজয় নিশ্চিত, তখন আত্মসমর্পণ না করে তারা আত্মহত্যা করে।

অতীতের অন্যান্য নারী বিদ্রোহীরাও জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের অংশ ছিল। সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তৃতীয় শতাব্দীতে বসবাসকারী ট্রিও আও (Trieu Au), ছোট বেলায় তিনি অনাথ হন এবং ভাইয়ের সাথে বসবাস করেন। বড়ো হওয়ার পর তিনি বাড়ি ছেড়ে জঙ্গালে চলে যান। একটি বড় সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন এবং চিনা কর্তৃত্বের বিরোধীতা করেন। শেষ পর্যন্ত যখন তার সেনাবাহিনীর পরাজয় হয় তখন তিনি জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন।

চিত্র 17 – ট্রিও আও (Trieu Au) এর ছবি।
দেবীরূপে যার পূজা করা হতো, চিনা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের আজও পূজা করা হয়।

তিনি শুধুমাত্র দেশের সম্মানের জন্য যুদ্ধ করা একজন শহিদই ছিলেন না, তিনি ভিয়েতনামিদের কাছে দেবী হয়ে উঠেছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা জনগণকে, জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করার জন্য তার ছবিটিকে জনপ্রিয় করেছে।

7.3 নারী যোদ্ধা

1960 এর দশকে পত্রপত্রিকায় সাহসী নারী যোদ্ধাদের ছবি ছাপা হতে থাকে। সেইসব ছবিতে মহিলা সৈনিক গুলি করে বিমান নামানোর দৃশ্য ছিল। তাদের তরুণ, সাহসী এবং নিবেদিত যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করা হয়। সেনাতে সামিল হয়ে এবং রাইফেল বহন করতে পেরে তারা কতটা খুশি অনুভব করে, এই ধরনের গল্প ছাপানো হতে থাকে। কিছু গল্পে তাদের একা হাতে শত্রু হত্যা করার অবিশ্বাস্য সাহসীকতার গল্পও প্রকাশ হয়। নগুয়েন-থাই-জুয়ান (Nguyen Thi Xuan) সম্পর্কে বলা হয় যে, কেবলমাত্র 20 টি গুলি দিয়ে তিনি একটি জেট বিমান ধ্বংস করেন।

নারীদের শুধু যোদ্ধা হিসেবে নয়, বরং শ্রমিক হিসাবেও বর্ণনা করা হয়। এক হাতে রাইফেল অন্য হাতে হাতুড়ি সহও তাদের ছবি চিত্রিত হয়। তরুণী বা বৃদ্ধা নারীদের নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা এবং দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধরতা হিসেবেও ছবি অঙ্কিত করা হয়। 1960 এর দশকে যুদ্ধে পুরুষ সৈনিকদের হতাহত হওয়ার কারণে বৃহত্তর সংখ্যায় নারীদের সংগ্রামে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়।

অনেক নারীরা এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তারা আহতদের শুশ্রূষা করে, ভূগর্ভস্থ কক্ষ তৈরি করে, সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হো চি মিন রাস্তা বরাবর তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা 2195 কিলোমিটার লম্বা রাস্তায় পাহাড়া দেয় এবং 2500টি মূল জায়গাকে সুরক্ষিত করে। তারা ছয়টি বিমান ঘাঁটি তৈরি করে, হাজার হাজার বোমা নিষ্ক্রিয় করে, হাজার হাজার কেজি মাল পরিবহণ, অস্ত্রশস্ত্র ও খাবার সরবরাহ করতে থাকে এবং 15টি বিমানকে ভূপাতিত করে।

1965 থেকে 1975 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে 17000 যুবা (youth) এই রাস্তায় কর্মরত ছিল তার 70 থেকে 80 শতাংশ ছিল মহিলা। এক সৈনিক ইতিহাসকার এর মতে, ভিয়েতনামের সেনা, নাগরিক সেনা, স্থানীয় সেনাবাহিনী এবং পেশাদার কর্মীদের মধ্যে 1.5 মিলিয়ন ছিল মহিলা।

7.4 শান্তির সময় নারীরা

1970 সাল নাগাদ শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছিল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নারী যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ সীমিত হয়ে যায়। এই সময় থেকে নারীদের শ্রমিক হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়। তাদের সৈনিক হিসেবে নয় বরং কৃষি সমন্বয়, কারখানা, উৎপাদন ব্যবস্থায় কর্মরতা হিসেবে দেখানো হয়।

চিত্র 18 – এক হাতে বন্দুক সহ
নারীদের সম্পর্কে তৈরি গল্প অনুসারে নারীরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী। একটি সাধারণ বিবরণ ছিল— অপরূপা নারী আমি পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছি। জেল আমার পাঠশালা, তরোয়াল আমার সন্তান এবং বন্দুক আমার স্বামী।

চিত্র 19 – ভিয়েতনামের মহিলা ডাক্তাররা আহতদের শুশ্রূষা করছে।

8 যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

দীর্ঘকাল ধরে চলা যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এটা পরিষ্কার ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা ভিয়েতনামীদের প্রতিরোধ ও চূর্ণ করতে পারেনি। মার্কিন কর্মকাণ্ডের জন্য ভিয়েতনামের জনগণের সমর্থনও আদায় করতে পারেনি। ইতিমধ্যে আমেরিকার হাজার হাজার তরুণ সৈন্য তাদের প্রাণ দিয়েছে অন্যদিকে অগনিত ভিয়েতনামী নাগরিকদের হত্যা করা হয়েছে। এই যুদ্ধকে 'প্রথম টেলিভিশন যুদ্ধ' বলা হয়। যুদ্ধের দৃশ্য প্রতিদিন সংবাদ কর্মসূচিতে দেখানো হয়। আমেরিকার কুকীর্তি দেখে অনেকেরই আমেরিকার প্রতি মোহভঙ্গ হয়। মেরি ক্যাকার্থী এর মতো লেখক এবং জেন ফন্ডার এর মতো শিল্পীরা দুই ভিয়েতনাম ভ্রমণ করেন এবং ভিয়েতনামীদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি এই যুদ্ধকে 'শান্তি, জাতীয় স্ব-প্রকল্প এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ট হুমকি' বলে বর্ণনা করেন।

চিত্র 20 – চুক্তির পর দক্ষিণ ভিয়েতনামে বন্দি হওয়া উত্তর ভিয়েতনামের সেনাদের মুক্তি হচ্ছে।

সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা যুদ্ধের অবসান ঘটানোর পদক্ষেপকে শক্তিশালী করেছে। 1974 খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে প্যারিসে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্ব শেষ হলেও সাইগন শাসন ও এন এল এফের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। 1975 খ্রিঃ 30শে এপ্রিল এন এল এফ সাইগন রাষ্ট্রপতি ভবন দখল করে এবং ভিয়েতনামের ঐক্য সাধন করে।

চিত্র 21 – সাইগণ মুক্ত হওয়ার পর ভিয়েতকোং সৈন্যরা ট্যাঙ্কের উপর ছবি তোলার ভঙ্গীতে।
What does this image tell us about the nature of Vietnamese nationalism?

সংক্ষেপে লিখ :

1. নিম্নলিখিত বিষয়ে টীকা লেখো
 a) ঔপনিবেশিকদের 'সভ্য মিশন' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে।
 b) হুইন ফুসো।
2. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করো
 a) ভিয়েতনাম-এ মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছাত্র স্কুলের পড়া শেষ করতে পারত।
 b) ফরাসিরা মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে খাল নির্মাণ ও ভূমি নিষ্কাশন শুরু করে।
 c) সাইগন নেটিভ বালিকা বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়েছিল তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার আদেশ করে।
 d) আধুনিক, নবনির্মিত হ্যানয় এর অঞ্চলগুলোতে ইঁদুরের প্রদুর্ভাব ছিল।
3. টনকিং স্কুল স্থাপনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? ভিয়েতনামে ঔপনিবেশিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে এটি কতটা সঠিক উদাহরণ দাও।
4. ভিয়েতনামের ব্যাপারে ফান চু ট্রিন এর উদ্দেশ্য কি ছিল? ফান বয় চাও এর ধারণার সঙ্গে এর কি পার্থক্য ছিল?

আলোচনা কর :

1. এই অধ্যায়ে তুমি যা পড়েছ সেই প্রসঙ্গে ভিয়েতনামের সংস্কৃতি ও জীবনের উপর চিনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করো।
2. ভিয়েতনামে উপনিবেশবাদ বিরোধী অনুভূতি সৃষ্টিতে ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকা কী ছিল?
3. ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা করো। আমেরিকার এই যুদ্ধে অন্তর্ভুক্তি তার দেশে কী প্রভাব ফেলে?
4. আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের যুদ্ধকে নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করো।
 a) হো-চি-মিন রাস্তার কর্মরত একজন কুলি।
 b) একজন নারী সৈনিক।
5. ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে মহিলাদের ভূমিকা কি ছিল? ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সাথে যুক্ত মহিলাদের সঙ্গে এদের আন্দোলনের তুলনা করো।

প্রকল্প

দক্ষিণ আমেরিকার যে কোনো একটি দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সন্ধান করো। কল্পনা করো এই দেশের একজন মুক্তিযোদ্ধার ভিয়েতনামের সৈনিকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় এবং তারা নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। তাদের মধ্যে কী ধরনের কথোপকথন হতে পারে সে সম্পর্কে লিখো।

ভারতে জাতীয়তাবাদ
(Nationalism in India)

তোমরা জেনেছ ইউরোপে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এতে নিজের সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তারা কারা? তাদের পরিচয় কী? তাদের একাত্মতার অনুভূতি কীভাবে সংজ্ঞায়িত হবে? এই ধারণা পাল্টে যায়। নতুন নতুন প্রতীক ও চিহ্ন, নতুন আদর্শ, সংগীত, নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সীমারেখা পুনরায় সংজ্ঞায়িত হয়। বেশিরভাগ দেশে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই নতুন জাতীয় পরিচয় তৈরি হয়। ভারতে কীভাবে এই চেতনার উদ্ভব হয়?

ভিয়েতনাম ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের মতো ভারতেও আধুনিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঔপনিবেশিক আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাদের ঐক্যের অনুভূতির সাথে পরিচিতি ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে নিপীড়িত হওয়ার অনুভূতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বন্ধন তৈরি করে এবং তাদের একসূত্রে গ্রথিত করে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠী উপনিবেশবাদের প্রভাবকে ভিন্নভাবে অনুভব করেছিল, তাদের অভিজ্ঞতাও ছিল পৃথক, স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের ধারণাও সব সময় এক ছিল না। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস একটি আন্দোলনের মাধ্যমে এই সব গোষ্ঠীকে একত্রিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সংঘাত ছাড়া এই একতার উত্থান হয়নি।

পূর্ববর্তী পাঠ্যপুস্তকে তোমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে পড়েছো। এই অধ্যায়ে আমরা 1920 এর দশকের ঘটনা তুলে ধরব এবং অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে জানব। কংগ্রেস কীভাবে জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিল? কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং জাতীয়তাবাদ কীভাবে মানুষকে নতুন কল্পনার জগতে নিয়ে যায়— এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করব।

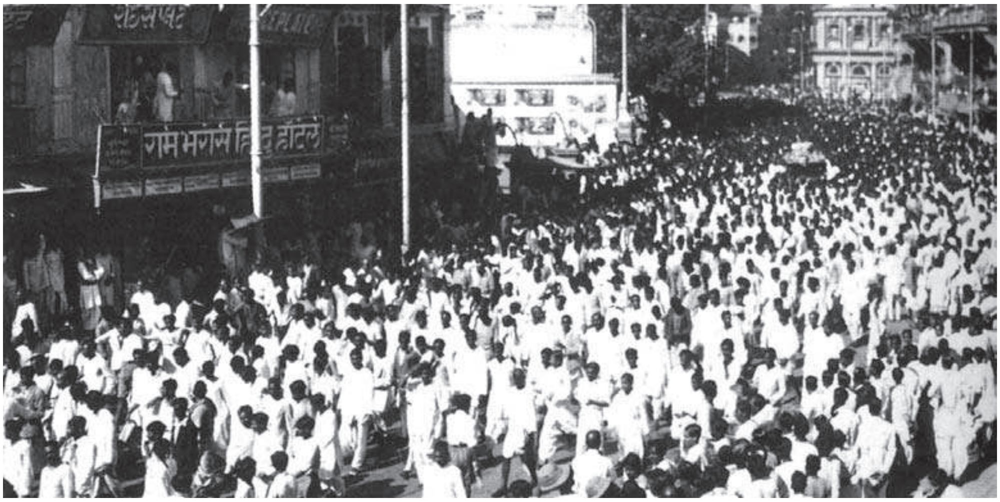

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল— *জাতীয় আন্দোলনের সময় রাস্তায় গণমিছিল একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।*

1 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, খিলাফত এবং অসহযোগ

আমরা দেখেছি, 1919 খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, নতুন সামাজিক গোষ্ঠীও সংঘবদ্ধ হয় এবং সংগঠনের নতুন নতুন পদ্ধতিরও ক্রমবিকাশ ঘটে। আমরা এই ক্রমবিকাশকে কীভাবে বুঝব? এর কী প্রভাব পড়ে?

সর্বপ্রথম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক নতুন আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর ফলে প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের খরচ চালানোর জন্য ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং কর বৃদ্ধি করা হয়। বহিঃশুল্ক বৃদ্ধি করা হয় এবং আয়কর প্রবর্তন করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে— 1913-1918 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হয়ে যায়— যার ফলে সাধারণ মানুষ চরম কষ্টের সম্মুখীন হয়। গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে সৈন্য সরবরাহ করার কথা বলা হয় এবং বলপূর্বক সেনা নিয়োগ করার ফলে গ্রামীণ এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। 1918-19 এবং 1920-21 খ্রিস্টাব্দে দেশের অনেকাংশে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, ফলে খাদ্যশস্যের তীব্র আকাল দেখা দেয়। এর সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যুক্ত হয়। 1921 খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে 120-130 লক্ষ লোক মারা যায়।

নতুন শব্দ

বলপূর্বক নিয়োগ (Forced recruitment) একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা জনগণকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়।

যুদ্ধের শেষে তাদের সমস্যা ও কষ্ট দূর হবে বলে মানুষ আশা করেছিল কিন্তু বাস্তবে তা হল না।

এই পর্যায়ে এক নতুন নেতার আবির্ভাব হয় এবং সংগ্রামের এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভব স্পষ্ট হয়।

1.1 সত্যাগ্রহের ধারণা

1915 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধি ভারতে ফিরে আসেন। তোমরা জানো তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন, সেখানে তিনি এক অভিনব পদ্ধতির গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচলিত বর্ণবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সফলভাবে সংগ্রাম করেছিলেন, যা সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত।

চিত্র 2— দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কর্মীদের ভক্সরাস্ট্রের পথে যাত্রা :
1913 খ্রিস্টাব্দের ৬ই নভেম্বর নিউক্যাসেল থেকে ট্র্যান্সভাল-এর দিকে যাত্রা করা শ্রমিকদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন মহাত্মা গান্ধি। যখন মিছিল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং গান্ধিজিকে গ্রেফতার করা হয়, হাজার হাজার শ্রমিক অশ্বেতাঙ্গদের অধিকার হরণকারী আগ্রাসী বর্ণবাদী আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে যোগ দেন।

সত্যাগ্রহের ধারণা, সত্যের শক্তি এবং সত্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এর অর্থ হল— যদি সংগ্রামের উদ্দেশ্যটি সঠিক হয়, যদি সংগ্রামটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে হয়, তবে অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন নেই। প্রতিশোধের মনোভাব ও আগ্রাসীভাব না রেখেও একজন সত্যাগ্রহী কেবল অহিংসার দ্বারাই যুদ্ধ জয় করতে পারে। অত্যাচারকারীর বিবেক জাগ্রত করার মধ্য দিয়েই তা করা সম্ভব। সহিংসতার মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য করার পরিবর্তে শুধু অত্যাচারকারীই নয়, বরং সমস্ত মানুষদেরই সত্যকে গ্রহণ এবং স্বীকার করার প্রেরণা যোগানোই সত্যাগ্রহ। এই সংগ্রামের মাধ্যমে সত্যেরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়। মহাত্মা গান্ধি বিশ্বাস করতেন, অহিংসার এই ধর্মই সমস্ত ভারতীয়দের একতার সূত্রে বাঁধতে পারে।

ভারতে আসার পর মহাত্মা গান্ধি বিভিন্ন জায়গায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফলভাবে সংগঠিত করেছিলেন। 1916 খ্রিস্টাব্দে তিনি জোরপূর্বক চাষব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বিহারের চম্পারণ ভ্রমণ করেন। এরপর 1917 খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের খেদা জেলার কৃষকদের সমর্থন করার জন্য তিনি একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করেন। ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে এবং প্লেগ মহামারীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে খেদা জেলার কৃষকরা রাজস্ব দিতে পারেনি এবং রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করার দাবি করতে থাকে। 1918 খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধি সূতি বস্ত্র কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য আমেদাবাদ যান।

1.2 রাউলাট আইন

এই সফলতার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে গান্ধিজি 1919 খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতীয় সদস্যদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ইম্পোরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তাড়াতাড়ি এই আইন পাশ করে। এই আইন দ্বারা সরকার রাজনৈতিক বন্দিদের দুই বছর পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক করে রাখার ক্ষমতা লাভ করে। মহাত্মা গান্ধি এই ধরনের অন্যায়মূলক আইনের বিরুদ্ধে অহিংস উপায়ে আইন অমান্য করতে চেয়েছিলেন, যা ৬ই এপ্রিল একটি হরতাল-এর মাধ্যমে শুরু হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন শহরে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। দোকান-পাট বন্ধ হয়। এই গণ অভ্যুত্থানের ফলে আতঙ্কিত এবং রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার ভয়ে ব্রিটিশ প্রশাসন জাতীয়তাবাদীদের কঠোর হাতে দমন করতে শুরু করে। অমৃতসরের অনেক স্থানীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। গান্ধিজির দিল্লিতে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। 10ই এপ্রিল পুলিশ অমৃতসরের এক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় গুলিবর্ষণ করে। এরপর জনগণ ব্যাঙ্ক, ডাকঘর এবং রেলস্টেশন আক্রমণ শুরু করে। জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে মার্শাল আইন আরোপিত হয়।

উৎস (ক)

সত্যাগ্রহ সম্পর্কে গান্ধিজির ধারণা :

বলা হয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হল দুর্বলের অস্ত্র। কিন্তু এই নিবন্ধের বিষয় 'শক্তি' শুধুমাত্র শক্তিশালী দ্বারাই ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের শক্তি নয়। বস্তুতপক্ষে এটিকে সক্রিয় কার্যকলাপ বলা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলন নিষ্ক্রিয় ছিল না বরং সক্রিয় ছিল...

সত্যাগ্রহ শারীরিক শক্তি নয়, একজন সত্যাগ্রহী তার শত্রুকে কষ্ট দেয় না, তার ধ্বংস চায় না, ... সত্যাগ্রহের প্রয়োগে কোন বিদ্বেষ থাকে না।

সত্যাগ্রহ হল শুদ্ধ আত্মশক্তি। সত্য হল আত্মার সারবস্তু। এই জন্য এই শক্তিকে সত্যাগ্রহ বলা হয়। আত্মা জ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতে ভালোবাসার শিখা জ্বলে... অহিংসা পরম ধর্ম...

এটা নিশ্চিত যে ভারত অস্ত্রের জোরে বৃটেন বা ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। ব্রিটিশরা যুদ্ধদেবতার উপাসনা করে। তারা অস্ত্রের ধারক বা বাহকে পরিণত হতে পারত এবং তারা সে পথ অনুসরণ করছিল। ভারতের কোটি কোটি মানুষ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না। তারা তাদের নিজস্ব অহিংস ধর্ম সৃষ্টি করেছে...

কাজ

মনোযোগ সহকারে বিষয়বস্তু পাঠ করো। মহাত্মা গান্ধি সক্রিয় সত্যাগ্রহ বলতে কি বুঝিয়েছেন?

13 এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে কলঙ্কিত ঘটনা ঘটে। সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাচীর ঘেরা ময়দানে বিশাল সংখ্যক জনতা একত্রিত হন। কেউ কেউ সরকারের নতুন দমনমূলক পদক্ষেপের প্রতিবাদ করতে এসেছিলেন। অন্যরা বার্ষিক বৈশাখী মেলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে এসেছিলেন। শহরের বাইরে থেকে আসার ফলে মার্শাল আইন চালু হওয়া সম্পর্কে অনেক গ্রামবাসী অবগত ছিলেন না। ময়দানে প্রবেশ করে ডায়ার প্রস্থানের রাস্তা অবরুদ্ধ করে দেন এবং জনতার উপর গুলি বর্ষণ শুরু হয়। শতশত লোক নিহত হন। পরবর্তী সময়ে ডায়ার বলেন, সত্যাগ্রহীদের মনে সন্ত্রাস ও ভীতির অনুভূতি তৈরি করে 'এক নৈতিক প্রভাব' সৃষ্টি করাই ছিল এই ঘটনার মূল উদ্দেশ্য।

চিত্র 3— ব্রিটিশ সেনাদের দ্বারা জেনারেল ডায়ারের 'হামাগুড়ি আদেশ' কার্যকর।
1919 খ্রিস্টাব্দে, অমৃতসর, পাঞ্জাব

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গো সঙ্গো উত্তর ভারতের অনেক শহরে জনতা রাস্তায় নেমে আসে। বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘট, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ এবং সরকারি ভবনে হামলা হতে থাকে। সরকার নিষ্ঠুর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। জনগণকে অপদস্থ ও ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে। সত্যাগ্রহীদের মাটিতে নাক ঘষতে বাধ্য করা হয়। রাস্তায় হামাগুড়ি দিতে এবং সাহেবদের স্যালুট করতেও বাধ্য করা হয়। জনগণকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয় এবং গ্রামে (পাঞ্জাবের গুঁজরানওয়ালা, বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত) বোমাবর্ষণ করা হয়। সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে মহাত্মা গান্ধি আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

রাউলাট সত্যাগ্রহ একটি ব্যাপক আন্দোলন হলেও তা শুধু শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধিজি তখন ভারতে আরো ব্যাপক আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ না করে এই প্রকারের আন্দোলন সংগঠিত করা যাবে না। আর এই কাজে অগ্রসর হওয়ার উপায় হিসেবে তিনি খলিফা বিষয়টি তুলে ধরার কথা চিন্তা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমন তুর্কি সাম্রাজ্যের পরাজয় ঘটে এবং গুজব রটে যে, ইসলামিক বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতা (খলিফা) অটোমন সম্রাটের উপর এক কঠোর শান্তি চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হবে। খলিফার ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য 1919 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বোম্বাইয়ে এক খিলাফত কমিটি গঠন করা হয়। মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি ভাইয়ের মতো মুসলিম তরুণ প্রজন্মের নেতারা খলিফা বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য গান্ধিজির সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। গান্ধিজি এটিকে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের ছত্রছায়ায় মুসলমানদের একত্রিত করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন। 1920 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গান্ধিজি কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের খিলাফত আন্দোলন সমর্থন ও স্বরাজ-এর জন্য একটি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করান।

1.3 অসহযোগ কেন?

গান্ধিজি তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক *'হিন্দ স্বরাজ'* (1909) এ বলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের সহযোগিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সহযোগিতার দ্বারাই এই

শাসনব্যবস্থা টিকে আছে, যদি ভারতীয়রা সহযোগিতা করতে অস্বীকৃত হয়, এক বছরের মধ্যেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পতন ঘটবে এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

অসহযোগিতা কীভাবে আন্দোলন হতে পারে? গান্ধিজি প্রস্তাব করেছিলেন যে, এই আন্দোলন পর্যায়ক্রমে প্রসারিত হবে। সরকারের দেওয়া পদবী ত্যাগ করার সাথে এটি শুরু হওয়া উচিত এবং সরকারি চাকুরী, সেনা, পুলিশ, আদালত, বিধান পরিষদ, বিদ্যালয় এবং বিদেশী জিনিস বয়কট করা উচিত। যদি সরকার দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে, ব্যাপক আইন অমান্য অভিযান শুরু করতে হবে। 1920 খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে মহাত্মা গান্ধি ও সৌকত আলি আন্দোলনের স্বপক্ষে ব্যাপকভাবে জনমত গঠন করার জন্য সারাদেশে ভ্রমণ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই প্রস্তাবটি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। 1920 সালের নভেম্বরে কাউন্সিল নির্বাচনের সময়সূচি বয়কট করতে তাঁরা অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁরা ভীত ছিলেন যে, আন্দোলন সহিংসতার দিকে পরিচালিত হতে পারে। সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তীব্র মতবিরোধ চলে এবং কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছিল আন্দোলনের সমর্থক এবং বিরোধীদের মধ্যে সহমত গড়ে উঠবে না। শেষ পর্যন্ত 1920 খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে মতবিরোধের বোঝাপড়া হয় এবং অসহযোগ কর্মসূচি গৃহীত হয়।

আন্দোলন কীভাবে প্রসারিত হয়? কারা এতে অংশগ্রহণ করে? বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী কীভাবে অসহযোগিতার ধারণাকে গ্রহণ করে?

নতুন শব্দ

বয়কট : কারো সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে অস্বীকার করা বা কোন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ না করা বা জিনিসপত্র ক্রয় বা ব্যবহার করতে অস্বীকার করা। সাধারণতঃ এটি প্রতিবাদের একটি রূপ।

চিত্র 4— 1922 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিদেশী বস্ত্র বয়কট :
বিদেশী কাপড়কে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিপত্যের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়।

2 আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা

1921 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তাদের কিছু নিজস্ব দাবি নিয়ে এই আন্দোলনে সামিল হয়। তারা সবাই স্বরাজের ডাকে সাড়া দিয়েছিল কিন্তু স্বরাজ শব্দটির অর্থ বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রকম ছিল।

2.1 শহরে আন্দোলন

শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণের মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সরকারি স্কুল কলেজ বর্জন করে। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরাও ইস্তফা দেন। আইনজীবীরা তাদের আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। বেশিরভাগ প্রদেশেই কাউন্সিল নির্বাচন বর্জন করে। ব্যতিক্রম ছিল মাদ্রাজ, যেখানে অ-ব্রাহ্মণদের দল জাস্টিস পার্টি অনুভব করে যে, কাউন্সিলে প্রবেশ করার মাধ্যমে কিছু ক্ষমতা অর্জন করা যাবে— এমন কিছু অধিকার যা সাধারণ ব্রাহ্মণদের কাছেই ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল অনেক বেশি নাটকীয়। বিদেশী পণ্য বয়কট করা হয়। বিলেতী মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করা হয় এবং প্রকাশ্যে বিদেশী বস্ত্র জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। 1921-22 খ্রিস্টাব্দে বিদেশী পণ্যের আমদানী অর্ধেক হয়ে যায়। এর মূল্য 102 কোটি টাকা থেকে কমে 57 কোটি টাকা হয়। অনেক স্থানেই বণিক ও ব্যবসায়ীরা বিদেশী পণ্য বিক্রি করতে বা বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করতে অস্বীকৃত হন। বয়কট আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে মানুষ বিদেশী পোশাক বর্জন করে। শুধুমাত্র দেশীয় বস্ত্র পরিধান করা শুরু করলে ভারতীয় বস্ত্র ও তন্তু শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে।

নতুন শব্দ

পিকেটিং— বিক্ষোভের একটি রূপ যার মাধ্যমে লোকেরা দোকান, কারখানা বা অফিসে প্রবেশে বাধা দেয়।

কিন্তু শহরের এই আন্দোলন বিভিন্ন কারণে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। খাদির পোশাক, কারখানায় তৈরি কাপড়ের থেকে অনেক বেশি দামি ছিল, ফলে গরিব লোকদের পক্ষে তা ক্রয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। কীভাবে তারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মিলের কাপড় বয়কট করতে পারত? একইভাবে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বয়কট করার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। আন্দোলনকে সফল করার জন্য বিকল্প দেশীয় সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যেগুলি ব্রিটিশ সংস্থাগুলির স্থান দখল করতে পারে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গতি ছিল মন্থর। ফলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সরকারি স্কুল-কলেজগুলিতে পুনরায় ফিরে যায় এবং আইনজীবীরাও আবার সরকারি বিচারালয়ে কাজ শুরু করে।

কাজ

মনে করো 1921 খ্রিস্টাব্দে তুমি কোন সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থী। গান্ধিজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

2.2 গ্রামীণ এলাকায় বিদ্রোহ

অসহযোগ আন্দোলন শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও বিস্তার লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের বিভিন্ন

অংশের কৃষক ও উপজাতিদের সংগ্রামও এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়।

অবধ-এ একজন সন্ন্যাসী বাবা রামচন্দ্র কৃষকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পূর্বে তিনি ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। এই আন্দোলন তালুকদার ও জমিদারদের দ্বারা অত্যধিক পরিমাণ বিভিন্ন কর ও উপকর আদায়ের বিরুদ্ধে ছিল। ভূ-স্বামীদের জমিতে কৃষকদের বিনা পারিশ্রমিকে 'বেগার' খাটতে হত। প্রজাদের স্বত্ত্বের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তাদের যখন তখন লিজ প্রাপ্ত জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত যাতে তারা জমিতে তাদের অধিকার দাবি করতে না পারে। এই কৃষক আন্দোলনের দাবি ছিল রাজস্ব হ্রাস, বেগার শ্রমের বিলুপ্তি এবং অত্যাচারী ভূ-স্বামীদের সামাজিক বয়কট। অনেক জায়গায় 'নাই ধোবি' বন্ধের মাধ্যমে নাপিত ও ধোপার সেবা থেকে ভূ-স্বামীদের বঞ্চিত করা হয়। 1920 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে জওহরলাল নেহেরু অবধের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেন। অক্টোবরে নেহেরু, বাবা রামচন্দ্র ও অন্যান্যরা মিলে অবধ কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এক মাসের মধ্যেই ওই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে 300টিরও বেশি শাখা স্থাপিত হয়। তাই পরের বছর যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন কংগ্রেসও অবধের কৃষক আন্দোলনকে এই ব্যাপক আন্দোলনে সম্মিলিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষক আন্দোলন যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল তা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 1921 খ্রিস্টাব্দে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে কৃষকরা তালুকদার ও বণিকদের বাড়িতে আক্রমণ করে, বাজার লুট করা হয় এবং শস্যভাণ্ডার দখল করে। অনেক স্থানে আঞ্চলিক নেতারা কৃষকদের বলেছিলেন যে, গান্ধিজি কর না দেওয়ার ডাক দিয়েছেন এবং গরিবদের মধ্যে জমি পুনর্বন্টন করা হবে। সকল কর্মকাণ্ড ও আকাঙ্ক্ষা অনুমোদনের জন্য মহাত্মা গান্ধির নাম কাজে লাগানো হয়।

নতুন শব্দ

বেগার— শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দান করতে বাধ্য করা

কাজ

1920 খ্রিস্টাব্দে তুমি যদি উত্তরপ্রদেশের একজন কৃষক হতে তবে গান্ধিজির স্বরাজের আহ্বানে কীভাবে সাড়া দিতে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

1928 খ্রিস্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গুজরাটের বারদৌলি তালুকে ভূ-রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, যা বারদৌলি সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত। বল্লভভাই প্যাটেলের যোগ্য নেতৃত্বে এই আন্দোলন সফল হয়। এই সংগ্রামের কাহিনি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং ভারতের অনেক অংশে অসীম সহানুভূতি লাভ করে।

উৎস (খ)

1921 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুলিশ সংযুক্ত প্রদেশের নিকটে রায়বেরেলিতে কৃষকদের উপর গুলি চালায়। জওহরলাল নেহেরু ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পুলিশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। রাগে উত্তেজিত হয়ে নেহেরু তার চারপাশে একত্রিত হওয়া কৃষকদের উদ্দেশ্যেই বক্তব্য রাখেন। এই সভার ব্যাপারে তিনি পরবর্তী সময়ে বলেন, বিপদের সম্মুখেও তারা সাহসী পুরুষের মতো অবিচলিত ও শান্ত আচরণ করেছে। আমি জানি না তারা কেমন অনুভব করেছে কিন্তু আমি জানি আমার অনুভূতি কেমন ছিল। এক মুহূর্তের জন্য আমার রক্তের গতি বেড়ে গেল। অহিংসা প্রায় ভুলে গেলাম— কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য। মহান নেতার ভাবনা যিনি ঈশ্বরের কৃপার মাধ্যমে আমাদের বিজয়ী হতে পাঠিয়েছেন— তার চিন্তাধারা আমার মনে পড়ল এবং আমি দেখলাম আমার আশেপাশে বসা ও দাঁড়ানো কৃষকরা আমার চেয়ে কম উত্তেজিত ছিল, আমার তুলনায় শান্ত ছিল। আমার দুর্বলতার সেই মুহূর্ত কেটে যায়। আমি সম্পূর্ণ বিনম্রতার সাথে অহিংসা সম্পর্কে তাদের সঙ্গে কথা বলি— যদিও এই উপদেশ তাদের থেকে আমার বেশি প্রয়োজন ছিল— তারা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনল এবং শান্তিপূর্ণভাবে চলে গেল।

সর্বপল্লী গোপাল রচিত জওহরলাল নেহেরু— আত্মজীবনী খন্ড-১ থেকে নেওয়া হয়েছে।

উপজাতি অংশের কৃষকরা মহাত্মা গান্ধির বক্তব্য এবং স্বরাজের ধারণাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে। 1920 খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে অন্ধ্রপ্রদেশের গুডেম পাহাড়ি অঞ্চলে এক উগ্র গেরিলা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেস এই ধরনের সংঘর্ষ কখনোই অনুমোদন করতনা। অন্য অঞ্চলের মতোই এখানেও ঔপনিবেশিক সরকার স্থানীয় মানুষদের পশুচারন করতে বা জ্বালানি কাঠ ও ফল সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। উপজাতিরা তাদের জীবিকা হারানোর ভয়ে ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়। সরকার রাস্তা তৈরির জন্য যখন তাদের বেগার খাটতে বলে তখন তারা বিদ্রোহ করে। তাদের বিদ্রোহের নেতা আল্লুরি সীতারাম রাজু কৌতুহলোদ্দীপক লোক ছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে, তার দৈব ক্ষমতা আছে, তিনি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। মানুষকে সুস্থ করতে পারেন এবং তাঁকে বন্দুকের গুলিও মারতে পারে না। রাজুর দ্বারা বিমোহিত হয়ে বিদ্রোহীরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে প্রচার করেন। রাজু গান্ধিজির মহত্বের কথা প্রচার করেন এবং বলেন, তিনি গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি মানুষকে খাদি কাপড় পরতে বলেন এবং মদ্য পান ত্যাগ করতে বলেন। একই সাথে তিনি বলেন যে, ভারত অহিংসা নয়, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই স্বাধীন হতে পারবে। গুডেমের বিদ্রোহীরা স্বরাজ অর্জনের জন্য গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং পুলিশ থানা আক্রমণ করে। ব্রিটিশ কর্মচারীদের হত্যার চেষ্টা করে। রাজু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং 1924 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং তিনি লোকনায়ক হয়ে উঠেন।

2.3 বাগিচাগুলিতে স্বরাজ

শ্রমিকদেরও গান্ধিজি সম্পর্কে ও স্বরাজ সম্বন্ধে নিজস্ব ভিন্ন মনোভাব ছিল। আসামের বাগিচা শ্রমিকদের কাছে স্বাধীনতার মানে ছিল তারা যে বদ্ধ পরিবেশে জীবনযাপন করত তা থেকে মুক্তি, তারা মুক্তভাবে যাতায়াত করতে পারবে এবং তাদের গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে। 1859 খ্রিস্টাব্দে Inland Emigration Act জারির মাধ্যমে অনুমতি ছাড়া বাগিচা শ্রমিকদের চা-বাগান ত্যাগ নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের কদাচিৎ এই অনুমতি দেওয়া হত। যখন তারা অসহযোগ আন্দোলনের কথা শুনে, তখন হাজার হাজার চা-বাগিচার শ্রমিক বাগান ত্যাগ করে এবং নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা বিশ্বাস করেছিল যে, গান্ধিরাজ আসছে এবং সবাইকে তাদের নিজস্ব গ্রামে জমি দেওয়া হবে। কিন্তু তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারেনি। রেলওয়ে ও স্টিমার ধর্মঘটের জন্য তারা পথে আটকে পড়ে এবং পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। তাদের উপর পুলিশের নৃশংস অত্যাচার নেমে আসে।

কাজ

ব্রিটিশদের দ্বারা বন্দি এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল, জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এমন আন্দোলনকারীদের খুঁজে বের কর। তুমি কি ইন্দো-চিন জাতীয় আন্দোলন থেকে অনুরূপ উদাহরণ দিতে পারো?

কংগ্রেসের কর্মসূচিতে এই আন্দোলনের লক্ষ্য সঠিকভাবে স্থির করা হয়নি। শ্রমিকরা নিজেদের মতো করে স্বরাজকে ব্যাখ্যা করেছিল, যার মাধ্যমে তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হবে। যখন উপজাতিরা গান্ধিজির নামে জয়ধ্বনি দিয়ে 'স্বতন্ত্র ভারত' এর স্লোগান দিত তখন তারা মানসিকভাবে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল। যখন তারা মহাত্মা গান্ধিজির নামে কাজ করে এবং তাদের আন্দোলনকে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত করে, তখন বাস্তবে এমন এক আন্দোলনের সাথে তারা যুক্ত হয় যার তীব্রতা শুধু তাদের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

চিত্র 5— 1922 খ্রিস্টাব্দে চৌরিচৌরা ঘটনা
গোরক্ষপুরে অবস্থিত চৌরিচৌরা বাজার থেকে বের হওয়া এক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের সাথে পুলিশের এক সহিংস সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনা শোনামাত্র মহাত্মাগান্ধি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

3 আইন অমান্যের অভিমুখে

1922 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অনুভব করেন যে, অহিংস আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নিচ্ছে এবং গণসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার আগে সত্যাগ্রহীদের সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ জমাট বাঁধে এবং তারা 1919 খ্রিস্টাব্দে Government of India Act অনুসারে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাদের মতে, আইনসভার ভেতরে থেকেই ব্রিটিশ নীতির বিরোধিতা প্রয়োজন। এছাড়া সংস্কারের জন্য বিতর্ক করে প্রমাণ করা যে, এই পরিষদ সত্যিই গণতান্ত্রিক সংস্থা নয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু আইনসভায় যোগদানের জন্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্বরাজ দল গঠন করেন। জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো তরুণ নেতারা উগ্র গণআন্দোলন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাপ সৃষ্টি করার পক্ষপাতি ছিলেন।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সময় ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক লালা লাজপত রায় লাঞ্ছিত হন। বিক্ষোভের সময় তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন এবং পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

অভ্যন্তরীন বিতর্ক ও সংঘাতের এমন এক পরিস্থিতিতে 1920 এর দশকের শেষের দিকে আবার দুটি বিষয় ভারতীয় রাজনীতিকে নতুন রূপ দেয়। প্রথমটি ছিল, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব। 1926 খ্রিস্টাব্দ থেকে কৃষি পণ্যের মূল্যস্ফীতি ঘটতে শুরু করে এবং 1930 খ্রিস্টাব্দের পর তা ধসে পড়ে। কৃষি পণ্যের চাহিদা ও রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার ফলে কৃষকদের পক্ষে তাদের ফসল বিক্রি করা এবং রাজস্ব প্রদান করা কঠিন বলে মনে হয়। 1930 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গ্রামাঞ্চলে হুলুস্থুল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই পটভূমিতে ব্রিটেনের নতুন টোরী সরকার স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে সংবিধিবদ্ধ কমিশন গঠন করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় গঠিত কমিশন ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা পরিচালনার পর্যালোচনা এবং সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু কমিশনে সব ব্রিটিশ সদস্য হওয়ায় এবং একজনও ভারতীয় সদস্য না থাকায় সমস্যা সৃষ্টি হয়।

1928 খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশন ভারতে এলে 'ফিরে যাও সাইমন' (Simon Go Back) ধ্বনিতে তার অভিবাদন করা হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ সহ সব দল এই বিক্ষোভ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। এই বিক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য 1929 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভাইসরয় লর্ড আরউইন একটি ঘোষণা দেন। তিনি ভারতের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য একটি অস্পষ্ট 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ব্যাপারে আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের কথাও বলেন। এই প্রস্তাব কংগ্রেস নেতাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী আরো দৃঢ় মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে।

চিত্র 6— 1931 সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের বৈঠক
মহাত্মাগান্ধি ছাড়াও এই ছবিতে তোমরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (একেবারে বাঁদিকে) জওহরলাল নেহেরু (একেবারে ডানদিকে) এবং সুভাষচন্দ্র বসু (একেবারে ডানদিক থেকে পঞ্চম স্থানে) দেখতে পাচ্ছো।

উদারপন্থী ও নরমপন্থী নেতারা, যারা ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন এর মধ্যে থেকেই সাংবিধানিক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে সংকোচিত হতে থাকে। 1929 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এটা ঘোষণা করা হয় যে, 1930 খ্রিস্টাব্দের 26শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন করা হবে, সেদিন ভারতীয়রা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের শপথ নেবে। কিন্তু এই অনুষ্ঠান খুব কম মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এই অবস্থায় মহাত্মা গান্ধি দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গো সংযুক্ত বাস্তব বিষয় নিয়ে স্বাধীনতার এই বিমূর্ত ধারণাকে বর্ণনা করার একটি উপায় খুঁজে বের করেন।

3.1 লবণ সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধি জাতিকে ঐক্যবন্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে লবণকে গ্রহণ করেন। 1930 খ্রিস্টাব্দের 31শে জানুয়ারি গান্ধিজি লর্ড আরউইনের নিকট 12 দফা দাবি পেশ করেন। এতে শিল্পপতি থেকে কৃষক সব শ্রেণির জন্যই কিছু সাধারণ দাবি ছিল, সঙ্গো অন্যান্য দাবিগুলিও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল দাবিগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা যাতে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি এতে একাত্মবোধ করতে পারে এবং প্রচারাভিযানে একত্রিত হতে পারে। সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দাবি ছিল লবণ শুল্ক বিলুপ্ত করা। লবণ এমন একটি বস্তু যা ধনী, দরিদ্র সবাই ব্যবহার করে এবং লবণ খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লবণ শুল্ক এবং লবণ উৎপাদনের উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকারকে গান্ধিজি ব্রিটিশ শাসনের নিষ্ঠুররূপ বলে বর্ণনা করেন।

মহাত্মা গান্ধির এই চিঠি একদিক থেকে চরমপত্র (Ultimatum) ছিল। চিঠির বয়ান অনুসারে 11ই মার্চের মধ্যে যদি দাবিগুলি পূরণ না হয় তবে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবে। আরউইন আলোচনায় অনিচ্ছুক ছিলেন। ফলস্বরূপ মহাত্মা গান্ধি 78 জন বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গোর জন্য অভিযান শুরু করেন। এই অভিযান গান্ধিজির সবরমতী আশ্রম থেকে শুরু হয়ে 240 কি.মি. দূরে গুজরাটের উপকূল শহর ডান্ডিতে শেষ হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিদিন 10 মাইল হেঁটে চলে এবং 24 দিন পর্যন্ত তাদের যাত্রা চলতে থাকে। গান্ধিজি যেখানেই থামতেন সেখানেই হাজার হাজার লোক তাঁর কথা শুনতে আসত। তিনি তাদের স্বরাজের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করতেন এবং তাদের শান্তিপূর্ণভাবে ব্রিটিশ শাসনকে অমান্য করার আহ্বান জানাতেন। 6ই এপ্রিল তিনি ডান্ডি পৌঁছান এবং সমুদ্রের জল ফুটিয়ে লবণ তৈরি করে আনুষ্ঠানিকভাবে লবণ আইন ভঙ্গা করেন।

এই ঘটনার সঙ্গোই শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন থেকে এই আন্দোলন কোন্ দিক থেকে পৃথক ছিল? মানুষ এই সময় ব্রিটিশদের সঙ্গো 1921-22 খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনের মত শুধুমাত্র অসহযোগিতাই করেনি তারা আইনও ভঙ্গা করেছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষ লবণ আইন ভঙ্গা করেন এবং সরকারি লবণ কারখানার

উৎস (গ)

স্বাধীনতা দিবসের শপথ : 1930 খ্রিঃ 26শে জানুয়ারি

আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্য যে কোন মানুষের মত ভারতীয় জনগণেরও স্বাধীনতা অর্জনের, তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার এবং জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়ার অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার রয়েছে। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন সরকার মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের উপর অত্যাচার করে তবে জনগণেরও অধিকার রয়েছে এটি পরিবর্তনের বা বিলোপ করার। ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণকে শুধু স্বাধীনতার অধিকার থেকেই বঞ্চিত করেনি। দেশের জনসাধারণকে শোষণ করেছে। দেশকে আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও ধ্বংস করে। এজন্য আমরা বিশ্বাস করি ভারতকে অবশ্যই ব্রিটিশের সঙ্গো সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং পূর্ণ স্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

চিত্র 7— ডান্ডি অভিযান।
78 জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গান্ধিজি লবণ অভিযান করেন। রাস্তায় হাজার হাজার লোক এই অভিযানে সামিল হয়।

সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করা হয়। মদের দোকানে পিকেটিং করা হয়। কৃষকরা ভূমি রাজস্ব এবং চৌকিদারি কর দিতে অস্বীকার করে, গ্রামে কর্মচারীরা ইস্তফা দেয় এবং বিভিন্ন স্থানে মানুষ বন আইনও লঙ্ঘন করে। তারা কাঠ সংগ্রহ ও পশুচারণ করার জন্য সংরক্ষিত বনভূমিতে প্রবেশ করে।

আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে ঔপনিবেশিক সরকার আশঙ্কিত হয়ে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু করে। বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক সংঘর্ষ শুরু হয়। 1900 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধির অনুগামী খান আবদুল গফফর খানকে গ্রেপ্তার করা হলে ক্ষুব্ধ লোকজন সশস্ত্র গাড়ি ও পুলিশের গুলিবর্ষণের সামনেই পেশোয়ারের রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। অনেক মানুষ প্রাণ হারায়। এক মাস পরে যখন মহাত্মা গান্ধিকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন শোলাপুর কারখানার শ্রমিকরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক পুলিশ ফাঁড়ি, পৌরসভাভবন, আদালত এবং রেলওয়ে স্টেশনে হামলা শুরু করে। আতঙ্কিত সরকার সমস্ত রকম দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। নারী ও শিশুদের লাঠিপেটা করা হয় এবং প্রায় 1,00,000 লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে গান্ধিজি পুনরায় আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং 1931 খ্রিঃ 5ই মার্চ আরউইন এর সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি দ্বারা গান্ধিজি লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে সম্মত হন।

চিত্র 8— সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের দমন-পীড়ন- 1930 খ্রিস্টাব্দে তোলা ছবি।

(কংগ্রেস প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করেছিল) এবং সরকার রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে সম্মত হয়। 1931 খ্রিঃ ডিসেম্বরে গান্ধিজি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে লন্ডন যান কিন্তু আপোস আলোচনা ভেস্তে যায় এবং গান্ধিজি শূন্য হাতে দেশে ফেরেন। ভারতে ফিরে তিনি লক্ষ করেন যে, সরকার নতুনভাবে দমনপীড়ন শুরু করেছে। গফ্ফর খান ও জওহরলাল নেহেরুকে জেলে ঢোকানো হয়। কংগ্রেসকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হয়। সভাসমিতি, বিক্ষোভ এবং বয়কট প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গভীর উদ্বেগ নিয়ে গান্ধিজি পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চলেছে কিন্তু 1934 খ্রিস্টাব্দে আন্দোলন তার গতি হারায়।

3.2 অংশগ্রহণকারীরা এই আন্দোলনকে কী চোখে দেখেছিল

এখন আমরা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা করব— তারা কেন এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল ? তাদের আদর্শই বা কী ছিল ? স্বরাজ বলতে তারা কী বুঝেছিল ?

গ্রামে ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুজরাটের পতিদার ও উত্তরপ্রদেশের জাঠ এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। আর্থিক মন্দা ও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের কারণে বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদক হিসেবে তারা গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস পাওয়ায় সরকারের রাজস্বের চাহিদা মেটানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এদিকে সরকার রাজস্ব হ্রাসের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে ক্ষোভ বিস্তার লাভ করে। ফলে ধনী কৃষকরা আইন অমান্য আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গো ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কৃষক সম্প্রদায়গুলিকে সংগঠিত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিচ্ছুকদেরও বয়কটে যোগদানে বাধ্য করে। তাদের কাছে স্বরাজের জন্য সংগ্রাম ছিল উচ্চহারে রাজস্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কিন্তু তারা খুব হতাশ হয় যখন খাজনা হ্রাস না করা সত্ত্বেও গান্ধিজি 1931 খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের অবসান ঘোষণা করেন। তাই 1932 খ্রিঃ যখন পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়, তখন তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

দরিদ্র কৃষকরা শুধুমাত্র রাজস্ব হ্রাসেই উৎসাহী ছিল না। তাদের মধ্যে অনেকেই ভূ-স্বামীদের থেকে জমি ইজারা নিয়ে চাষ করত। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অর্থের যোগান হ্রাস পেলে অনেক ক্ষুদ্র ভাগচাষি ভূ-স্বামীদের খাজনা দিতে অসুবিধায় পড়ে। তারা চেয়েছিল ভূ-স্বামীরা এই খাজনা মুকুব করুক। তারা বিভিন্ন রকম চরমপন্থী আন্দোলনে যোগদান করেছিল, যেগুলি প্রায়শই সমাজবাদী ও কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত হত। ধনী কৃষক ও ভূ-স্বামীরা অসন্তুষ্ট হতে পারে এই ভেবে কংগ্রেস ও ‘খাজনা বন্ধ’ আন্দোলনকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক ছিল না, সুতরাং গরিব কৃষক ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল।

Box 1

বিপ্লবের এই পূজা বেদিতে আমরা আমাদের যৌবনকে অর্ঘ্য হিসেবে নিয়ে এসেছি

অনেক জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন যে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অহিংসার মাধ্যমে জেতা সম্ভব নয়। 1928 খ্রিঃ দিল্লির ফিরোজশাহ কোটলা ময়দানে এক সভায় হিন্দুস্থান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি (HSRA) গঠিত হয়। নেতাদের মধ্যে ছিলেন ভগৎ সিং, যতীন দাস এবং অজয় ঘোষ। ভারতের বিভিন্ন অংশে বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে HSRA বৃটিশ শক্তির প্রতীকগুলোকে ধ্বংসের লক্ষ্য বস্তু করে। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত 1929 খ্রিঃ আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ করে। একই বছর লর্ড আরউইন এর ভ্রমণরত ট্রেনটি উড়িয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়। ঔপনিবেশিক সরকার যখন ভগৎ সিং এর বিরুদ্ধে মামলা করে এবং ফাঁসি দেয় তখন তার বয়স ছিল 23 বছর। মামলা চলাকালীন ভগৎ সিং বলেন যে, তিনি বোমা ও পিস্তলের ধর্মকে গৌরবান্বিত করতে চান না বরং সমাজে বিপ্লব চান।

বিপ্লব মানবজাতির অখণ্ড অধিকার। স্বাধীনতা সকলের অহস্তান্তরযোগ্য জন্মগত অধিকার। শ্রমিকরাই হল সমাজের মূল পালনকর্তা। বিপ্লবের এই পূজাবেদীতে আমরা আমাদের যৌবন অর্ঘ্য হিসেবে নিয়ে এসেছি। কারণ এই মহান আদর্শের জন্য যে কোন বলিদানই কম। আমরা পরিতৃপ্ত এবং বিপ্লবের আবির্ভাবের অপেক্ষা করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

এখন দেখা যাক ব্যবসায়ীরা কী করেছিল? তারা আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গো কীভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বিপুল মুনাফা অর্জন করেছিল এবং বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল (অধ্যায় 5এ দেখো), তারা নিজেদের ব্যবসার আরও প্রসার চেয়েছিল, তাই যে সকল ঔপনিবেশিক নীতির কারণে ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠে। তারা বিদেশী পণ্যের আমদানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং রূপি-স্টার্লিং বৈদেশিক বিনিময় অনুপাত চায় যা আমদানিকে নিরুৎসাহ করবে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগোষ্ঠী নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য 1920 খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড কমার্শিয়াল কংগ্রেস গঠন করে এবং 1927 খ্রিস্টাব্দে ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FICCI) গঠন করে। পুরুষোত্তম দাস, ঠাকুর দাস এবং জি ডি বিড়লা এর নেতৃত্বে ব্যবসায়ীরা ভারতীয় অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে তা সমর্থন করেন। তারা আইন অমান্য আন্দোলনে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করে এবং বিদেশী আমদানিকৃত দ্রব্য কিনতে বা বিক্রি করতে অস্বীকার করে। বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির কাছে স্বরাজের অর্থ ছিল ব্যবসার উপর ঔপনিবেশিক বাধানিষেধ থাকবে না এবং কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই শিল্পবাণিজ্যের বিকাশ ঘটতে পারবে। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে উৎসাহে ভাঙ্গান ধরে। জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবসায়ী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়, সেইসাথে কংগ্রেসের তরুণ সদস্যদের মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রসার তাদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল।

নাগপুর ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা আইন অমান্য আন্দোলনে তেমন অংশগ্রহণ করেনি। কংগ্রেসের সঙ্গো শিল্পপতিদের ঘনিষ্ঠতা তারা মেনে নিতে পারেনি। ফলে এই আন্দোলন থেকে তারা দূরে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু শ্রমিক এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। তারা গান্ধিজির কিছু আদর্শ গ্রহণ করে এবং বিদেশী পণ্য বয়কট করে। এছাড়াও নিম্ন মজুরি ও অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশের বিরুদ্ধেও তারা আন্দোলন করে। 1930 খ্রিঃ রেলওয়ে শ্রমিক ও 1932 খ্রিঃ বন্দর শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। 1930 খ্রিঃ ছোট নাগপুরে টিন খনির হাজার খানেক শ্রমিক গান্ধি টুপি পরে এবং বয়কট এর প্রচার ও প্রতিবাদ সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের দাবিকে আন্দোলনের সঙ্গো যুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিল। কংগ্রেসের মতে, এর ফলে শিল্পপতিরা এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে।

আইন অমান্য আন্দোলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যাপকহারে নারীদের যোগদান। গান্ধিজির লবণ সত্যাগ্রহের সময় হাজার হাজার নারী তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন, লবণ উৎপাদন করেন এবং বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করেন।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

1918-19

দুর্দশাগ্রস্ত উত্তপ্রদেশের কৃষকরা বাবা রামচন্দ্রের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়।

এপ্রিল, 1919

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধিজির হরতাল, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

জানুয়ারি, 1921

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত।

ফেব্রুয়ারি, 1922

চৌরিচৌরা ঘটনা, গান্ধিজি কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার।

মে, 1928

আল্লুরী সীতারাম রাজু গ্রেফতার, দুই বছরের সশস্ত্র উপজাতি সংগ্রামের সমাপ্তি।

ডিসেম্বর, 1929

লাহোর অধিবেশন, কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বরাজের দাবি।

1930

আম্বেদকর কর্তৃক নিম্নবর্গ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা।

মার্চ, 1930

লবণ আইন ভঙ্গা দ্বারা গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত।

মার্চ, 1931

গান্ধিজি কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার।

ডিসেম্বর, 1931

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক।

1932

পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত।

চিত্র 9
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শোভাযাত্রায় নারীদের অংশগ্রহণ
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলাকালে অনেক মহিলারা জীবনে প্রথমবার ঘর থেকে বেড়িয়ে প্রকাশ্য এলাকায় সমবেত হয়। মিছিলে কোলে শিশু নিয়ে অনেক মা ও বৃদ্ধদের দেখা যাচ্ছে।

এদের মধ্যে অনেকের কারাবাসও হয়। তবে শহরের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এই মহিলারা ছিল উচ্চবংশজাত পরিবার থেকে আগত, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলেও ধনী কৃষক পরিবারের নারীরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। গান্ধিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা জাতির সেবাকে নারীর পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। কিন্তু এই ভূমিকা তাদের সামাজিক মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেনি। গান্ধিজি বিশ্বাস করতেন নারীর কর্তব্য হল গৃহকর্ম করা এবং ভালো স্ত্রী ও ভালো মা হওয়া, তাই দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস তাদের সংগঠনে কোন মহিলাকে কর্তৃত্বপূর্ণ পদে বসাতে অনিচ্ছুক ছিল। এখানে শুধু তাদের প্রতীকী উপস্থিতি ছিল।

3.3 আইন অমান্য আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

স্বরাজের অস্পষ্ট ধারণা সকল সামাজিক গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করতে পারেনি। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল অস্পৃশ্য বা দলিতরা। যারা 1930 খ্রিঃ পর নিজেরাই নিজেদের দলিত বা অত্যাচারিত বলতে শুরু করে। বহুদিন ধরেই কংগ্রেস দলিতদের স্বার্থকে উপেক্ষা করেছিল এর কারণ ছিল রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বা সনাতনী হিন্দুদের ভয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী 100 বছরেও স্বরাজ আসবে না, যদি না অস্পৃশ্যতাকে বিলোপ করা যায়। অস্পৃশ্যদের তিনি ‘হরিজন’ নাম দেন যার অর্থ ছিল ভগবানের সন্তান।

আলোচনা কর

আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠী কেন অংশগ্রহণ করে ?

তিনি দলিতদের মন্দিরে প্রবেশ, সর্বসাধারণের জন্য কূপ ও মন্দির নির্মাণ, রাস্তা ব্যবহার ও স্কুলে প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহ করেন। তিনি নিজে ভাঙ্গিদের (ঝাড়ুদার) কাজকে মর্যাদা দিতে শৌচালয় পরিষ্কার করেন এবং উচ্চবর্ণের লোকদের হৃদয় পরিবর্তন করতে আহ্বান জানান, যাতে তারা অস্পৃশ্যতার মতো পাপ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু অনেক দলিত নেতা তাদের সমস্যা সমাধানের অন্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজছিলেন, তারা নিজেদের সংগঠিত করা শুরু করেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ, আইনসভায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন রাজনৈতিক ক্ষমতাই সামাজিক সমস্যার সমাধান করবে। আইন অমান্য আন্দোলনে তাই দলিতরা বিশেষ অংশগ্রহণ করেনি। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র ও নাগপুরে দলিতদের সংগঠন শক্তিশালী হওয়ায় ঐসব অঞ্চলের আন্দোলনে তারা বিশেষ একটা অংশগ্রহণ করেনি।

1930 খ্রিঃ বি. আর. আম্বেদকর দলিতদের সংগঠন 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তিনি দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী দাবি করায় তার সঙ্গে গান্ধিজির বিরোধ সৃষ্টি হয়। বৃটিশ সরকার আম্বেদকরের দাবি মেনে নিলে গান্ধিজি আমরণ অনশন শুরু করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী সমাজে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর্বকে দুর্বল করে দেবে। গান্ধিজির সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত আম্বেদকর মেনে নেন এবং 1932 খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নিম্নবর্ণের (পরবর্তী সময়ে যারা তপশিলি জাতি বলে পরিচিত হয়) জন্য আসন সংরক্ষণ করেছিল, তাদের সাধারণের ভোটে নির্বাচিত করা হয়। তবে দলিত আন্দোলন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্রভাবেই পরিচালিত হয়েছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি কিছু মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন ও উদাসীন ছিল। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের পরবর্তীকালে একটি বড়ো অংশের মুসলিম নিজেদের কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। 1920-এর দশক থেকে কংগ্রেস হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন যেমন হিন্দু মহাসভার সঙ্গে স্পষ্টতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই উগ্রধর্মীয় মিছিল বের করে। ফলে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের জন্ম হয়। বিভিন্ন শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধলে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।

1927 খ্রিঃ কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের প্রচেষ্টার ফলে উভয়ের এক সমঝোতায় আসার কৃত্রিম সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল ভবিষ্যতে আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্নে।

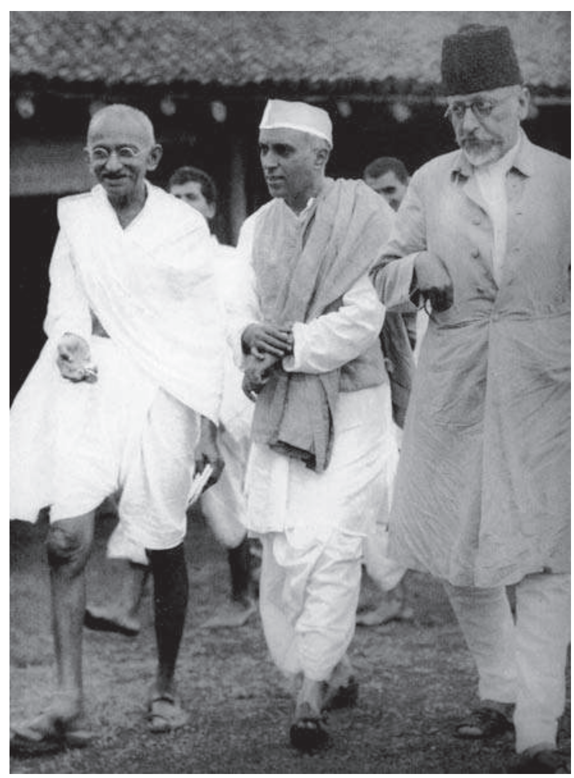

চিত্র 10 – 1935 খ্রিঃ ওয়ার্ধার সেবাগ্রাম আশ্রমে মহাত্মা গান্ধি, জওহর লাল নেহেরু এবং মৌলানা আজাদ।

মুসলিম লিগ নেতা জিন্না পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবি পরিত্যাগ করতে রাজি ছিলেন। এর পরিবর্তে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণের আশ্বাস চেয়েছিলেন এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো মুসলিম প্রধান যুক্ত অঞ্চল (বাংলা ও পাঞ্জাব) থেকে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব চেয়েছিলেন। কিন্তু 1928 খ্রিঃ সর্বদলীয় আলোচনাসভায় হিন্দু মহাসভার এম.আর. জয়াকার যখন এই দাবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন তখন সমস্ত সমঝোতার পথই নষ্ট হয়ে যায়।

তাই যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অবিশ্বাস ও সন্দেহ দানা বাঁধে। কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিমদের একটি বড়ো অংশ জাতীয় সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যায়। বহু মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবিরা ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে। তাদের ভয় ছিল যে, তাদের সংস্কৃতি ও সংখ্যালঘু পরিচয়, সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু ডোমিনিয়নে অবলুপ্ত হতে পারে।

উৎস (ঘ)

1930 খ্রিঃ মুসলিম লিগের সভাপতি মহম্মদ ইকবাল সংখ্যালঘু মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টির উপর জোর দেন। তার এই বক্তব্য পরবর্তী কয়েক বছরে পাকিস্তান দাবির ক্ষেত্রে বুদ্ধিগত যুক্তি প্রদান করেছে বলে মনে করা হয়। তিনি বলেন— আমার এটা ঘোষণা করতে একটুও সংকোচ নেই যে, স্থায়ী সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হিসেবে যদি ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় স্বদেশভূমিতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং রীতিনীতির পূর্ণ ও স্বতন্ত্র বিকাশ এর অধিকার দেওয়া হয়, তবে তারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে কোনো ঝুঁকি (নিজেদের সবকিছু) নিতে প্রস্তুত হবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব পদ্ধতিতে বিকাশের অধিকার রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না। যে সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তারা হীন ও অধম। আমি অন্য সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, ধর্ম, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অগাধ সম্মান পোষণ করি। কোরাণের উপদেশ অনুসারে প্রয়োজনে তাদের উপাসনাস্থল রক্ষা করাও আমার কর্তব্য। বস্তুত আমি সেই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে ভালোবাসি, যা আমার জীবন ও আচরণের উৎস এবং যা আমাকে তার ধর্ম, সাহিত্য, বিচার এবং সংস্কৃতি দিয়ে তৈরি করেছে। এইভাবে আমার অতীতের প্রানবন্ত সক্রিয় উপাদানের ভিত্তিতে আমার বর্তমান চেতনা গড়ে উঠেছে।

এই অবস্থায় উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গির সাম্প্রদায়িকতা ভারতের মতো একটি দেশে ঐকতান গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। ভারতীয় সমাজের এককগুলি আঞ্চলিক নয়। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির স্বীকৃতি ছাড়া ভারতে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের নীতি প্রয়োগ করা যাবে না, তাই ভারতে একটি মুসলিম ভারত সৃষ্টির জন্য মুসলমানদের দাবি পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য। একজন হিন্দু মনে করে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিপরীত। কারণ তিনি 'জাতীয়' শব্দটি বলতে বোঝেন এক ধরনের অবিচ্ছেদ্য সমন্বয় যার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক সত্ত্বা তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।

যাই হোক এমন কোন বিষয়ের অস্তিত্ব এখানে নেই। ভারত জাতিগত এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের একটি দেশ। এর সঙ্গে যুক্ত করুন মুসলমানদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, তাদের বিশাল ঋণ, বিশেষত পাঞ্জাবে, বর্তমান গঠন অনুসারে অন্য প্রদেশে তাদের অপর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তখনই আপনি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি বজায় রাখার জন্য আমাদের উদ্বেগের অর্থ স্পষ্টভাবে দেখতে শুরু করবেন।

আলোচনা কর

উৎস (ঘ) মনোযোগ সহকারে পড়। তুমি কি ইকবালের সাম্প্রদায়িকতার ধারণার সাথে একমত? তুমি কি অন্যভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারো?

4 সমষ্টিগত একাত্মতার অনুভূতি

চিত্র 11 — বাল গঙ্গাধর তিলক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ছবি। লক্ষ করো তিলক একতার প্রতিক দ্বারা কীভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। চিত্রের চতুর্দিকে বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র স্থান (মন্দির, চার্চ, মসজিদ) চিত্রায়িত রয়েছে।

জাতীয়তাবাদের ভাবনা প্রসারিত হয় যখন মানুষ বিশ্বাস করে যে, তারা একই জাতির অংশ এবং যখন তারা একসূত্রে বাঁধা পড়ার কোন ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করে। কিন্তু কীভাবে একটি জাতির ধারণা মানুষের মনের মধ্যে যথার্থ রূপ নেয়? কীভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় অঞ্চল বা ভাষা গোষ্ঠী একাত্মতার অনুভূতির বিকাশ ঘটায়?

এই একাত্মতার অনুভূতি আংশিকভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসে, এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ মানুষের মন মানসিকতায় স্থান করে নেয়। ইতিহাস, গল্প উপন্যাস, লোককথা এবং সঙ্গীত, চিত্র ও প্রতীক এই সব কিছুই জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে সহায়তা করে।

তোমরা জানো কোন জাতীয় পরিচয় (অধ্যায় 1 দেখো) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন

একটি চিত্র বা মূর্তি রূপে প্রতীক হয়। এটি এমন একটি প্রতিচ্ছবি তৈরিতে সহায়তা করে যেখানে মানুষ তার জাতিকে সনাক্ত করতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের বিকাশের সাথে সাথে ভারতের পরিচয় ও ভারত মাতার ছবির সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম ভারতমাতার প্রতিমূর্তি তৈরি করেন। 1870 এর দশকে তিনি মাতৃভূমির স্তুতি হিসেবে বন্দেমাতরম গান রচনা করেন। পরে এটি তার উপন্যাস আনন্দমঠে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই গান ব্যাপকভাবে গাওয়া হয়। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতার বিখ্যাত ছবি তৈরি করেন (ছবি-12 তে দেখো)। এই ছবিতে ভারতমাতাকে এক সন্ন্যাসিনীরূপে দেখানো হয়েছে। তার রূপ শান্ত, স্থির, ঐশ্বরিক এবং আধ্যাত্মিক। পরবর্তী বছরগুলিতে শিল্পীরা যখন ভারতমাতার ছবি বিভিন্নভাবে চিত্রিত করতে থাকে তখন ভারতমাতার ছবি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে (চিত্র 14 দেখো)। এই মাতৃরূপের প্রতি শ্রদ্ধা জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থার প্রতীক মানা হয়।

ভারতীয় লোককথাকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্দোলনের দ্বারাও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাতীয়তাবাদীরা চারণ কবিদের গাওয়া লোকগীতিগুলি লিপিবন্ধ করেন এবং তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোক কাহিনি ও লোকগীতিগুলি সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এই কাহিনিগুলি ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির সঠিক চিত্র প্রদান করতে পারে যা বাইরের শক্তির দ্বারা দূষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাতীয় পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য এবং অতীতের গর্বের অনুভূতি পুনরুদ্ধারের জন্য এই লোক ঐতিহ্যগুলি সংরক্ষণ করা অপরিহার্য ছিল। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই লোকগাথা, শিশুদের ছড়া, পৌরাণিক কথা ইত্যাদি সংগ্রহ করা শুরু করেন এবং লোক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

চিত্র 12 — ভারতমাতা, 1905 খ্রিঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা চিত্রিত।
লক্ষ করে দেখো এখানে ভারত মায়ের চিত্রটিতে ভারতমাতা শিক্ষা, খাদ্য এবং পোশাক প্রদান করছে। এক হাতে ধরা মালা তার তপস্বীরূপ বর্ণনা করছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার আগের চিত্রকার রবি বর্মার মত এমন চিত্রশৈলি উন্নত করার চেষ্টা করেন যা সঠিক অর্থে ভারতীয় বলা যায়।

চিত্র 13 — জওহরলাল নেহেরুর একটি জনপ্রিয় ছবি।
এই ছবিতে নেহেরু ভারতমাতার প্রতিচ্ছবি এবং ভারতের মানচিত্রকে তার হৃদয়ের কাছে রেখেছেন। অনেক ছবিতে জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতমাতার চরণে নিজেদের শির নৈবেদ্যরূপে প্রদান করছেন— এই চিত্রও দেখানো হয়েছে। মায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার ধারণাটি মানুষের কল্পনায় খুব জনপ্রিয় ছিল।

মাদ্রাজে নাতাশা শাস্ত্রী *'The Folklore of Southern India'* (দক্ষিণ ভারতের লোককথা) নামে তামিল লোককথার এক বিশাল সংকলন চার খন্ডে প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, লোককথা হল জাতীয় সাহিত্য, এটি মানুষের বাস্তব চিন্তাভাবনা ও বৈশিষ্ট্যের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য অভিব্যক্তি।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিকাশের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদী নেতারা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য এই ধরনের মূর্তি এবং প্রতীক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় একটি ত্রিবর্ণ পতাকা (লাল, সবুজ এবং হলুদ) তৈরি করা হয়। এতে ছিল ব্রিটিশ ভারতের আটটি প্রদেশের প্রতিনিধিত্বকারী আটটি পদ্মফুল এবং হিন্দু ও মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি অর্ধচন্দ্র। 1921 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মহাত্মা গান্ধি স্বরাজের পতাকা তৈরি করেন। এটিও ত্রিবর্ণ (সাদা, সবুজ এবং লাল) ছিল। গান্ধিজির প্রতীক চরকা, যা স্বাবলম্বনের আদর্শ ছিল তার অবস্থান ছিল মাঝখানে। মিছিলে এই পতাকা লাগানো ঝাণ্ডা নিয়ে চলা, শাসককে অমান্য করার সংকেত ছিল।

চিত্র 14 — ভারতমাতা।
ভারতমাতার এই ছবি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ছবিতে ভারত মাতার হাতে ত্রিশূল এবং তিনি সিংহ ও হাতির মাঝখানে দাঁড়ানো— উভয়ই শক্তি ও প্রভুত্বের প্রতীক।

জাতীয়তাবাদের অনুভূতি সৃষ্টি করার অপর একটি উপায় ছিল ইতিহাসের পুনর্চর্চা করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে অনেক ভারতীয়দের মনে হচ্ছিল যে দেশের প্রতি গর্ববোধের ধারণা জাগ্রত করার জন্য ভারতীয় ইতিহাসকে ভিন্নভাবে পরিবেশন করতে হবে। ইংরেজদের নজরে ভারতীয়রা অনগ্রসর ও আদিম মানুষ, যারা নিজেদের শাসন করতে অসমর্থ, এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয়রা ভারতের মহান কীর্তি উদ্‌ঘাটন করার জন্য অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে। তারা ভারতের সেই গৌরবময় প্রাচীন যুগ সম্পর্কে লিখতে শুরু করে যখন ভারতে শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ধর্ম, সংস্কৃতি, আইন, দর্শন হস্তশিল্প ও বাণিজ্য উন্নতি লাভ করেছিল। তাদের মতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার সাথেই এই গৌরবময় ইতিহাসের পতন শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস পাঠকদের মনে অতীত ভারতের মহান ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ জাগ্রত করার এবং ব্রিটিশ শাসনের দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আন্দোলনের পথে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

কাজ

12 এবং 14 নং চিত্র দেখো। তুমি কি মনে করো এই ছবি সব জাতি ও সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করবে?

তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার এই প্রচেষ্টাগুলি সমস্যাহীন ছিল না। যে অতীত এর গৌরবের কথা বলা হচ্ছিল সেই অতীত ছিল হিন্দুদের, যেসব ছবির সাহায্য নেওয়া হচ্ছিল তা হিন্দুত্বের প্রতীক ছিল। এই কারণে অন্য সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের অবহেলিত মনে করছিল।

উৎস (ঙ)

পূর্ববর্তী সময়ে ভারতে আসা বিদেশী ভ্রমণকারীরা আর্যবংশীয় লোকদের সাহস, সততা ও বিনম্রতায় অবাক হতেন। এখন তারা মূলত সেইসব গুণাবলির অনুপস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করে। সেই দিনগুলিতে হিন্দুরা বিজয়ের জন্য বের হত এবং টার্টার, চিন এবং অন্যান্য দেশে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিত, এখন ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের কিছু সিপাহী ভারতভূমিকে কব্জা করে আছে।

1858 খ্রিঃ তারিনীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ১ম খন্ড থেকে নেওয়া।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ বিভিন্ন ভারতীয় গোষ্ঠী ও শ্রেণিকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে একত্রিত করে। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য সংগঠিত আন্দোলনে জনগণের অভিযোগ তুলে ধরার চেষ্টা করে। তারা আন্দোলনের মাধ্যমে সমগ্র দেশকে একতার সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় পৃথক পৃথক প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়। তাদের অভিযোগুলি যেমন বিভিন্ন রকম ছিল, তেমনি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা-এর অর্থও বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রকম ছিল। কংগ্রেস ক্রমাগত এই পার্থক্য সমাধান করার চেষ্টা করে এবং এক গোষ্ঠীর চাহিদা যেন অন্যদের বিচ্ছিন্ন করে না দেয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে এই কারণেই আন্দোলন চলাকালীন প্রায়ই একতা বিনষ্ট হত। কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও জাতীয়তাবাদী ঐক্য তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর পরেই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পর্যায়ক্রমে বৈষম্য ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, যে রাষ্ট্রের উদয় হচ্ছিল তা ছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য হাজারো কণ্ঠের আওয়াজ।

চিত্র 14b
ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বোম্বাইতে মহিলাদের মিছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতে ব্যাপক অসন্তোষের জন্ম দেয়। এর ফলে গান্ধিজি ইংরেজদের ভারত থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে একটি আন্দোলন শুরু করেন। 1942 খ্রিঃ 14 জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ওয়ার্ধা অধিবেশনে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে অবিলম্বে ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি পাশ করে। 1942 খ্রিঃ 8ই আগস্ট বোম্বাইয়ে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস সমিতি এই প্রস্তাব সমর্থন করে, যেখানে সারা দেশে ব্যাপক অহিংসা গণআন্দোলনের আহ্বান করা হয়। এই প্রসঙ্গে গান্ধিজি তাঁর বক্তৃতায় বিখ্যাত ‘ডু অর ডাই’ কথাটি ঘোষণা করেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের এই আহ্বান দেশের বেশির ভাগ অংশে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকজন হরতাল পালন করে এবং জাতীয় সংগীত ও স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। বাস্তবে এই আন্দোলন এক সর্বাত্মক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল, যেখানে ছাত্র, মজদুর, কৃষক ও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনে নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়া এবং অনেক নারীনেত্রী যেমন বাংলার মাতঙ্গিনী হাজরা, আসামে কনকলতা বড়ুয়া এবং উড়িষ্যাতে রমা দেবী প্রমুখরাও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশরা কঠোর দমননীতি গ্রহণ করলেও আন্দোলনকে দমন করতে তাদের এক বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল।

সংক্ষেপে লেখো

1. ব্যাখ্যা করো :
    a) উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গো কীভাবে যুক্ত হয় ?
    b) কীভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতে জাতীয় আন্দোলনের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল ?
    c) ভারতীয়রা কেন রাউলাট আইনের বিরোধিতা করে ?
    d) গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন কেন ?
2. সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝ ?
3. নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবেদন তৈরি কর :
    a) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড
    b) সাইমন কমিশন
4. এই অধ্যায়ে দেওয়া ভারতমাতার ছবি এবং প্রথম অধ্যায়-এ দেওয়া জার্মানিয়ার ছবির তুলনা করো।

আলোচনা করো

1. 1921 খ্রিঃ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী সামাজিক গোষ্ঠীগুলির তালিকা প্রস্তুত কর। এর মধ্যে তিনটি গোষ্ঠীকে বেছে নিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রাম সম্পর্কে লেখো— কেন তারা আন্দোলনে যোগ দেয় ?
2. লবণ সত্যাগ্রহ কেন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি কার্যকর প্রতীক ছিল তা আলোচনা করো ?
3. কল্পনা করো যে তুমি আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন মহিলা। এই অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে কীভাবে অর্থবহ হত— তা আলোচনা করো।
4. পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল কেন ?

প্রকল্প

কেনিয়ার উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের সন্ধান কর। কেনিয়ার স্বাধীন হওয়ার পদ্ধতিগুলির সাথে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের তুলনা করো।

ভাগ II

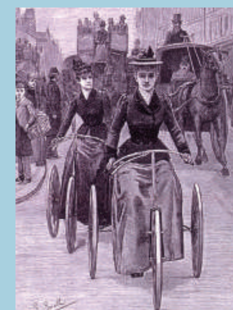

জীবিকা, অর্থনীতি এবং সমাজ

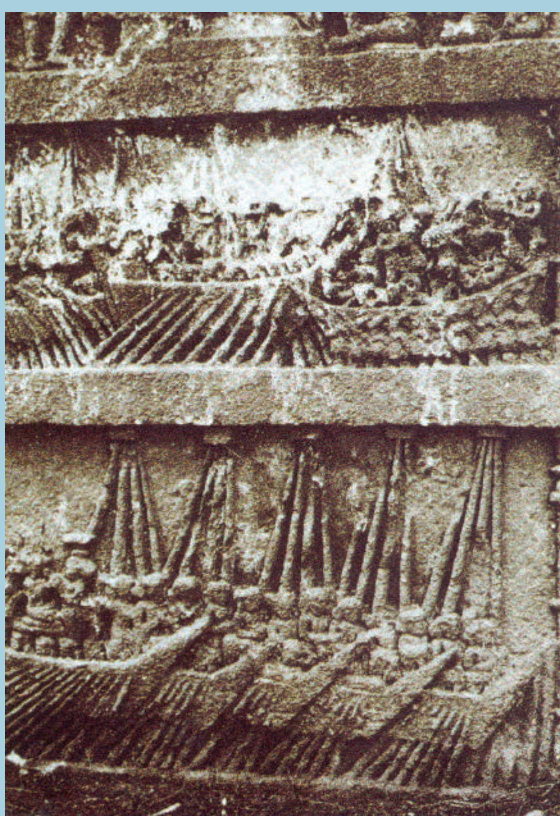

ভূমণ্ডলীয় বিশ্বের সৃষ্টি
(The Making of a Global World)

1 প্রাক্ আধুনিক বিশ্ব

যখন আমরা বিশ্বায়নের কথা বলি তখন সাধারণত এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝি যা বিগত প্রায় 50 বছর আগে থেকেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু তোমরা এই অধ্যায়ে দেখবে যে, ভূমণ্ডলীয় বিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যের, দেশান্তরে গমনের, কাজের খোঁজে জনগণের রাজধানী স্থানান্তরের এবং আরও অনেক কিছুর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই বিশ্ব যেখানে আমরা বসবাস করি এটা বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের জীবনে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সম্পর্কের নাটকীয় এবং দৃশ্যমান প্রতীকগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করলে আমাদের এই পর্যায়গুলোকে জানতে হবে।

সমগ্র ইতিহাস জুড়ে মানব সমাজ নিজেদের মধ্যে আরও সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই যাত্রীগণ, ব্যবসায়ীগণ, তীর্থযাত্রীগণ এবং পূজারীরা দূর দূরান্ত অঞ্চলে জ্ঞান, সুযোগ এবং আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ অথবা নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভ্রমণ করেন। তারা তাদের সঙ্গে মালপত্র, টাকাপয়সা, মূল্যবোধ, দক্ষতা, বিচারধারা, আবিষ্কার, এমনকী জীবাণু ও বিভিন্ন ধরনের রোগ বয়ে নিতে যেত। 3000 খ্রিস্টপূর্বে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সঙ্গে বর্তমান পশ্চিম এশিয়ার একটি সক্রিয় উপকূলীয় বাণিজ্য চলত। এক হাজার সালের থেকেও বেশি সময় ধরে মালদ্বীপের কড়িগুলো (হিন্দি কড়ি অথবা ঝিনুক, মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত) চিন এবং পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দী থেকেই এই রোগ বহনকারী জীবাণুগুলোর প্রাদুর্ভাব দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এই প্রাদুর্ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

*চিত্র 1 – **গোয়া যাদুঘরে দশম শতাব্দীর স্মৃতিস্তম্ভ পাথরের উপর একটি জাহাজের চিত্র।***
নবম শতক থেকে পশ্চিম উপকূলে পাওয়া স্মৃতি স্তম্ভ পাথরের উপর জাহাজের ছবিগুলো সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

1.1 রেশম পথে যুক্ত বিশ্ব

বিশ্বের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে প্রাক্ আধুনিক বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের জ্বলন্ত উদাহরণ হল রেশম পথগুলো। 'রেশমপথ' নামটি থেকেই এই পথ ধরে পশ্চিমে প্রেরণ করা চৈনিক রেশম মালের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি রেশম পথ চিহ্নিত করেছেন। স্থল এবং সমুদ্রের উপর দিয়ে এই পথ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে যুক্ত করে এবং এশিয়াকে ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত করে। খ্রিস্টিয় যুগের আগে থেকেই এই পথগুলোর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় এবং প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এগুলো সমৃদ্ধ ছিল। এই একই পথে চৈনিক মৃৎশিল্পও যাতায়াত করত এবং একই পথে ভারত এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বস্ত্র এবং মশলা রপ্তানি হত। পরিবর্তে বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু — সোনা এবং রূপা ইউরোপ থেকে এশিয়ায় আসত।

চিত্র 2 – অষ্টম শতাব্দীতে চিনের একটি গুহাচিত্রে অঙ্কিত রেশমপথে বাণিজ্য, গুহা 217, মোগাও, গ্রোটোস, গান্সু চীন।

বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সবসময়ই পাশাপাশি চলত। প্রথমদিকে খ্রিস্টান মিশনারিগণ নিশ্চয়ই এই পথ দিয়ে এশিয়ায় যেত। কয়েক শতাব্দী পর মুসলিম ধর্মযাজকগণ একই পথ দিয়ে যাতায়াত করত। এরও অনেক আগে বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ব ভারত থেকেই রেশম পথের বিভিন্ন শাখা ধরে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

1.2 খাদ্য যাত্রা : স্প্যাঘেট (ময়দা থেকে তৈরি এক ধরনের খাবার) এবং আলু

খাদ্য দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এর অনেক উদাহরণ দেখা যায় - বণিকগণ এবং পর্যটকগণ যেসব দেশে যেত সেখানে তারা নতুন নতুন শস্য বপন করত এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে পাওয়া 'তৈরি' খাদ্যের উৎস হয়তো একই। স্প্যাঘেটি এবং নুডল্স্-এর উদাহরণ দেওয়া যায়। মনে করা হয় যে, নুডল্স্ চিন থেকে পশ্চিমে পৌঁছার পর স্প্যাঘেটিতে পরিণত হয়। সম্ভবত আরব বণিকগণ ইটালিতে অবস্থিত একটি দ্বীপ সিসিলিতে পঞ্চম শতাব্দীতে পাস্তা নিয়ে গিয়েছিল। এই একই ধরনের খাদ্য ভারত এবং জাপানেও প্রচলিত সুতরাং এগুলির উৎস সম্পর্কে সত্য কথা কোনদিনই জানা যাবে না। এরকম অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, আধুনিক বিশ্ব গঠনের পূর্বে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র 3 – পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিস এবং প্রাচ্য থেকে আসা বণিকগণ দ্রব্য আদান-প্রদান করছে। মার্কোপোলোর বুক অফ মার্বেলস থেকে নেওয়া চিত্র।

আলু, সয়া, বাদাম, ভুট্টা, টমেটো, মরিচ, মিষ্টি আলু এবং এরকম আরও অনেক সাধারণ খাদ্য সম্পর্কে প্রায় পাঁচশ বছর আগেও আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন না। এই খাদ্যগুলো শুধুমাত্র ইউরোপ ও এশিয়ায় তখনই পৌঁছেছিল যখন ক্রিস্টফার কলম্বাস ঘটনাচক্রে অজ্ঞাত মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন যা পরবর্তীকালে আমেরিকা নামে

পরিচিত। এখানে আমরা উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবিয় দ্বীপসমূহকে একত্রে বর্ণনা করতে 'আমেরিকা' শব্দটা ব্যবহার করব। আসলে আমাদের অনেক সাধারণ খাদ্য আমেরিকার মূল অধিবাসী – আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে এসেছিল।

কখনো কখনো নতুন শস্য জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারত। সাধারণ আলুর ব্যবহার শুরু করার পর ইউরোপের গরীবরা অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার খেতে শুরু করে এবং তাদের আয়ু বাড়তে থাকে। আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে গরীব কৃষকগণ আলুর উপর এতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে, যখন 1840 এর দশকের মাঝামাঝি রোগ আলু শস্যকে ধ্বংস করে দেয় তখন লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

চিত্র 4 – 1849-এ ইলাস্ট্র্যাটেড লন্ডন নিউজ-এ চিত্রিত আয়ারল্যান্ডের আলু আকাল।
ফসল তুলে নেবার পর অবশিষ্ট আলু খুঁজে পাবার আশায় ক্ষুধার্ত শিশুরা মাঠে মাটি খুড়ছে। আয়ারল্যান্ডের ভয়ানক আলু আকালের (1845 থেকে 1849) সময় আয়ারল্যান্ডের প্রায় এক লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায় এবং এর দ্বিগুণ লোক কাজের সন্ধানে প্রবাসে গমন করে।

1.3 জয়, রোগ এবং বাণিজ্য

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয় নাবিকগণ এশিয়া যাবার সামুদ্রিক পথ খুঁজে পায় এবং পশ্চিমী সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় পৌঁছায় তখন প্রাক্-আধুনিক বিশ্ব সংকুচিত হয়ে পড়ে। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারত মহাসাগরের জলে ব্যস্ত বাণিজ্য, বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রী, জনগণ, জ্ঞান রীতি প্রভৃতি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করত। ভারতীয় উপমহাদেশ এই প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং তাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। ইউরোপীয়দের প্রবেশ এই প্রবাহগুলোর বিস্তারে সাহায্য করে কিংবা এই প্রবাহগুলোর দিশা ইউরোপের দিকে মোড় নেয়।

আবিষ্কারের পূর্বে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে আমেরিকার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে এর বিস্তীর্ণ ভূমি এবং প্রচুর শস্য ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বাণিজ্যে রূপান্তর হতে শুরু করে। এর ফলে সর্বত্রই মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে।

বর্তমানে পেরু এবং মেক্সিকোতে অবস্থিত খনি থেকে উত্তোলিত বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু, বিশেষত রূপা ও ইওরোপের সম্পদকে বাড়িতে তোলে এবং এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে মূলধন যোগান দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আমেরিকার কাল্পনিক সম্পদ সম্পর্কে অনেক পৌরাণিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। অনেক লোক এল ডর‍্যাডো নামক সোনার কাল্পনিক শহরের খোঁজে অভিযান শুরু করে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজ এবং স্প্যানিয়রা আমেরিকা জয় করে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলতে শুরু করে। ইউরোপীয়দের বিজয় কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সৈন্যশক্তির ফল ছিল না। বস্তুতপক্ষে স্পেনীয় বিজেতাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র প্রচলিত সেনা অস্ত্রই ছিল না। এটা ছিল গুটি বসন্তের মত জীবাণু যা তারা তাদের নিজেদের সঙ্গে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে আমেরিকার মূল অধিবাসীদের এই সমস্ত রোগের যা ইউরোপ থেকে এসেছিল, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের গড়ে উঠে নি। গুটি বসন্ত সুনির্দিষ্টভাবে মারাত্মক ঘাতক হিসাবে প্রমাণিত হয়। একবার সংক্রমন শুরু হবার পর এটা পুরো মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি যেখানে ইউরোপীয়রা পৌঁছায়নি সেখানেও। এটা পুরো সম্প্রদায়কে মেরে ফেলে বহিরাগতদের বিজয়ের জন্য রাস্তা তৈরি করে।

বক্স 1

'জৈবিক' যুদ্ধ ?

নিউ ইংল্যান্ডে অবস্থিত ম্যাসাচুসেটস বে কলোনির প্রথম গভর্নর জন উইনথর্প 1634-এর মে মাসে লিখেছিলেন যে, গুটি বসন্ত উপনিবেশবাসীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ .... দেশের লোক .... গুটি বসন্তের কারণে প্রায় সব লোকের মৃত্যু হয়। এভাবে ভগবান আমাদের সম্পত্তির উপর মালিকানার অধিকার দিয়েছেন।

আলফ্রেড ক্রসবি, ইকলজিক্যাল ইমপেরিয়লিজম।

বন্দুক ক্রয় অথবা ছিনতাই করা যায় এবং আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু গুটি বসন্তের মতো রোগের ক্ষেত্রে সেটা করা যেত না কারণ বিজেতাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দরিদ্রতা এবং ক্ষুধা ছিল ইউরোপে সাধারণ ব্যাপার। শহরগুলোতে লোকারণ্য ছিল, তাই বিভিন্ন মারন ব্যাধি ছড়িয়ে পরে। ধর্মীয় সংঘর্ষ ছিল সাধারণ ব্যাপার। যারা প্রচলিত বিশ্বাসকে মানত না তারা নিগ্রিহিত হত। হাজার হাজার লোক এই কারণে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় পালিয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে আফ্রিকা থেকে ধৃত ক্রীতদাসদের চাষের কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং তারা ইউরোপীয় বাজারের জন্য কাপড় এবং চিনি উৎপাদন করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকটা সময় জুড়ে চিন এবং ভারত বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। এশিয়ার বাণিজ্যেও তারা অগ্রগণ্য ছিল। তবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে চিন অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গুটিয়ে নেয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চিনের নিম্নমুখী ভূমিকা এবং আমেরিকার উঠতি গুরত্বের ফলে বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্র ধীরে ধীরে পশ্চিমমুখী হয়। ইউরোপ এখন বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

নতুন শব্দ

অননুগামী (Dissenter) – যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস এবং রীতিকে মানে না।

আলোচনা করো :

যখন আমরা বলি যে, 1500 খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব 'সংকুচিত' হয়ে পড়ে, মানে কী বর্ণনা করো।

চিত্র 5 – 1851 সালে ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজে নিউ অর্লিন্সে বিক্রির জন্য অপেক্ষারত ক্রিতদাসরা।

একজন প্রত্যাশিত ক্রেতা নিলামের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ক্রীতদাসদের ভালো করে নিরীক্ষণ করছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ চারজন মহিলার সঙ্গে দুইজন শিশু এবং মাথায় টুপি ও স্যুট পরিহিত সাতজন পুরুষ বিক্রি হবার জন্য অপেক্ষা করছে। ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য ক্রীতদাসরা প্রায়শই ভাল জামাকাপড় পরিধান করত।

2 ঊনবিংশ শতাব্দী (1815-1914)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো জটিল উপায়ে সমাজকে পরিবর্তনে পারস্পরিক ক্রিয়া করে এবং বৈদেশিক সম্পর্কগুলোকে নতুন রূপ প্রদান করে।

অর্থনীতিবিদ্‌রা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিনিময়গুলোর মধ্যে তিন ধরনের আন্দোলন অথবা প্রবাহের উল্লেখ করেন। প্রথমটি হল বাণিজ্যের প্রবাহ যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর (যেমন বস্ত্র অথবা গম) ব্যাপক বাণিজ্যকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টি হল শ্রমের প্রবাহ — কাজের খোঁজে মানুষের দেশান্তর। তৃতীয়টি হল পুঁজির প্রবাহ যেখানে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে স্বল্পকালীন অথবা দীর্ঘকালীন লগ্নি করা হয়।

এই তিনটি প্রবাহই পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং মানুষের জীবনকে আগের তুলনায় এখন গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কখনও কখনও এই পারস্পরিক সম্পর্ক ভেঙে যেত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - দ্রব্যসামগ্রী এবং পুঁজির প্রবাহের তুলনায় শ্রমিকের দেশান্তর প্রায়শই অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ছিল। এখনও যদি আমরা তিনটি প্রবাহকে একসঙ্গে দেখি তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব অর্থনীতিকে অধিকতর ভাল বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

2.1 বিশ্ব অর্থনীতির নতুন রূপ গ্রহণ

বাণিজ্যিক ইউরোপের খাদ্য উৎপাদন এবং উপভোগের পরিবর্তনশীল নমুনা হল এই আলোচনা শুরু করার একটি ভালো দিক। সাধারণত সমস্ত দেশই খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে চায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে খাদ্যে স্বয়ম্ভর মানে হল নিম্নমানের জীবন স্তর এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব। কেন এরকম হয়েছিল?

ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শহরাঞ্চলের সম্প্রসারণ এবং শিল্প বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ উৎপাদনের চাহিদাও বেড়ে যায়, খাদ্যশস্যের দামও বৃদ্ধি পায়। ভূস্বামীদের চাপে সরকার ভুট্টার আমদানিতেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। যে আইনের বলে সরকার এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল এগুলো সাধারণভাবে 'ভুট্টা আইন' নামে পরিচিত। খাদ্যের দাম বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট শিল্পপতি এবং শহরবাসীরা ভুট্টা আইন বন্ধ করতে বাধ্য করে।

ভুট্টা আইন বাতিল হবার পর ব্রিটেনে আমদানি করা খাদ্যদ্রব্য দেশে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য থেকেও সস্তা হয়। ব্রিটিশ কৃষি আমদানিকৃত কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষম ছিল। এর ফলে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পতিত হয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা বেকার হয়ে পড়ে। তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিড় জমায় অথবা অন্যদেশে চলে যায়।

খাদ্যদ্রব্যের দাম কমে যাবার ফলে ব্রিটেনে উপভোগের পরিমাণও বেড়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ব্রিটেনে শিল্পোৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের আয়ও বেড়ে যায় এবং এই কারণে খাদ্যদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ চাহিদা পূরণ করার জন্য বিশ্বের সব জায়গায় পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় জমিগুলোকে পরিষ্কার করা হয় এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো হয়।

কৃষির জন্য জমি পরিষ্কার করাটাই যথেষ্ট ছিল না। কৃষিজ অঞ্চলগুলোকে বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য রেলপথেরও দরকার ছিল। নতুন বন্দর তৈরি করা হয় এবং পুরনো বন্দরের বিস্তৃতি ঘটিয়ে নতুন বন্দরে পরিণত করা হয়। নতুন নতুন জমিগুলোতে চাষ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় লোকদের সেখানে থাকতে হত। অর্থাৎ নতুন নতুন ঘর তৈরি করা হয় এবং জনবসতি গড়ে উঠে। এইসব কাজের জন্য পর্যায়ক্রমে পুঁজি এবং শ্রমের প্রয়োজন ছিল। লণ্ডনের মতো অর্থনৈতিক কেন্দ্র থেকে পুঁজি প্রবাহিত হত। আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের যোগান কম এবং চাহিদা বেশি থাকায় শ্রমিকরা সেখানে যেতে উৎসাহিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় 5 কোটি লোক ইউরোপ থেকে আমেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস করে। অনুমান করা হয় সারা বিশ্বে প্রায় 15 কোটি লোক উন্নততর ভবিষ্যতের আশায় নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মহাসাগর পার হয়ে দূর দূরান্ত দেশে চলে যায়।

চিত্র 6 – আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া দেশান্তরী জাহাজ, এম.ডব্লিও রিডলি, 1869.

চিত্র 7 — 1874-এ মাইকেল ফিটজ গেরাল্ড-এর একটি চিত্র জাহাজে উঠার জন্য অপেক্ষারত আইরিশ দেশান্তরীগণ।

এভাবে 1890 এর মধ্যে বৈশ্বিক কৃষিজ অর্থব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় শ্রম প্রবাহের নমুনা, মূলধন প্রবাহ, বাস্তুবিদ্যা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার জটিল পরিবর্তন। খাদ্যদ্রব্য নিকটবর্তী গ্রাম অথবা শহর থেকে আর আসত না, বরং হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসত। কৃষক খাদ্যদ্রব্য তার নিজস্ব জমিতে উৎপাদন করত না, বরং একজন কৃষিজ শ্রমিক যে সম্ভবত অতি সম্প্রতি পৌঁছেছিল সে এখন বৃহৎ খামারে কাজ করছে। এই খামার সম্ভবত এক পুরুষ আগেও বনভূমি ছিল। যে বিশেষ উদ্দেশ্যে রেলপথ তৈরি হয় সেই পথের মাধ্যমেই খাদ্যদ্রব্য আনা হত এবং এর পাশাপাশি দক্ষিণ ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় দ্বীপসমূহ থেকে জাহাজের মাধ্যমে আনা নেওয়ার কাজে যুক্ত স্বল্প বেতনের শ্রমিকদের সংখ্যা এই দশকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

কার্যাবলি

কল্পনা করো তুমি আয়ারল্যান্ড থেকে আমেরিকায় আসা একজন কৃষিশ্রমিক। কেন তুমি এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিলে এবং কীভাবে তুমি জীবনধারণের জন্য রোজগার করছ — এ বিষয়ের উপর একটি রচনা লেখো।

খুব নগণ্য হলেও এরকম কিছু নাটকীয় পরিবর্তন আমাদের দেশের পশ্চিম পাঞ্জাবে ঘটে গেল। এখানে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার অর্ধ মরুভূমি অনুর্বর জমিকে উর্বর কৃষি জমিতে পরিণত করার জন্য কৃষিখালের নেটওয়ার্ক বিস্তার করে, যাতে রপ্তানির জন্য গম এবং তুলার উৎপাদন করা যায়। নতুন খালগুলোর দ্বারা জলসেচযোগ্য অঞ্চলগুলো খাল কলোনি নামে পরিচিত। সেখানে পাঞ্জাবের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা কৃষকগণ বসবাস করতে শুরু করে।

অবশ্যই খাদ্য একটি উদাহরণমাত্র। তুলার ব্যাপারেও একই ধরনের গল্প বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ বস্ত্র কারখানার প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিশ্ব জুড়ে তুলার চাষ বিস্তৃত হয়। রাবারের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কথা বলা যায়। বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে বিভিন্ন অঞ্চল এত বেশি দক্ষতা অর্জন করেছিল যে, 1820 এবং 1914-এর মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য 25 থেকে 40 গুণ বৃদ্ধি পায়। এই বাণিজ্যে প্রায় 60 শতাংশ প্রাথমিক উৎপাদন' — অর্থাৎ গম এবং তুলার মতো কৃষিজ উৎপাদন এবং কয়লার মতো খনিজ পদার্থ ছিল।

2.2 প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা

এইসবের মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার কী ভূমিকা ছিল? উদাহরণস্বরূপ রেলপথ, বাষ্পচালিত জাহাজ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল যেগুলোকে ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসা পরিবর্তনের কল্পনা আমরা করতে পারি না। কিন্তু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রায়শই বৃহৎ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের ফল ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উপনিবেশিকীকরণ নতুন নতুন লগ্নিকে অনুপ্রাণিত করে এবং পরিবহণে উন্নয়ন সাধিত হয় : দ্রুতগামী রেলপথ, অপেক্ষাকৃত হালকা বগি এবং বড়ো বড়ো জাহাজে খাদ্যদ্রব্য দূরবর্তী ক্ষেত্র থেকে বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তায় এবং দ্রুত পৌঁছাতে সাহায্য করে।

কার্যাবলি

প্রবাহ চার্ট তৈরি করে দেখাও ব্রিটেনের খাদ্য আমদানির সিদ্ধান্ত কীভাবে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় অভিপ্রয়ানকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়।

চিত্র 8 — 1851 সালে ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ-এ প্রকাশিত দ্য স্মিথফিল্ড ক্লাব পশু বাজার।

বিভিন্ন মেলায় চাষিদের দ্বারা বিক্রির জন্য নিয়ে আসা পশুর বাণিজ্য হত। লণ্ডনের স্মিথফিল্ড ছিল সবচেয়ে পুরনো পশুবাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্মিথফিল্ডের সঙ্গে দেশের সমস্ত মাংস সরবরাহকারী কেন্দ্রের যোগাযোগ রক্ষাকারী রেলপথের পাশে মুর্গী এবং মাংসের বাজার স্থাপিত হয়।

মাংসের বাণিজ্য এই সংযুক্তি প্রক্রিয়ার একটি ভালো উদাহরণ প্রদান করে। 1870 এর দশক পর্যন্ত আমেরিকা থেকে ইউরোপে জীবন্ত পশু জাহাজে নিয়ে যাওয়া হত এবং এগুলোকে সেখানে পৌঁছার পরই কাটা হত। কিন্তু জীবন্ত পশুরা জাহাজে অনেক জায়গা দখল করে রাখত। অনেক পশু সমুদ্রযাত্রার কারণে মারা যেত, অসুস্থ হয়ে পড়ত, ওজন কমে যেত অথবা খাবার অযোগ্যে পরিণত হত। এই কারণে মাংসের দাম বেড়ে যায় এবং মাংস খাওয়া বিলাসিতার সামিল হয় এবং ইউরোপীয় গরিবদের নাগালের বাইরে চলে যায়। নতুন প্রযুক্তি বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চমূল্যের কারণে মাংসের চাহিদা এবং উৎপাদন কমে যায়। জাহাজে হিমায়িত করার যন্ত্র যুক্ত হবার পর পচনশীল খাদ্যদ্রব্যকে দূরবর্তী জায়গায় পরিবহণ করা সম্ভব হয়।

এরপর থেকে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া অথবা নিউজিল্যাণ্ডে জাহাজে করে নিয়ে যাবার আগেই খাওয়ার জন্য পশুগুলোকে হত্যা করা হত। এরপর ইউরোপে হিমায়িত মাংস পরিবহণ করা হত। এটা সমুদ্র যাত্রার খরচ কমিয়ে দেয় এবং ফলে ইউরোপে মাংসের দাম কমে যায়। ইউরোপের গরীবলোক এখন বেশি করে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। পূর্বে যারা গতানুগতিক রুটি এবং আলু গ্রহণ করতো এখন তাদের মধ্যে অনেক লোক খাদ্য তালিকায় মাংস (এবং মাখন এবং ডিমও) রাখতে পারে। জীবনস্থিতি ভালো হবার ফলে দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হতে থাকে এবং বহির্দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে জনগণের সমর্থন লাভ করে।

চিত্র 9 — 1878-এ ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ প্রকাশিত - আলেকজান্দ্রায় জাহাজে মাংস বোঝাই করা হচ্ছে।

হিমায়িত করার যন্ত্র জাহাজে যুক্ত হবার পরেই মাংসের রপ্তানি সম্ভব হয়।

2.3 ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে উপনিবেশবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাণিজ্য বেড়ে যায় এবং বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু এটা শুধু বাণিজ্য বিস্তার এবং সমৃদ্ধির যুগ ছিল না। এটা উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্যের বিস্তার এবং বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মানে হল স্বাধীনতা এবং জীবিকা হারানো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপীয়দের বিজয় অনেক কষ্টদায়ক দিক যেমন আর্থিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তন নিয়ে আসে যার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজগুলোকে বিশ্ব অর্থনীতিতে সমাহিত করা হয়। আফ্রিকার মানচিত্রের

দিকে লক্ষ করো (চিত্র 10)। তোমরা দেখবে কিছু দেশের সীমানা সোজা চলে গেছে। যেন এগুলো রুলার ব্যবহার করে আঁকা হয়েছে। আসলে আফ্রিকাতে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজেদের এলাকা চিহ্নিত করে সীমারেখা টেনেছিল। 1885 তে ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যে আফ্রিকার ভাগ বাটোয়ারা সম্পন্ন করার জন্য বার্লিনে মিলিত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তাদের শাসিত বিদেশী এলাকাকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। বেলজিয়াম এবং জার্মানি নতুন ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। 1890 এর দশকের শেষের দিকে আমেরিকা ও ইতিপূর্বে স্পেন দ্বারা অধিকৃত উপনিবেশগুলো দখল করে ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়।

চলো আমরা উপনিবেশবাসীদের অর্থনীতি এবং জীবনজীবিকার উপর উপনিবেশবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের একটি উদাহরণের দিকে তাকাই।

চিত্র 10 — ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে উপনিবেশিক আফ্রিকার মানচিত্র।

বক্স 2

মধ্য আফ্রিকায় স্যার হেনরি মর্টন স্ট্যানলি

স্ট্যানলি একজন সাংবাদিক এবং অনুসন্ধানকারী ছিলেন। নিউইয়র্ক হেরাল্ড তাকে অনেক বছর ধরে আফ্রিকায় বসবাস করা একজন মিশনারি এবং অনুসন্ধানকারী লিভিংস্টোনকে খুঁজে বের করার জন্য পাঠায়। ঐ সময়ে অন্যান্য ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী অনুসন্ধানকারীদের মতো স্ট্যানলিও অস্ত্রশস্ত্রসহ স্থানীয় শিকারি, যোদ্ধা এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করেন এবং স্থানীয় উপজাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিনি আফ্রিকার ভূখণ্ড অনুসন্ধান করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করেন। এই অন্বেষণগুলোই আফ্রিকা জয়ে সহায়তা করেছিল। ভৌগোলিক অন্বেষণগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাধারণ খোঁজ দ্বারা অনুপ্রেরিত ছিল না। এগুলো প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

চিত্র 11 — মধ্য আফ্রিকায় স্যার হেনরি মর্টন স্ট্যানলি এবং তার অনুচরবৃন্দ, ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ, 1871।

2.4 রিনডারপেস্ট, অথবা গবাদি পশুর প্লেগ রোগ

আফ্রিকায় 1890-এর দশকে রিনডারপেস্ট নামক গবাদি পশুর প্লেগ রোগের দ্রুত সম্প্রসারণ জনগণের জীবন জীবিকা এবং স্থানীয় অর্থব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এটা হল ঔপনিবেশিক সমাজসমূহের উপর বিস্তৃত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের প্রভাবের একটি ভাল উদাহরণ। এই উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, বিজয়ের এই যুগেও এমনকি একটি রোগ গবাদি পশুর উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে হাজার হাজার লোকের জীবন এবং ভাগ্যকে বদলে দেয় এবং অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে নতুন রূপ প্রদান করে।

চিত্র 12 – ট্রানসভাল স্বর্ণখনিতে পরিবহণ, দ্য গ্রাফিক, 1887।
উইলজ নদী পার করাই ছিল ট্রানসভালের স্বর্ণখনি পর্যন্ত পৌঁছানোর সবচেয়ে দ্রুততম রাস্তা। উইটওয়াটারস্র্যান্ডে স্বর্ণ আবিষ্কারের পর রোগ এবং মৃত্যুর ভয়, ভ্রমণে জটিলতা সত্ত্বেও ইউরোপীয়রা এই অঞ্চলে ছুটে যায়। 1890-এর দশকের মধ্যে বিশ্বের স্বর্ণ উৎপাদনে দক্ষিণ আফ্রিকার অবদান ছিল 20 শতাংশের উপর।

প্রাচীনকাল থেকেই আফ্রিকার প্রচুর জমি রয়েছে এবং সেই তুলনায় লোকসংখ্যা কম ছিল। শতাব্দীকাল ধরে আফ্রিকাবাসীদের জীবন জমি এবং পশু সম্পত্তির উপর টিকে ছিল এবং মানুষ মজুরির জন্য খুব কমই কাজ করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আফ্রিকায় এমন উপভোগযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী খুব কম ছিল, যা বেতন দিয়ে ক্রয় করা যেত। যদি তুমি একজন আফ্রিকাবাসী হতে এবং তোমার প্রচুর জমি এবং পশু সম্পত্তি থাকত তাহলে তোমারও মনে হবে যে, মজুরীর জন্য কাজ করার প্রয়োজন নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আফ্রিকার প্রচুর জমি এবং খনিজ সম্পদ ইউরোপীয়দের আকর্ষণ করেছিল। ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় শস্য উৎপাদন এবং খনিজদ্রব্য ইউরোপে রপ্তানি করার জন্য বিভিন্ন বাগান ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলন কেন্দ্র গড়ে তোলার আশায় এসেছিল। কিন্তু সেখানে একটি অপ্রত্যাশিত সমস্যা দেখা দেয় — এটা হল বেতনের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক শ্রমিকের ঘাটতি।

শ্রমিকদের নিযুক্তি দেওয়া এবং তাদের ধরে রাখার জন্য মালিকরা অনেক ধরনের পন্থা পদ্ধতি ব্যবহার করত। যারা বাগান এবং বিভিন্ন খনিতে মজুরির জন্য কাজ করত শুধুমাত্র তাদের উপর বিশাল করভার চাপিয়ে দেওয়া হত। উত্তরাধিকার আইন

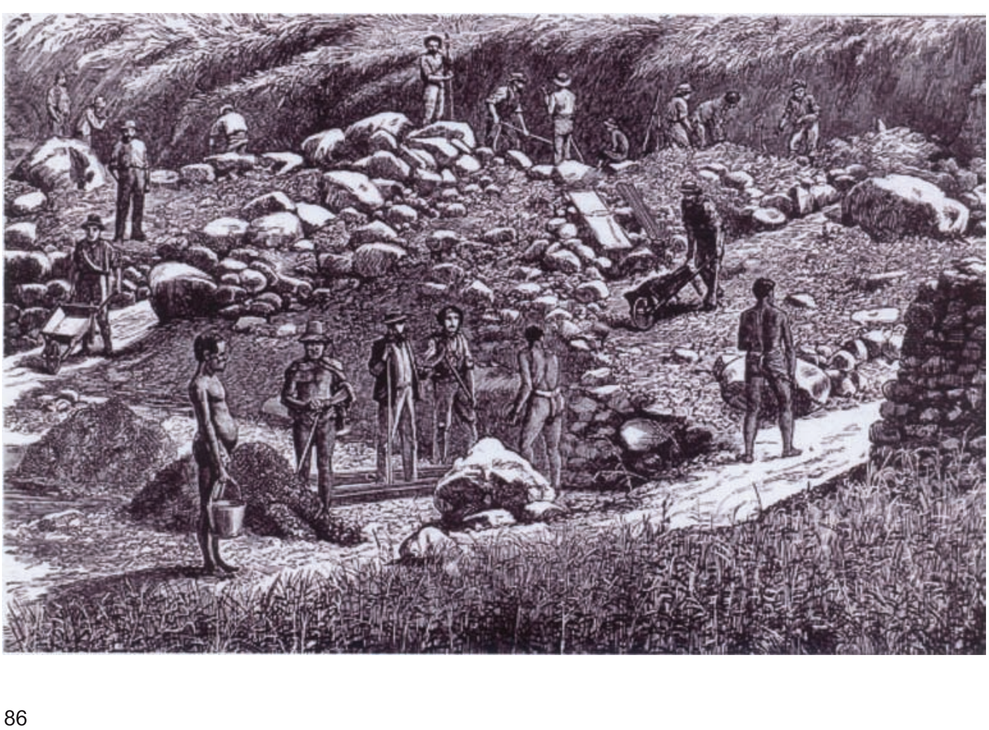

চিত্র. 13 — দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রানসভাল স্বর্ণ খনিতে খননকারীরা কর্মরত, দ্য গ্রাফিক 1875।

সমূহকে বদলে দেওয়া হয়েছিল যাতে কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হয় : কেবলমাত্র পরিবারের একজন সদস্যকে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করতে দেওয়া হত। এরফলে পরিবারের অন্য সদস্যদের শ্রম বাজারে ঠেলে দেওয়া হত। খনি কর্মীদের মাঠে আটকে রাখা হত এবং স্বাধীনভাবে তাদের চলাফেরা করতে দেওয়া হত না।

তারপর আসল রিনডারপেস্ট নামক এক বিধ্বংসী পশুরোগ। রিনডারপেস্ট আফ্রিকায় 1880 এর দশকের শেষে পৌঁছেছিল। পূর্ব আফ্রিকার এরিট্রিয়া অভিযানকারী ইটালীয় সৈনিকদের খাওয়াবার জন্য ব্রিটিশ এশিয়া থেকে আমদানিকৃত সংক্রমিত গবাদি পশু থেকে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। রিনডারপেস্ট আফ্রিকার পূর্ব দিকে প্রবেশ করে 'দাবানলের' মতো পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলে 1892 সালে পৌঁছায়। এই রোগ ক্যাপে (আফ্রিকার সুদূর দক্ষিণ অংশ) পাঁচ বছর পর পৌঁছায়। রিনডারপেস্ট যাত্রাপথে 90 শতাংশ গবাদিপশুকে হত্যা করে।

গবাদি পশুর এই নাশ আফ্রিকার জীবন জীবিকাকে ধ্বংস করে। তাদের নিজেদের শক্তিকে মজবুত করতে এবং আফ্রিকাবাসীকে শ্রমবাজারে যেতে বাধ্য করার জন্য বাগানের মালিকগণ, খনির মালিকগণ এবং ঔপনিবেশিক শাসকগণ অবশিষ্ট গবাদি পশুকে সফলভাবে নিজেরা একচেটিয়া কব্জা করে নেয়। গবাদি পশুর এই দুর্লভ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের ফলে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা আফ্রিকা বিজয় এবং দমন করতে সক্ষম হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে পশ্চিমী বিজয়ের প্রভাব সম্পর্কে এরকম অনেক গল্প বলা যেতে পারে।

2.4 ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের দেশান্তরে গমন

ভারত থেকে দেশান্তরে যাওয়া চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের উদাহরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। এটা দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পাশাপাশি, গভীর দুঃখ কষ্ট, কিছু লোকের আয় বৃদ্ধি এবং কিছু লোকের দরিদ্রতা কিছুক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য অঞ্চলে উৎপীড়নের নয়া রূপ ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের এবং চিনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বাগানে, খনিতে এবং সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের চুক্তির নিরিখে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হত। পাঁচ বছর মালিকের বাগানে কাজ করার পর শ্রমিকদের ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত।

ভারতের অধিকাংশ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা বর্তমান অঞ্চলগুলো যেমন- উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, বিহার, মধ্যভারত এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন শুষ্ক জেলা থেকে আসত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অঞ্চলগুলোতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় — বিভিন্ন কুটির শিল্পের ধ্বংস হয়, জমির ভাড়া বেড়ে যায়, জমিগুলো খনি এবং বাগান তৈরির জন্য পরিষ্কার করা হয়। এই পরিবর্তনগুলোর ফলে গরীবদের জীবন প্রভাবিত হয় : তারা তাদের ভাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, ঋণের জালে গভীরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং কাজের খোঁজে অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হয়।

নতুন শব্দ

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক — সুনির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য মালিকের অধীনে কাজ করা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, যে তার নতুন দেশ বা বাড়ির দেনা পরিশোধ করার জন্য কাজ করে।

ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ দেশান্তরি শ্রমিকদের প্রধান গন্তব্যস্থল ছিল ক্যারিবিয় দ্বীপসমূহ (মুখ্যত ত্রিনিদাদ, গায়ানা, সুরিনাম), মরিশাস এবং ফিজি। তামিল অভিবাসীরা পার্শ্ববর্তী সিলোন এবং মালয়ে যেত। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের আসামে চা বাগান করার জন্যও নিযুক্ত করা হত।

চিত্র 14 – ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ত্রিনিদাদের একটি কোকো বাগানে কাজে রত ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকগণ।

শ্রমিকদের নিযুক্তির কাজ মালিকদের দ্বারা নিযুক্ত এজেন্টরাই করত এবং এর জন্য তারা সামান্য কমিশন পেত। অনেক অভিবাসী তাদের গ্রামের বাড়ির দরিদ্রতা অথবা নিপীড়ন থেকে বাঁচার তাগিদে কাজ করতে রাজি হত। এজেন্টরাও সম্ভাব্য অভিবাসীদের ভুল তথ্য দিয়ে প্রলুব্ধ করত। তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল, যাত্রার ধরন, কাজের প্রকৃতি এবং থাকা এবং কাজের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া হত না। এমনকি অভিবাসীদের এটাও বলা হত না যে, জাহাজে চড়ে তাদের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করতে হবে। কখনো কখনো এজেন্টরা অভিবাসনে অনুৎসাহী অভিবাসীদের বলপূর্বক অপহরণ করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চুক্তিনামাকে ‘নতুন দাস প্রথা’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাগানগুলোতে পৌঁছার পর শ্রমিকরা বুঝতে পারে যে, তারা যেরকম আশা করেছিল এখানে অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। জীবন এবং কাজের অবস্থাগুলো ছিল কঠোর এবং সেখানে তাদের আইনি অধিকার খুব কমই ছিল।

আলোচনা করো :

জাতীয় পরিচয় সৃষ্টিতে ভাষা এবং লোক ঐতিহ্যগুলোর গুরুত্ব আলোচনা কর।

কিন্তু শ্রমিকগণ বেঁচে থাকার জন্য তাদের নিজস্ব বিভিন্ন পথ খুঁজে বের করে। তাদের মধ্যে অনেকেই জঙ্গালে পলায়ন করে, যদিও ধরা পড়ে গেলে তাদের কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হত। অনেকেই তাদের নিজেদের পুরনো এবং নতুন সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অভিব্যক্তির নতুন রূপ গড়ে তুলে। ত্রিনিদাদে বার্ষিক মহরমের মিছিল ‘হোসে’ উৎসবে পরিণত হয়, যেখানে বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের শ্রমিকরা যোগদান করে। একইরকমভাবে বলা হয়, রাস্তাফারিয়ানবাদ-এর বিদ্রোহী ধর্মে (জামাইকার রেগ গায়ক বব মার্লে যাকে বিখ্যাত করেছিল) ভারতীয় অভিবাসীদের সঙ্গে ক্যারিবিয়দের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়। ত্রিনিদাদ এবং গায়ানায় জনপ্রিয় ‘চাটনি মিউজিক’ হল ভারতীয় অভিবাসীদের সেখানে পৌঁছার পর সমসাময়িক আরেকটি সৃজনশীল অভিব্যক্তি। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এইরূপ বিশ্ব সৃষ্টির একটি অঙ্গ ছিল যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত হয় এবং তাদের নিজেদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো লুপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ লাভ করে।

চিত্র 15 – পরিচয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের তোলা ছবি। মালিকদের কাছে সংখ্যাগুলোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, নাম নয়।

তাদের চুক্তি শেষ হওয়ার পরও অধিকাংশ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সেখানে থেকে যায় অথবা কিছু সময়ের জন্য ভারতে থাকার পর নিজেদের নতুন বাড়িতে ফিরে যায়। ফলে এইসব দেশগুলোতে ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রচুর সম্প্রদায় রয়েছে। তোমরা কি নোবেল প্রাইজ বিজয়ী লেখক ভি.এস.নাইপাল সম্পর্কে শুনেছ? তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলোয়ার শিবনারিন চন্দ্রপাল এবং রামনরেশ

সারওয়ানের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে শুনেছ। যদি তুমি আশ্চর্য হও, কেন তাদের নামের উচ্চারণ অনেকটা ভারতীয়দের মতো তাহলে এর উত্তর হল যে, তারা ভারত থেকে চলে যাওয়া চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের বংশধর।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতের নেতাগণ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের অভিবাসনের প্রক্রিয়াকে অবমাননাকর এবং নিষ্ঠুর বলে বিরোধিতা করতে শুরু করে। এই আইনটি 1921-এ লুপ্ত হয়। এর কয়েক দশক পরও ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের প্রায়শই কুলি হিসাবে ভাবা হত এবং ক্যারিবীয় দ্বীপগুলোতে উপদ্রুত সংখ্যালঘু হিসাবে তারা থেকে গিয়েছিল। নাইপালের কিছু প্রারম্ভিক উপন্যাসে তাদের বিয়োগ বেদনা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ ধরা পড়ে।

চিত্র 16 — একজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের একটি চুক্তিপত্র।

2.5 বিদেশে ভারতীয় উদ্যোক্তাগণ

বিশ্ব বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ব্যাপক আকারে চাষাবাদের জন্য ব্যাংক এবং বাজার থেকে ঋণ পাওয়া যেত। কিন্তু ছোটো ছোটো কৃষকদের ক্ষেত্রে কী হত?

এই সময় থেকে জাতীয় মহাজনদের আবির্ভাব ঘটে। তোমরা কী শিকারিপুরি শ্রফদের এবং নাটুকোট্টাই চেট্টিয়ারদের সম্পর্কে শুনেছ? তারা সেই সব মহাজন এবং ব্যবসায়ী দলের মধ্যে ছিল যারা তাদের নিজস্ব তহবিল বা ইউরোপীয় ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে মধ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি কৃষির জন্য টাকার যোগান দেয়। দূরবর্তী স্থানে অর্থ স্থানান্তরিত করার জন্য একটি পরিশীলিত ব্যবস্থা ছিল এবং এমনকি তারা ব্যবসায়িক সংগঠনকে দেশীয়রূপে গড়ে তোলে।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অনুসরণ করে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ আফ্রিকায় প্রবেশ করে। হায়দ্রাবাদী সিন্ধ্রি ব্যবসায়ী ইউরোপীয় উপনিবেশগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার ঝুঁকি নেয়। 1860-এর দশক থেকে তারা বিশ্বব্যাপী ব্যস্ত বন্দরগুলোতে সমৃদ্ধ বড়ো বড়ো বাজার স্থাপন করে। পর্যটকদের কাছে স্থানীয় ও আমদানিকৃত দুর্লভ শিল্পবস্তু বিক্রি করা শুরু করে। সুরক্ষিত ও আরামপ্রদ জাহাজ বিকাশের সাথে সাথে পর্যটকদের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পায়।

সূত্র-ক

একজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের সাক্ষ্য

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রাম নারায়ণ তিওয়ারির সাক্ষ্য, যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ডেমারারাতে দশ বছর অতিবাহিত করেন।

'... যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও আমি আমার বরাদ্দকৃত কাজ সঠিকভাবে করতে পারিনি। কিছুদিনের মধ্যে আমার হাত সম্পূর্ণ থেতলে যায় এবং এক সপ্তাহ কাজে যেতে পারিনি আর এই জন্য আমাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং চৌদ্দদিনের জেল হয়। নতুন অভিবাসীদের বরাদ্দকৃত কাজ অত্যন্ত কঠিন ছিল যা তারা একদিনে সম্পূর্ণ করতে পারত না। যদি কাজ সন্তোষজনক না হতো তবে তাদের মজুরীও কেটে নেওয়া হতো। এইজন্য অনেকেই তাদের সম্পূর্ণ মজুরি পেতো না এবং বিভিন্নভাবে শাস্তি পেতো। আসলে চুক্তিবদ্ধ সময়কালটি খুব কষ্টের মধ্যে শ্রমিকদের অতিবাহিত করতে হতো। উৎস : বাণিজ্য এবং শিল্প দপ্তরের অভিবাসন শাখা - 1916।

Source

2.6 ভারতীয় ব্যবসা, উপনিবেশবাদ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা

ঐতিহাসিকভাবে ভারতে উৎপাদিত সূক্ষ্ম বা মিহি তুলা ইউরোপে রপ্তানি হতো। শিল্প বিপ্লবের পরে ব্রিটেনে তুলো উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পপতিরা তুলো আমদানিকে সীমিত করতে এবং স্থানীয় শিল্পগুলোর সুরক্ষার জন্য সরকারকে চাপ দেয়। ব্রিটেনে বস্ত্র আমদানিতে শুল্ক আরোপ করা হয়। ফলস্বরূপ ভারতীয় সূক্ষ্ম তুলোর অন্তর্প্রবাহ কমতে শুরু করে।

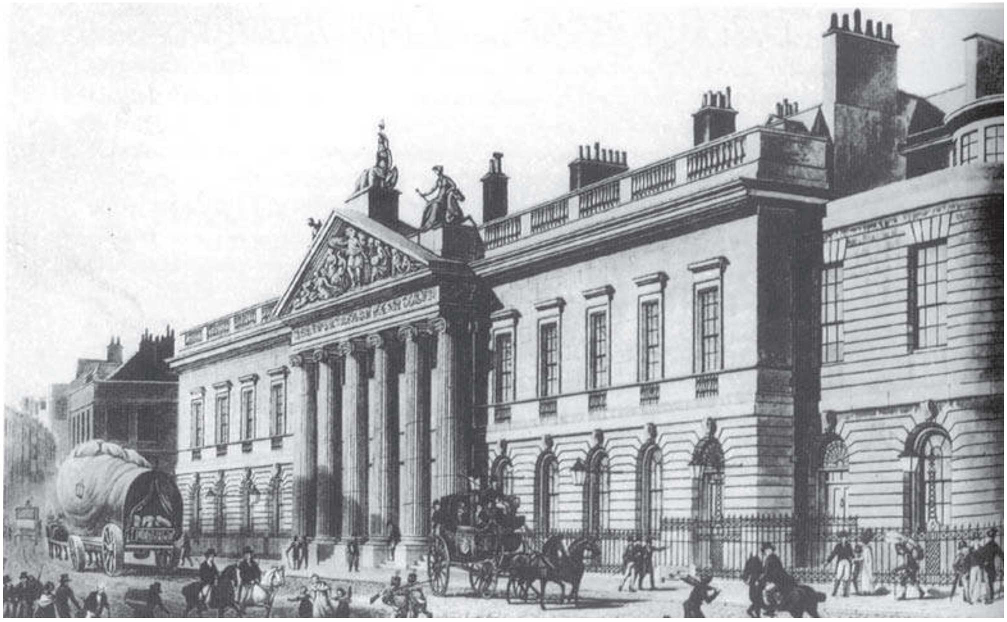

চিত্র 17 - লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাউস।
এটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশ্বব্যাপী ক্রিয়াকলাপের মূল কেন্দ্র ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাদের কাপড়ের জন্য বিদেশী বাজার অনুসন্ধান করতে শুরু করে। শুল্কের বাধার দরুন ব্রিটিশ বাজার থেকে সরে যাওয়ার পর ভারতীয় বস্ত্র শিল্প এখন অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাজারে শক্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। যদি ভারতীয় রপ্তানির পরিসংখ্যান লক্ষ করি, আমরা দেখতে পাবো সূতি বস্ত্রের ক্রমাগত পতন : 1800 খ্রিস্টাব্দের আশে পাশে সূতিবস্ত্রের রপ্তানি 30 শতাংশ ছিল যা 1815 খ্রিস্টাব্দে কমে গিয়ে 15 শতাংশে দাঁড়ায়। 1870 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই অনুপাত ৩ শতাংশের নীচে নেমে আসে।

তাহলে ভারত কী রপ্তানি করত ? পরিসংখ্যানে আবারও একটি নাটকীয় বিষয় সামনে

চিত্র 18 - সুরাট ও তার পার্শ্ববর্তী নদীর দূরবর্তী দৃশ্য।
সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিম ভারতীয় মহাসাগরে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল সুরাট।

আসে। পণ্য রপ্তানি যত দ্রুত কমেছে, কাঁচামালের রপ্তানি তত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। 1822-1871 সালের মধ্যে কাঁচা তুলোর রপ্তানি 5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 35 শতাংশ হয়। কাপড় রঙ করার জন্য ব্যবহৃত নীল বহু দশক ধরে রপ্তানি হতে থাকে। তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে পড়েছো 1820 সাল থেকে চিনে প্রচুর পরিমাণে আফিমের চালান হতে থাকে। পরে তা ভারতের একমাত্র বৃহত্তম রপ্তানি দ্রব্যে পরিণত হয়। ব্রিটেন ভারতে আফিম উৎপাদন করে তা চিনে রপ্তানি করত এবং এই বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে চিন থেকে চা ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করত।

ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্যে ভারতীয় বাজার প্লাবিত হয়। ভারত থেকে ব্রিটেন ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ দ্রব্য আমদানির মূল্য ভারত থেকে ব্রিটিশ দ্রব্য রপ্তানি মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় ব্রিটেন সবসময় 'বাণিজ্য উদ্বৃত্ত' অবস্থায় ছিল। ব্রিটেন এই উদ্‌বৃত্ত দ্বারা অন্য দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক ঘাটতির ভারসাম্য বজায় রাখে — অর্থাৎ এই দেশগুলো থেকে ব্রিটেন রপ্তানির চেয়ে বেশি আমদানি করে। এভাবেই বহুপক্ষীয় বন্দোবস্ত কাজ করছিল। এতে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ঘাটতি অন্য কোনো তৃতীয় একটি দেশের সাথে ব্যবসার উদ্‌বৃত্ত দ্বারা পূরণ করা হত। ব্রিটেনের ঘাটতি দূর করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটেনের ব্যবসায় যে উদ্‌বৃত্ত হত এর দ্বারা তথাকথিত 'দেশের খরচ' (Home Charges) চালানো হত। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্রিটিশ অফিসারদের বাড়িঘরে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ প্রেরণ, ভারতের বহিরাগত ঋণের সুদ এবং ভারতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের অবসরকালীন ভাতা।

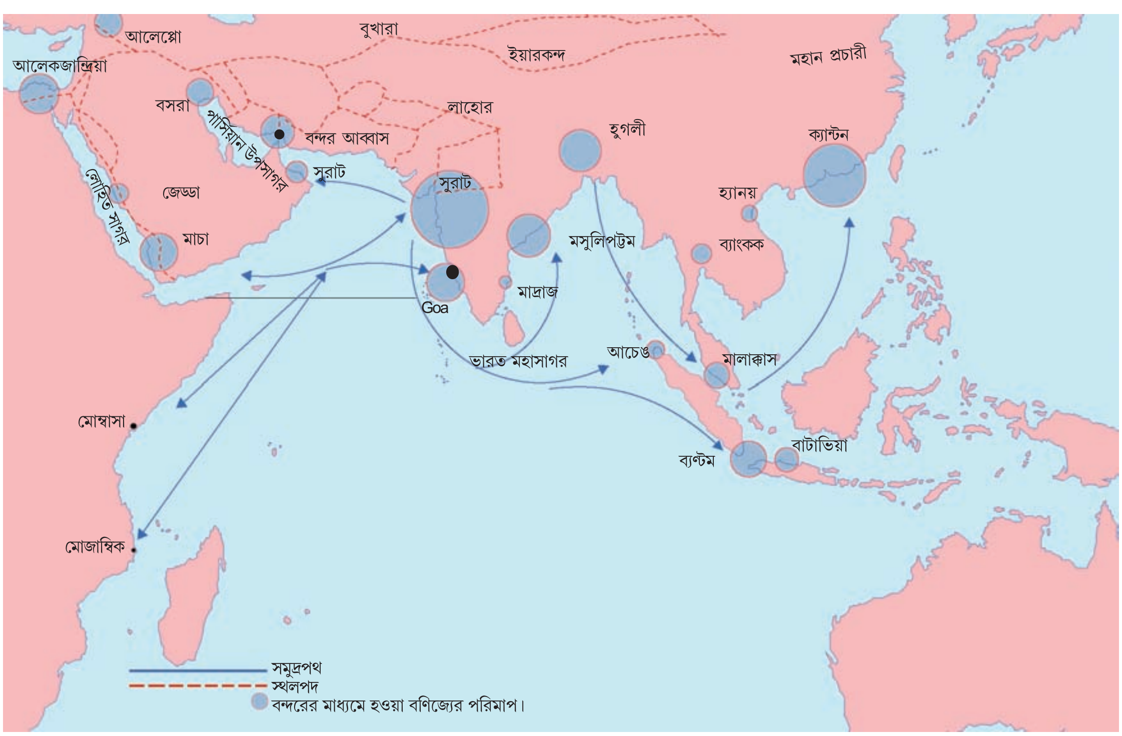

চিত্র 19 - সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশ্বের সাথে ভারতকে যুক্ত করা বাণিজ্যিক পথগুলো।

3 আন্ত যুদ্ধকালীন অর্থনীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-18) মূলত ইউরোপে ঘটেছিল। কিন্তু বিশ্বজুড়ে এর প্রভাব অনুভূত হয়। এই অধ্যায়ে আমাদের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, এটা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে একটি সংকটের মধ্যে ফেলে দেয় যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে তিন দশক সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বে ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আরেকটি সর্বনাশা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়।

3.1 যুদ্ধকালীন রূপান্তর

তোমরা জানো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দুটি শিবিরের মধ্যে সংঘটিত হয়। এক শিবিরে ছিল মিত্র রাষ্ট্রসমূহ ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া (পরবর্তী সময় আমেরিকা যোগদান করে) এবং বিপরীত দিকে ছিল কেন্দ্রীয় শক্তি — জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এবং অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্য। 1914 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন বিভিন্ন দেশের সরকার মনে করেছিল যে, বড়দিন উৎসবের আগে যুদ্ধ সমাপ্ত হবে। এই যুদ্ধ চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এমন এক ভয়ানক যুদ্ধ ছিল যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। এই যুদ্ধে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলো জড়িত ছিল যারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করে তাদের শত্রুদের সর্বাধিক সম্ভাব্য ধ্বংস সাধন করতে চেয়েছিল।

এই যুদ্ধ প্রথম আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক যুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধে মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, বিমান, রাসায়নিক অস্ত্র ইত্যাদির ব্যাপক আকারে ব্যবহার দেখা যায়। এইসব পণ্য আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের অবদান ছিল। যুদ্ধের জন্য লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে সারা পৃথিবী থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং বড় বড় জাহাজ ও রেলগাড়িতে করে তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। যুদ্ধে মৃত্যু ও ধ্বংসের মাত্রা—9 কোটি লোক নিহত হয় এবং 2 কোটি লোক আহত হয়— এই ধরনের বিভীষিকা শিল্প যুগের পূর্বে এবং শিল্প কারখানায় উৎপাদিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ছাড়া অকল্পনীয় ছিল।

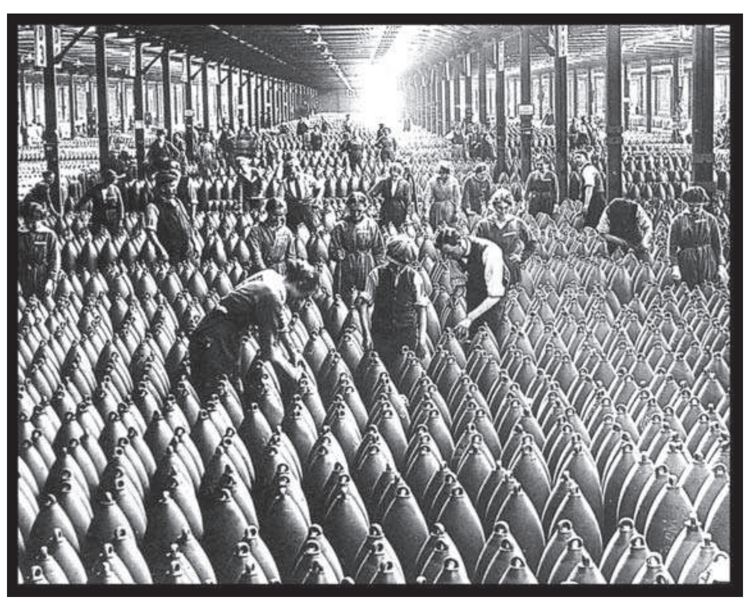

চিত্র 20 – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধোপকরণ তৈরি করা একটি কারখানায় শ্রমিকরা।
যুদ্ধের চাহিদা পূরণের জন্য যুদ্ধোপকরণের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

নিহত ও বিকলাঙ্গদের অধিকাংশই কাজের বয়সী পুরুষ ছিল। এই মৃত্যু এবং আঘাতে ইউরোপে সক্ষম কর্মীবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস পায়। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়ায় যুদ্ধের পর পরিবারের আয়ও হ্রাস পায়। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্পগুলোকে পুনর্গঠন করা হয়। যুদ্ধের জন্য পুরো সমাজকেও পুনর্গঠন করা হয়— যেমন পুরুষরা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, মহিলারা এমনসব কাজ করার জন্য পদক্ষেপ নেয় যা আগে কেবল পুরুষদের কাছ থেকেই প্রত্যাশিত ছিল।

যুদ্ধের ফলে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সংঘাতে লিপ্ত হয়। তাই ব্রিটেন মার্কিন ব্যাঙ্কের পাশাপাশি মার্কিন জনগণের কাছ থেকেও বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার নেয়। এইভাবে যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি আন্তর্জাতিক ঋণ গ্রহীতা থেকে আন্তর্জাতিক ঋণদাতায় রূপান্তরিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, যুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী সরকার এবং তার নাগরিকদের যে পরিমাণ সম্পত্তি ছিল তার চাইতে অনেক বেশি সম্পত্তি আমেরিকা এবং তার নাগরিকদের বিদেশে ছিল।

3.2 যুদ্ধোত্তর পুনরুদ্ধার

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ঘটানো খুব কঠিন কাজ ছিল। ব্রিটেন যেখানে প্রাক্ যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশ ছিল সেখানে পরবর্তী সময় তাকে এক দীর্ঘ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। যখন ব্রিটেন যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তখন ভারত ও জাপানে বিভিন্ন শিল্প বিকশিত হয়। যুদ্ধের পর ভারতীয় বাজারে পূর্বের মত প্রভাবশালী অবস্থানটি পুনরুদ্ধার করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা ব্রিটেনের পক্ষে কঠিন ছিল। উপরন্তু যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ নেয়। এর অর্থ এই যে, যুদ্ধের শেষে ব্রিটেনকে বিপুল পরিমাণ বিদেশী ঋণের বোঝা বহন করতে হয়।

যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক তেজিভাব দেখা যায় অর্থাৎ চাহিদা, উৎপাদন এবং রোজগারের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। যখন যুদ্ধের এই তেজিভাব শেষ হয় তখন উৎপাদন কমে যায় এবং কর্মহীনতা বৃদ্ধি পায়। এই সময় সরকার বাড়ন্ত যুদ্ধ ব্যয় কমিয়ে দেয় যাতে শান্তিকালীন করের সঙ্গে এগুলোকে একই সারিতে আনা যায়। এসব কিছুর ফলে ব্যাপক কর্মখালী হয়— 1921-এ প্রতি পাঁচজন ব্রিটিশ শ্রমিকের মধ্যে একজন কর্মহীন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা এবং অনিশ্চয়তা যুদ্ধোত্তর দৃশ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। অনেক কৃষিজ অর্থব্যবস্থাও সংকটে ছিল। উদাহরণ হিসাবে গম উৎপাদকদের ব্যাপারে ভেবে দেখো। যুদ্ধের আগে পূর্ব ইউরোপ ছিল বিশ্ব বাজারে গমের প্রধান যোগানদার। যুদ্ধের সময় যখন এই যোগান বিঘ্নিত হয় তখন হঠাৎ করে কানাডা, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় গমের উৎপাদন বেড়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পূর্ব ইউরোপে গমের উৎপাদন আবার শুরু হয় এবং গমের অত্যধিক সরবরাহ শুরু হয়। শস্যের দাম কমে যায়, গ্রামীণ আয় কমে যায় এবং কৃষকরা গভীর ঋণের জালে আবদ্ধ হয়।

3.3 ব্যাপক উৎপাদন এবং উপভোগের উত্থান

আমেরিকায় পুনরুত্থান খুব দ্রুত ছিল। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যুদ্ধ কীভাবে আমেরিকার অর্থনীতির উত্তরণে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধের কয়েক বছর পর কিছু

সময়ের জন্য আমেরিকার অর্থনীতি সমস্যার মধ্যে পড়লেও 1920-এর দশকে প্রবল বৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

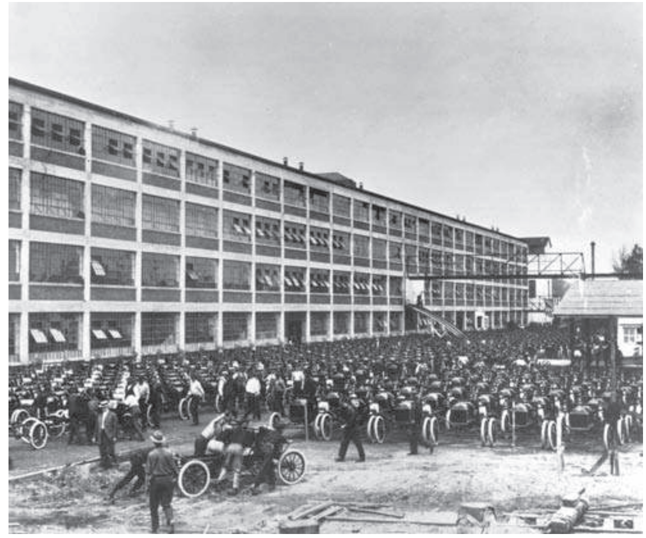

চিত্র 21 – কারখানার বাইরে সারিবদ্ধভাবে রাখা টি মডেলের গাড়িগুলো।

1920-এর দশকে আমেরিকার অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যাপক উৎপাদন। ব্যাপক উৎপাদনের দিকে অগ্রসর হওয়া শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, কিন্তু 1920-এর দশকে এটা আমেরিকায় শিল্পোৎপাদনের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। বৃহৎ উৎপাদনের একজন অতি পরিচিত পথিকৃৎ ছিলেন গাড়ি নির্মাতা হেনরি ফোর্ড। তিনি শিকাগোর একটি কসাইখানার (যেখানে কসাইরা কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে অপরপ্রান্তে নেমে আসা মৃত পশুদের তুলে আনত) এসেম্বলি লাইনের অনুকরণে ডেট্রয়েট-এ তার নতুন মোটর গাড়ি কারখানা স্থাপন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'এসেম্বলি লাইন' পদ্ধতি গাড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর দ্রুত এবং সস্তা হতে পারে। এসেম্বলি লাইন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের একই ধরনের কাজ যান্ত্রিকভাবে এবং বার বার করতে বাধ্য করা হত— যেমন গাড়িতে কনভেয়ার বেল্টের নির্ধারিত গতিতে একটি বিশেষ যন্ত্রাংশ লাগানোর কাজ। কাজের গতি বাড়ানোর মাধ্যমে প্রতি শ্রমিকের উৎপাদন বাড়াবার এটাই ছিল একটি পথ। কনভেয়ার বেল্টের সামনে দাঁড়িয়ে কোন শ্রমিকই ধীর গতিতে কাজ করতে, বিশ্রাম নিতে অথবা এমনকী সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতেও পারত না। এর ফলে প্রতি তিন মিনিটে হেনরি ফোর্ডের একটি গাড়ি এসেম্বলি লাইন থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসত। এর আগের গৃহীত পদ্ধতির তুলনায় এর গতি অনেক বেশি T-মডেল। ফোর্ড ছিল বৃহৎ উৎপাদন পদ্ধতিতে তৈরি বিশ্বের প্রথম গাড়ি।

প্রথমদিকে ফোর্ড কারখানার শ্রমিকরা এসেম্বলি লাইনে কাজ করার ধকল সইতে অক্ষম ছিল কারণ তারা কাজের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। তাই অনেক শ্রমিক কাজ ছেড়ে দেয়। বেপরোয়া হয়ে ফোর্ড 1914 সালের জানুয়ারি মাসে দৈনিক মজুরি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে 5 ডলার করেন। একই সঙ্গে তিনি তার কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজ নিষিদ্ধ করে দেন।

মজুরি বৃদ্ধির ফলে যে ঘাটতি দেখা দেয় তা পূরণ করার জন্য হেনরি ফোর্ড উৎপাদন লাইনের গতি অনবরত বাড়াতে থাকে এবং শ্রমিকদের আরও কঠোর কাজ করতে বাধ্য করে। কিছুদিন পর তিনি বলেন যে, দৈনিক মজুরি দ্বিগুণ করাটা ছিল তাঁর জীবনের 'খরচ কমানোর সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত'। ফোর্ডের উৎপাদন পদ্ধতিগুলো শীঘ্রই আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিগুলো 1920-এর দশকে ইউরোপেও বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করা হয়। বৃহৎ উৎপাদন পদ্ধতি প্রকৌশলীজাত দ্রব্য সামগ্রীর খরচ এবং দাম কমিয়ে দেয়। উচ্চতর বেতনের সুবাদে এখন অধিক সংখ্যক শ্রমিক গাড়ির মত টেকসই উপভোগ্য দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হয়। আমেরিকায় গাড়ির উৎপাদন 1919 সালে 20 লক্ষ ছিল, তা থেকে বেড়ে 1929 সালে 50 লক্ষে

পৌঁছায়। অনুরূপভাবে রেফ্রিজারেটার, ওয়াশিং মেশিন, রেডিও, গ্রামোফোন প্লেয়ার প্রভৃতি 'ধারে কেনার' (অর্থাৎ ধারে কিনে তা সাপ্তাহিক অথবা মাসিক কিস্তিতে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা) ব্যবস্থার মাধ্যমে কেনা হত। বাড়ি তৈরি এবং নিজের বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন প্রভৃতির চাহিদাও বেড়ে যায়। এগুলোর আর্থিক সংস্থানও ঋণের মাধ্যমেই হত।

1920-এর দশকে আবাস এবং ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি আমেরিকায় সমৃদ্ধির ভিত্তি তৈরি করে। বাড়ি তৈরি এবং ঘরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণে বৃহৎ পুঁজি লগ্নির ফলে অধিকতর কর্মসংস্থান এবং আয়ের চক্র তৈরি হয়। এতে উপভোগের চাহিদা বাড়ে, আরও বেশি পুঁজি লগ্নি হয় এবং আরও বেশি কর্মসংস্থান এবং আয়ের পথ সৃষ্টি হয়। 1923-এ আমেরিকা অবশিষ্ট বিশ্বকে আবার পুঁজি যোগান দিতে শুরু করে এবং বৃহত্তম ঋণদাতা দেশে পরিণত হয়। আমেরিকার আমদানি এবং পুঁজি রপ্তানি ও ইউরোপীয় অর্থব্যবস্থার পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে এবং পরবর্তী ছয় বছরে বিশ্ব বাণিজ্য এবং আয় বৃদ্ধিতেও উন্নতি সাধিত হয়।

যা হোক এসব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 1929-এর মধ্যে বিশ্ব এমন এক অর্থনৈতিক সংকটে ডুবে যায় যে এর আগে কখনই এমন অনুভব করা যায়নি।

3.4 মহামন্দা

1929 সালের আশেপাশে মহামন্দা শুরু হয় এবং 1930 এর দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত এটা স্থায়ী ছিল। এই সময়কালে বিশ্বের অধিকাংশ অংশে উৎপাদন, চাকরি, আয় এবং বাণিজ্যে সর্বনাশা পতন দেখা যায়। এই পতনের সময় এবং প্রভাব সব দেশে একই রকম ছিল না। কিন্তু সাধারণত মনে হয় কৃষিজ অঞ্চলগুলো এবং সম্প্রদায়গুলোর উপর এর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রভাব পড়েছিলো। এটা এই কারণে হয়েছিল যে, শিল্প দ্রব্যের দামের তুলনায় কৃষিজ পণ্যের দাম অনেক কমে যায় এবং তা অনেকদিন স্থায়ী ছিল।

এই মন্দা অনেকগুলো কারণের সমন্বয়ে ঘটেছিল। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনীতি কীরকম ভঙ্গুর ছল। প্রথম : অতিরিক্ত কৃষিজপণ্য উৎপাদনে সমস্যা থেকে যায়। কৃষিজ উৎপাদনের দাম কমে যাওয়ায় এই খারাপ অবস্থা তৈরি হয়। যেইমাত্র দাম কমে যায় এবং কৃষিজ আয় নেমে যায়, কৃষকরা উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করে এবং তাদের সার্বিক আয় বজায় রাখার জন্য বিশাল পরিমাণে উৎপাদন বাজারে নিয়ে আসে। বাজারে এই অত্যধিক সরবরাহ কৃষিপণ্যের দামকে আরও কমিয়ে দেয়। ক্রেতার অভাবে কৃষিপণ্য পচতে থাকে। দ্বিতীয়ত : 1920-এর দশকের মধ্যভাগে অনেক দেশ আমেরিকা থেকে ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে টাকা লগ্নি করে। যখন অবস্থা ভাল ছিল তখন আমেরিকা থেকে ঋণ নেওয়া খুব সহজ ছিল, কিন্তু সংকটের সংকেত পাওয়ার পর আমেরিকার বিদেশী সুদখোররা ত্রস্ত হয়ে পড়ে। 1928 এর প্রথমভাগে বিদেশে আমেরিকার ঋণ এক আরব ডলার ছিল। এক বছর

বক্স 3

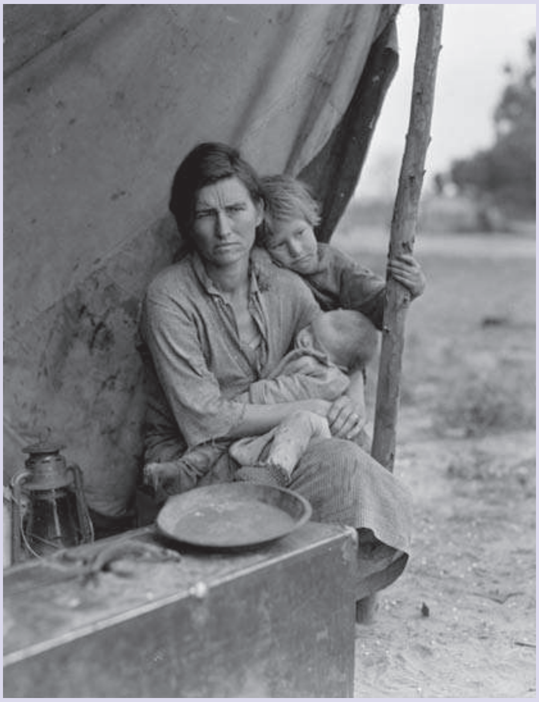

চিত্র 22 – 1936 সালে মহামন্দার সময় অভিবাসী কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকের গৃহহীন এবং ক্ষুধার্ত পরিবার। সৌজন্যে : লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, প্রিন্টস্ এন্ড ফটোগ্রাফ ডিভিশন।

এই চিত্রগ্রহণকারীনি ডরোথি ল্যাঙ্ এই ক্ষুধার্ত মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়কে স্মরণে রেখে অনেক বছর পর বলেছিলেন :

'আমি এই ক্ষুধার্ত এবং মরিয়া মাকে দেখলাম এবং একটি চুম্বকের আকর্ষণের মত তার দিকে এগিয়ে গেলাম... আমি তার নাম এবং অতীত জানতে চাইনি। তিনি আমাকে তাঁর বয়স জানালেন যে তাঁর বত্রিশ বছর।তিনি বললেন যে, তাঁরা (অর্থাৎ তিনি এবং তাঁর সাত শিশু) চতুর্দিকের মাঠ থেকে হিমায়িত শাক সবজি এবং শিশুদের দ্বারা শিকার করা পাখি খেয়ে বেঁচে আছেন... সেখানে তিনি বলেছিলেন... শিশুরা তাঁর চারদিকে গাদাগাদি করে বসেছিল এবং তাঁর মনে হল যে, আমার ছবি তাঁকে সাহায্য করতে পারে এবং তাই তিনি আমাকে সাহায্য করলেন...

সূত্র : পপ্যুলার ফটোগ্রাফি, ফেব্রুয়ারি 1960।

পর এই ঋণ কমে গিয়ে এক চতুর্থাংশে দাঁড়ায়। যেসব দেশ আমেরিকার ঋণের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল ছিল এখন তারা তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়।

যদিও সব দেশে একরকম প্রভাব পড়েনি কিন্তু আমেরিকার ঋণ প্রত্যাহারের ফলে অবশিষ্ট দেশগুলোতে এর প্রচন্ড প্রভাব পড়ে। এর ফলে ইউরোপে কিছু বড় বড় ব্যাঙ্কের পতন ঘটে এবং ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং এর মত মুদ্রাগুলোর ধস নামে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং আরও অন্যান্য জায়গায় এর ফলে কৃষিজ পণ্য এবং কাঁচামালের দাম তীব্রভাবে কমে যায়। আমদানি শুল্ক দ্বিগুণ করার মাধ্যমে আমেরিকা এই মহামন্দা থেকে তার অর্থ ব্যবস্থাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এটাও বিশ্ব বাণিজ্যের উপর আরেকটি বড় ধরনের আঘাত ছিল। শিল্প উদ্যোগী দেশ আমেরিকাও এই মহামন্দার দ্বারা সবচেয়ে গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। দাম পড়ে যাওয়ায় এবং মন্দার আশঙ্কায় আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলো ঘরোয়া ঋণদান কমিয়ে দেয় এবং ঋণগুলো ফিরিয়ে নেয়। খামারগুলো তাদের ফসল বিক্রি করতে পারতনা, পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং বাণিজ্য ধসে পড়ে। আয় কমে যাওয়ায় আমেরিকার অনেক পরিবার ঋণ ফেরত দিতে পারেনি এবং তাদের ঘরবাড়ি, গাড়ি এবং অন্য অনেক জিনিস ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। 1920-এর দশকে যে ভোগবাদী সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল এখন সেটা ধূলার ফুতকারে হারিয়ে যায়। কর্মহীনতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ কাজের খোঁজে অনেক অনেক দূরে চলে যেতে থাকে। পরিণামে আমেরিকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিজে থেকেই ধসে পড়ে। লগ্নি পুনরুদ্ধার, ঋণ সংগ্রহ এবং আমানতকারীদের আমানত ফিরিয়ে দিতে অক্ষমতার কারণে হাজার হাজার ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এই সংখ্যাগুলো বিস্ময়কর : 1933 এর মধ্যে 4000 এর উপর ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং 1929 থেকে 1932 এর মধ্যে প্রায় 1,10,000 কোম্পানি ধসে পড়ে।

1935 এর মধ্যে অধিকাংশ শিল্প উদ্যোগী দেশ অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের পথে ছিল। কিন্তু এই মহামন্দার ফলে সমাজ, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মানুষের মনে ব্যাপক ও স্থায়ী প্রভাব পড়েছিল।

চিত্র 23 – চাকরি লাভের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো বেকাররা, আমেরিকা, ডরাথি ল্যাঙ্ কর্তৃক তোলা চিত্র, 1938।
সৌজন্যে : লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, প্রিন্ট এন্ড ফটোগ্রাফস ডিভিশন।
যখন একটি কর্মহীনতার জনগণনায় দেখা যায় এক কোটি লোকের কোন কাজ নেই তখন আমেরিকার অনেক রাজ্যের স্থানীয় প্রশাসন কর্মহীনদের জন্য স্বল্প পরিমাণ ভাতা দেওয়া শুরু করে। এইসব দীর্ঘ সারিগুলিলা মহামন্দার বছরগুলোর দরিদ্রতা এবং কর্মহীনতার প্রতীক ছিল।

3.5 ভারত এবং মহামন্দা

যদি আমরা ভারতের উপর এই মহামন্দার প্রভাব লক্ষ করি তবে আমরা বুঝতে পারব বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বৈশ্বিক অর্থনীতি কত সংহত ছিল। সংকটের এই কম্পন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে বিশ্বজুড়ে জীবন, অর্থনীতি এবং সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তোমরা যা দেখলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক ভারত কৃষিজ পণ্য সামগ্রীর রপ্তানিকারকে পরিণত হয় এবং যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের আমদানিকারকে পরিণত

হয়। এই মন্দা শীঘ্রই ভারতীয় বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। ভারতীয় বাণিজ্যের রপ্তানি এবং আমদানি 1928 থেকে 1934 এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য হ্রাস পেলে ভারতেও মূল্য খুব দ্রুত কমে যায়। 1928 থেকে 1934 সালের মধ্যে ভারতে গমের মূল্য অর্ধেক কমে যায়।

শহরের অধিবাসীদের তুলনায় কৃষক এবং চাষিরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও কৃষিজ পণ্যের দাম তীব্রভাবে কমে যায়, কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার রাজস্বের দাবি কমাতে অস্বীকার করে। সবচেয়ে খারাপ আঘাত এসেছিল সেই সমস্ত কৃষকদের উপর যারা বিশ্ব বাজারের জন্য উৎপাদন করত।

বাংলার পাট-চাষীদের কথা ভেবে দেখো। তারা কাঁচা পাট উৎপাদন করত যা থলিরূপে রপ্তানি করার জন্য কারখানায় প্রক্রিয়াকরণ করা হত। কিন্তু যখন চটের থলি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় তখন কাঁচা পাটের দাম 60 শতাংশেরও বেশি নীচে নেমে যায়। কৃষকগণ যারা সুদিনের আশায় অথবা বেশি আয়ের আশায় উৎপাদন বাড়াবার জন্য ঋণ গ্রহণ করেছিল তাদেরকে সবচেয়ে নিম্নমূল্যের সম্মুখীন হতে হয় এবং ফলে গভীর ঋণে আবদ্ধ হয়। এভাবে বাংলার পাটচাষিদের বিলাপ কবির ভাষায় :

ভাইয়েরা বেশি দামের আশায় আরও বেশি পাট উৎপাদন করো।
পাটের দাম এবং ঋণ তোমার আশাকে হতোদ্যম করবে।
যখন তুমি তোমার সমগ্র পুঁজি খরচ করবে এবং ক্ষেত থেকে ফসল তুলবে,
... ঘরে বসে বণিকরা, তোমাকে দেবে মাত্র 5 টাকা প্রতি মণ।

সমগ্র দেশে কৃষকদের দায় বেড়ে যায়। তারা তাদের সঞ্চয় খরচ করে ফেলে, জমি বন্ধক দেয় এবং খরচ মেটানোর জন্য স্বর্ণালঙ্কার এবং মূল্যবান ধাতু যাই কিছু তাদের কাছে ছিল, সব বিক্রি করে দেয়। এই মন্দার বছরগুলোতে লক্ষণীয়ভাবে ভারত মূল্যবান ধাতু স্বর্ণ রপ্তানিকারকে পরিণত হয়। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন ম্যানার্ডকিন্‌স মনে করেন যে, ভারতীয় স্বর্ণ রপ্তানি বৈশ্বিক অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। এই রপ্তানি নিশ্চিতভাবে ব্রিটেনের দ্রুত পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করে কিন্তু ভারতীয় কৃষকদের কোন লাভ হয়নি। 1931 সালে চরম অর্থনৈতিক মন্দার সময় গান্ধিজি যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন তখন গ্রামীণ ভারতে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠে।

এই মন্দা ভারতের শহর অঞ্চলে এত ভয়ানক ছিল না। সবকিছুর দাম কমে যাবার কারণে যাদের আয় স্থির ছিল— যেমন শহুরে জমিদার যারা ভাড়া পেত এবং মধ্যবিত্ত বেতনভোগী কর্মচারীরা--- তাদের অবস্থা ভাল হয়। জাতীয়তাবাদীদের দাবির চাপে সরকার শিল্প সংরক্ষণের জন্য শুল্ক বাড়িয়ে দিলে লগ্নীও বেড়ে যায়।

আলোচনা কর :

পাট চাষিদের বিলাপ অনুসারে পাট চাষে কারা লাভবান হয়? বর্ণনা কর।

4 বিশ্ব অর্থনীতির পুনর্গঠন : যুদ্ধোত্তর যুগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিছক দুই দশক পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল অক্ষশক্তি (প্রধানত নাৎসি জার্মানি, জাপান এবং ইটালি) এবং মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)-এর মধ্যে। বিভিন্ন রণাঙ্গনের সম্মুখভাগে, বিভিন্ন জায়গায়, ভূমিতে, সমুদ্রে এবং আকাশে ছয় বৎসর যাবৎ এই যুদ্ধ চলতে থাকে।

এই যুদ্ধেও প্রচুর মৃত্যু এবং ধ্বংস হয়। যুদ্ধের ফলে 1939 সালে ন্যূনতম 6 কোটি লোক অথবা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় 3 শতাংশ লোকের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মৃত্যু হয় বলে ধারণা করা হয়। আরও লক্ষ লক্ষ লোক আহত হয়। পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলো থেকে ভিন্ন, এই মৃত্যুগুলো অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে ঘটেছিল। সৈন্যের তুলনায় অনেক বেশি অসামরিক ব্যক্তি যুদ্ধ সম্পর্কিত কারণে মারা যায়। ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং এশিয়া বিধ্বস্ত হয় এবং আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের ফলে অথবা নিষ্ঠুর কামান আক্রমণের ফলে অনেক শহর ধ্বংস হয়। এই যুদ্ধের কারণে বিশাল পরিমাণ অর্থনৈতিক ধ্বংস এবং সামাজিক ভাঙ্গন দেখা দেয়। পুনর্নির্মানের কাজ দীর্ঘ এবং জটিল হবে বলে মনে করা হয়।

চিত্র 24 – 1941 এর জুলাই মাসে জার্মান বাহিনীর রাশিয়া আক্রমণ।
হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের চেষ্টা যুদ্ধের একটি সন্ধিক্ষণ ছিল।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়। প্রথমটি হল পশ্চিম বিশ্বে প্রভাবশালী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি হিসাবে আমেরিকার আবির্ভাব। দ্বিতীয়টি হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্ব। নাৎসী জার্মানিকে পরাজিত করতে সোভিয়েত রাশিয়া বিরাট ত্যাগ করেছিল। যখন পুঁজিবাদী বিশ্ব মহামন্দার কবলে পড়েছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা তাদের নিজেদের দেশকে পশ্চাৎপদ কৃষিজ দেশ থেকে বিশ্ব শক্তিতে রূপান্তর করে।

চিত্র 25 – যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত সোভিয়েত রাশিয়ার স্ট্যালিন গ্রাড।

4.1 যুদ্ধোত্তর বন্দোবস্ত এবং ব্রেটন উড্‌স প্রতিষ্ঠানগুলো

অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদগণ দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে দুটি প্রধান পাঠ খুঁজে বের করেন। প্রথমটি, বৃহৎ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল একটি শিল্পকেন্দ্রিক সমাজকে বিশাল সংখ্যার উপভোক্তা ছাড়া বজায় রাখা যায় না। কিন্তু ব্যাপক উপভোগকে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন বেশি এবং স্থায়ী আয়। যদি চাকরি অস্থায়ী হয় তবে আয় স্থায়ী হতে পারে না। এভাবে স্থায়ী আয়ের জন্য দরকার দৃঢ় বা সুস্থিত, পূর্ণ চাকরি।

কিন্তু শুধুমাত্র বাজার পূর্ণ চাকরির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এই কারণে দাম,

উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের উঠানামার উপর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। কেবলমাত্র সরকারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক স্থিরতা সুনিশ্চিত হতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ, বহির্বিশ্বের সঙ্গে একটি দেশের অর্থনৈতিক সংযুক্তি সম্পর্কে ছিল। পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য কেবলমাত্র তখনই অর্জন করা যায় যখন দ্রব্য সামগ্রী মূলধন এবং শ্রম প্রবাহের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে।

এভাবে সংক্ষেপে বলতে গেলে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্পোৎপাদনের জগতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অক্ষুণ্ণ রাখা। 1944 সালের জুলাই মাসে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারে অবস্থিত ব্রিটন উড্‌স-এ সংযুক্ত রাষ্ট্রের মনিটরিং এন্ড ফাইনানসিয়াল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অবকাঠামোর সহমত পোষণ করা হয়।

চিত্র 26 – আমেরিকার ব্রিটন উড্‌সে অবস্থিত মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেল।
এটা সেই স্থান যেখানে সেই বিখ্যাত সম্মেলনটি আয়োজিত হয়।

সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি মোকাবিলা করার জন্য ব্রিটন উড্‌স সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক তহবিল (IMF) গঠিত হয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পুনর্নির্মাণ এবং উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (সাধারণত বিশ্বব্যাঙ্ক নামে পরিচিত) গড়ে তোলা হয়। এই কারণে আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ককে ব্রিটন উড্‌স প্রতিষ্ঠান অথবা কখনও কখনও ব্রিটন উড্‌স যমজ বলে উল্লেখ করা হয়। যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও প্রায়শই ব্রিটন উড্‌স ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়।

আই.এম.এফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক 1947 সালে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া পশ্চিমি শিল্পপ্রধান শক্তিগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রদানের কার্যকরী অধিকার রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল জাতীয় মুদ্রাগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংযুক্তির ব্যবস্থা। ব্রিটন উড্‌স ব্যবস্থা স্থায়ী বিনিময় হারগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল। এই ব্যবস্থায় জাতীয় মুদ্রাগুলো উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় টাকা, ডলারের সঙ্গে এক স্থায়ী বিনিময় হারে বাঁধা ছিল। ডলারের মূল্যও স্বর্ণের সঙ্গে বাঁধা ছিল। স্বর্ণের দাম প্রতি আউন্স 35 ডলার নির্ধারিত হয়।

আলোচনা কর :

সংক্ষেপে বর্ণনা কর, দুটি বিশ্ব যুদ্ধের মাঝখানের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিকরা কী শিক্ষা লাভ করেছিলেন?

4.2 প্রারম্ভিক যুদ্ধোত্তর বছরগুলো

ব্রিটন উড্‌স ব্যবস্থা পশ্চিমী শিল্প সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর এবং জাপানের জন্য বাণিজ্য এবং আয় বৃদ্ধির এক অভূতপূর্ব যুগের সূচনা করে। 1950 থেকে 1970 এর মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য বার্ষিক 8 শতাংশের উপর বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় আয়ও প্রায় 5 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বেশি উঠানামা ছাড়াই এই বৃদ্ধিও প্রায় স্থিতিশীল ছিল। উদাহরণস্বরূপ অধিকাংশ শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোতে সেই সময় কর্মহীনতার হার গড়ে

5 শতাংশের কম ছিল। এই দশকগুলোতেও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হবার তাড়া ছিল। তাই তারা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিল্পোৎপাদনের যন্ত্র এবং উপকরণ আমদানিতে বিরাট পুঁজি লগ্নি করে।

4.3 অ-ঔপনিবেশীকরণ এবং স্বাধীনতা

যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয় তখনও বিশ্বের বৃহৎ অংশ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিল। পরবর্তী দুই দশকে এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ উপনিবেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে উদিত হয়। যদিও এইসব দেশগুলো সম্পদের অভাব এবং দরিদ্রতার ভারে ন্যুব্জ এবং তাদের অর্থনীতি ও সমাজ দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভেঙে পড়েছিল।

শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোর আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যই আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক গঠিত হয়। তবে এগুলো সাবেক উপনিবেশগুলোর দরিদ্রতা এবং উন্নয়নের অভাব মোকাবিলা করার জন্য সজ্জিত ছিল না। কিন্তু ইউরোপ এবং জাপান দ্রুতগতিতে তাদের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করায় আই.এম.এফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই তারা বেড়ে উঠে। এভাবে 1950 এর দশকের শেষদিক থেকে ব্রিটেন উড্স প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করতে শুরু করে।

বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলগুলো উপনিবেশরূপে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের অঙ্গ ছিল। নতুন স্বাধীন দেশগুলো তাদের জনগণকে দরিদ্রতা থেকে তোলে আনার জরুরী চাপের সম্মুখীন হয় এবং তারা এখন হাস্যকরভাবে সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অধীনে চলে আসে। এমনকী অ-ঔপনিবেশীকরণ এর অনেক বছর পরও প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের পূর্বতন উপনিবেশগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলো যেমন— খনিজ সম্পদ এবং জমির উপর নিয়ন্ত্রণ করত। আমেরিকার মত অপরাপর শক্তিশালী দেশগুলোর বড় বড় নিগম ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদকে খুব সস্তায় শোষণ করার অধিকারকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করে।

1950 এবং 1960 এর দশকে পাশ্চাত্য অর্থনীতি যে দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করে সেভাবে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ সুবিধা নিতে পারেনি। তারা 77-এর গোষ্ঠী (অথবা জি-77) নামে নিজেদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে সংগঠিত করে এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রণালী (NIEO) দাবি করে। এনআইও দ্বারা তারা এমন এক ব্যাবস্থার কথা বুঝাতে চেয়েছিল যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হবে, বিকাশের অধিক সহায়তা পাওয়া যাবে, কাঁচা মালের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাবে এবং নিজেদের তৈরি পণ্য সামগ্রীকে উন্নত দেশগুলোর বাজারে বিক্রি করার জন্য প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে।

বক্স 4

বহুজাতিক সংস্থা (এম.এন.সি) বলতে কী বোঝায়?

বহুজাতিক সংস্থা হল এমন কিছু বৃহৎ কোম্পানী যারা একই সময়ে অনেক দেশে ব্যবসা করে। 1920-এর দশকে প্রথম এমএনসি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1950 এবং 1960-এর দশকে আমেরিকার বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপান ও পুনরুজ্জীবিত হয়ে শক্তিশালী শিল্প সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত হয়। এর ফলে এরকম আরও অনেক কোম্পানি উঠে আসে। 1950 এবং 1960-এর দশকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এমএনসি'র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি। এটা অংশত বিভিন্ন দেশের সরকার উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করার কারণে হয়। ফলে এমএনসিগুলো উৎপাদন ক্রিয়া প্রণালী সনাক্ত করতে বাধ্য হয় এবং অধিকাংশ দেশে ঘরোয়া উৎপাদকে পরিণত হয়।

নতুন শব্দ

আমদানি শুল্ক— বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে কোন একটি দেশের আমদানির উপর আরোপিত কর। আমদানি শুল্ক হল প্রবেশ দ্বারে অর্থাৎ সীমান্তে অথবা বিমানবন্দরে আরোপিত কর।

4.4 ব্রিটন উড্‌সের সমাপ্তি এবং বিশ্বায়নের শুরু

অনেক বছর স্থায়ী এবং দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তর বিশ্বে সবকিছু সঠিক ছিল না। 1960-এর দশক থেকে বিদেশের কর্মকাণ্ডে জড়িত হবার ফলে বাড়ন্ত ব্যয় আমেরিকার অর্থনীতি এবং প্রতিযোগিতার শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। আমেরিকার ডলারের এখন আর বিশ্বের প্রধান মুদ্রা হিসাবে পূর্বের মত কর্তৃত্ব রইল না। স্বর্ণের সঙ্গো বিনিময় মূল্য ডলার ধরে রাখতে পারেনি। অবশেষে স্থায়ী বিনিময় হারের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং অস্থির বিনিময় হারের ব্যবস্থা শুরু হয়।

1970-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথে পরিবর্তন আসে। পূর্বে উন্নয়নশীল দেশগুলো ঋণ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর শরণাপন্ন হতে পারত। কিন্তু এখন তাদের পাশ্চাত্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এবং ব্যক্তিগত ঋণদান সংস্থাসমূহ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য করা হয়। এতে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশেষ করে আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ঋণের সংকট দেখা দেয় এবং আয় কমে যায়, দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়।

শিল্পপ্রধান বিশ্বেও কর্মহীনতার আঘাত নেমে আসে। এই কর্মহীনতা 1970-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে বাড়তে থাকে এবং 1990-এর দশকের প্রথমদিক পর্যন্ত এই বৃদ্ধি বজায় থাকে। 1970-এর দশকের শেষ দিক থেকে এমএনসিগুলো নিম্ন মজুরির এশিয়ার দেশগুলোতে উৎপাদন ক্রিয়াকলাপ সরিয়ে নিতে শুরু করে।

চিন 1949 সালের বিপ্লবের পর থেকে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। কিন্তু চিনে নতুন আর্থিকনীতি এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত শৈলী সমাজতন্ত্রবাদ ভেঙে পড়লে অনেক দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে ফিরে আসে।

চিনের মত দেশে মজুরি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ফলে বিশ্ববাজার দখল করার জন্য প্রতিযোগিতায় রত বিদেশী বহু রাষ্ট্রীয় কোম্পানীগুলোর পুঁজি লগ্নির আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত হয় এইসব দেশগুলো। তোমরা যে দোকানগুলোতে অধিকাংশ টি.ভি, মোবাইল ফোন এবং খেলনা দেখো সেগুলো কী চিনে তৈরি বলে মনে হয়? চৈনিক অর্থনীতির নিম্ন ব্যয় গঠন প্রণালী বিশেষ করে তার নিম্ন মজুরির কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

নিম্ন মজুরির দেশগুলোতে শিল্প স্থানান্তরের ফলে বিশ্ববাণিজ্য এবং মূলধন প্রবাহের উপর প্রভাব পড়ে। শেষ দুই দশকে ভারত, চিন এবং ব্রাজিলের মত দেশগুলির অর্থনীতিতে আসা বিরাট পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের অর্থনৈতিক ভূগোল পুরোপুরি বদলে যায়।

নতুন শব্দ

বিনিময় হার— আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুদ্রাগুলোকে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গো যুক্ত করা হয়। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে বিনিময় হার দুই ধরনের হয় : স্থায়ী বিনিময় হার এবং অস্থায়ী বিনিময় হার।

স্থির বিনিময় হার— যখন বিনিময় হার স্থায়ী হয় এবং এতে আসা হ্রাস বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

অস্থায়ী বিনিময় হার— বিদেশী মুদ্রা বাজারে বিভিন্ন মুদ্রার চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে এবং সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া এই হার উঠানামা করে।

সংক্ষেপে লেখো

1. সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বিভিন্ন ধরনের বৈশ্বিক আদান-প্রদানের দুটি উদাহরণ, একটি এশিয়া থেকে এবং অপরটি আমেরিকা থেকে বাছাই করে দাও।
2. প্রাক্ আধুনিক বিশ্বে রোগের বৈশ্বিক প্রসার কীভাবে আমেরিকার ঔপনিবেশীকিকরণে সাহায্য করেছিল, বর্ণনা কর।
3. নিম্নলিখিতগুলোর প্রভাব বর্ণনা করে টীকা লিখো :
   a) ভুট্টা আইন বন্ধ করতে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত।
   b) আফ্রিকায় গো-মরকের আবির্ভাব।
   c) বিশ্বযুদ্ধের কারণে ইউরোপে কাজ করার উপযুক্ত বয়সের পুরুষদের মৃত্যু।
   d) ভারতীয় অর্থনীতিতে মহামন্দার প্রভাব।
   e) এমএনসিগুলোর (বহুরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর) এশিয়ার দেশগুলোতে উৎপাদন স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত।
4. খাদ্যের সহজলভ্যতার উপর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব দেখাবার ইতিহাস থেকে দুটি উদাহরণ দাও।
5. ব্রিটন উড্‌সের চুক্তি বলতে কী বোঝায়?

আলোচনা কর :

6. কল্পনা করো যে তুমি ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে চুক্তিবদ্ধ একজন ভারতীয় শ্রমিক। এই অধ্যায় থেকে বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে তুমি তোমার পরিবারকে তোমার জীবন এবং উপলব্ধি সম্পর্কে একটি পত্র লিখো।
7. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিনিময়ের তিনটি দিক অথবা প্রবাহ বর্ণনা কর। প্রত্যেক প্রবাহ থেকে একটি করে উদাহরণ দাও যেখানে ভারত এবং ভারতীয়রা যুক্ত এবং এ ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
8. মহামন্দার কারণগুলো বর্ণনা কর।
9. জি-77 দেশগুলো বলতে কী বোঝানো হয়েছে বর্ণনা কর। ব্রিটন উড্‌স যমজের কার্যাবলীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে জি-77 কে কীভাবে দেখা যেতে পারে?

প্রকল্প

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বর্ণ এবং হীরা খনন সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের কর। স্বর্ণ এবং হীরা কোম্পানীগুলোকে কে নিয়ন্ত্রণ করত? খনি শ্রমিকগণ কারা ছিল এবং তাদের জীবন কীরকম ছিল?

শিল্পায়নের যুগ

(The Age of Industrialisation)

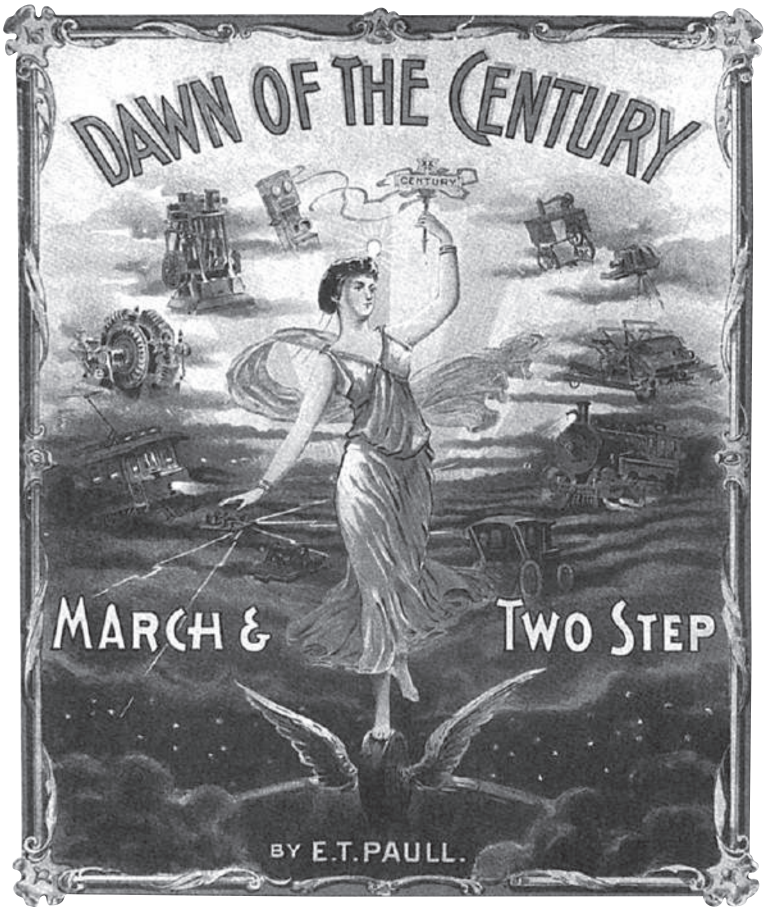

ছবি 1– Dawn of the Century (শতাব্দীর উষাকাল) E.T. Paull মিউজিক কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত। নিউইয়র্ক, ইংল্যান্ড, 1900 খ্রিঃ

1900 খ্রিঃ একজন জনপ্রিয় সঙ্গীত প্রকাশক E.T. Paull একটি সঙ্গীতের বই প্রকাশ করেন, যার কভার পৃষ্ঠাতে একটি ছবি ছিল যা 'Dawn of the Century' বা শতাব্দীর উষাকাল ঘোষণা করে (ছবি-1)। তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ, ছবির কেন্দ্রে এক ঈশ্বরীর (goddess) মতো মূর্তি রয়েছে, ইনি অগ্রগতির দেবদূত, নতুন শতাব্দীর পতাকা হাতে তিনি দণ্ডায়মান রয়েছেন। তিনি ধীরভাবে ডানাযুক্ত একটি চাকার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, যা সময়ের প্রতীক ছিল। তার উড্ডয়ন (flight) তাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে ভাসমান রয়েছে অগ্রগতির লক্ষণসমূহ : রেলপথ, ক্যামেরা, মেশিন, মুদ্রণযন্ত্র এবং কারখানা।

মেশিন ও প্রযুক্তির এই গৌরব আরো একটি ছবিতে একশ বছর আগেই এক ব্যবসায়িক ম্যাগাজিন এর পাতায় প্রকাশিত হয় (ছবি-2)। এই ছবিতে দু'জন জাদুগরকে দেখানো হয়েছে। উপরের দিকে একজন হল প্রাচ্যের আলাদিন, যিনি তার জাদুর বাতি দ্বারা একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

নতুন শব্দ

প্রাচ্য— প্রাচ্য বলতে ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের দেশগুলো সাধারণত এশিয়াকে বোঝায়। শব্দটি পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভুত হয়, যা এই এলাকাকে প্রাক্ আধুনিক ঐতিহ্যপূর্ণ এবং রহস্যময় হিসেবে দেখায়।

নিচের দিকে একজন আধুনিক কারিগর রয়েছেন, যিনি তার আধুনিক সরঞ্জামগুলো দিয়ে একটি নতুন জাদু তৈরি করেন। তিনি সেতু, জাহাজ, মিনার এবং গগনচুম্বী ভবন নির্মাণ করেন। আলাদিনকে দেখানো হয় পূর্ব ও অতীতের প্রতিনিধি হিসেবে, আর আধুনিক কারিগরকে দেখানো হয় পশ্চিম এবং আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে।

এই ছবিগুলো আমাদের আধুনিক বিশ্বের বিজয়গাঁথা শোনায়। এই বিবরণে আধুনিক বিশ্বকে দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, নতুন আবিষ্কার, মেশিন ও কারখানা, রেলপথ এবং বাষ্পচালিত জাহাজ এর সাথে যুক্ত করা হয়। এইভাবেই শিল্পায়নের ইতিহাস বিকাশের একটি কাহিনি রূপে সামনে আসে এবং আধুনিকযুগে প্রযুক্তিতে অগ্রগতির একটি চমৎকার সময় হিসেবে অবির্ভূত হয়।

এইসব ছবি এবং ধারণা এখন জনপ্রিয় কল্পনা শক্তির অংশ হয়ে গেছে। তোমরা কি অগ্রগতি ও আধুনিকতার একটি সময় হিসেবে দ্রুত শিল্পায়ন দেখতে পাচ্ছ না? রেলপথ এবং কারখানার বিস্তার, গগনচুম্বি ভবন এবং সেতুর নির্মাণ সমাজ উন্নয়নের একটি চিহ্ন বলে কি তোমরা মনে করো না?

কীভাবে এই অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে? কীভাবে আমরা এই ধারণার সাথে সম্পর্কিত? শিল্পায়ন কি সবসয় দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে? আজও কি আমরা সব কাজের জন্য ক্রমাগত যান্ত্রিকীকরণের গুণকীর্তন করতে পারি? মানুষের জীবনে শিল্পায়নের প্রভাব কী? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের শিল্পায়নের ইতিহাস জানতে ও বুঝতে হবে।

এই অধ্যায়ে আমরা শিল্পায়নের ইতিহাস পড়ব। প্রথমে পৃথিবীর প্রথম শিল্পোদ্যোগী রাষ্ট্র ব্রিটেনের উপর আলোকপাত করব যেখানে শিল্প পরিবর্তনের ধরণ ঔপনিবেশিক শাসনের শর্তাধীনে ছিল।

ছবি 2– 1901 খ্রিঃ 26শে জানুয়ারি ইংল্যান্ড প্রিন্টার্স এ প্রকাশিত দুই জাদুঘর।

কার্যাবলি

অগ্রগতির সাথে যুক্ত আধুনিক উন্নয়ন সমস্যা সৃষ্টি করেছে— এমন দুটি উদাহরণ দাও। তোমরা পরিবেশগত বিষয়, পারমাণবিক অস্ত্র বা রোগ সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও চিন্তা করতে পারো।

1 শিল্প বিপ্লবের পূর্বে

আমরা প্রায়ই কারখানা শিল্প বিকাশের সাথে শিল্পায়নকে যুক্ত করি। যখন আমরা শিল্প উৎপাদনের কথা বলি তখন আমরা কারখানার উৎপাদনকেই বোঝাই। যখন আমরা শিল্প শ্রমিক বলি তখন আমরা কারখানার শ্রমিকদের বোঝাই। শিল্পায়নের ইতিহাস প্রায়ই প্রথম কারখানা স্থাপনের সাথে শুরু হয়।

এই প্রকার ধারনার একটি সমস্যা রয়েছে। এমনকি ইংল্যান্ড ও ইউরোপে কারখানা গড়ে উঠার অনেক আগেই আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য ব্যাপক সংখ্যায় শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদিত হতে থাকে। এইসব দ্রব্য কারখানায় তৈরি হয়নি। অনেক ঐতিহাসিকরা শিল্পায়নের এই পর্যায়কে আদি শিল্পায়ন নামকরণ করেন।

নতুন শব্দ

আদি কোন জিনিসের প্রথম বা প্রারম্ভিক অবস্থার সংকেত।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন শহরগুলিতে ব্যবসায়ীরা গ্রামাঞ্চলের দিকে যেতে শুরু করে। তারা কৃষক ও কারিগরদের অর্থের যোগান দেয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য দ্রব্য উৎপাদন করতে উৎসাহিত করে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রসার এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা শহরের মধ্যে থেকে এই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারছিলেন না, কারণ শহুরে কারিগর এবং ব্যবসায়িক গিল্ড খুব শক্তিশালী ছিল। এই গিল্ডগুলি ব্যবসায়ীদের সংগঠন ছিল, যা কারিগরদের প্রশিক্ষণ দিত, উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখত, প্রতিযোগিতা এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ করত, আবার বাণিজ্যে নতুন ব্যবসায়ীদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করত। শাসকরা বিভিন্ন গিল্ডকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। ফলে নতুন ব্যবসায়ীদের পক্ষে শহরগুলিতে ব্যবসা শুরু করা কঠিন ছিল। আর এই জন্য তারা গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করে।

গ্রামে গরিব কৃষক ও কারিগররা বণিকদের জন্য কাজ করতে শুরু করে। তোমরা বিগত বছরের পাঠ্য পুস্তকে দেখেছো এটা এমন একটা সময় ছিল যখন খোলা মাঠের পরিমাণ কমে যেতে শুরু করে এবং জনসাধারণ গণ্ডীবদ্ধ হতে শুরু করে। ছোট ছোট ও দরিদ্র কৃষকরা যারা পূর্বে জীবিকার জন্য সাধারণ জমি, জ্বালানী লাকড়ি, বেরি (Berries) সবজি, খড়, তৃণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করত, তারাও এই সময়ে আয়ের বিকল্প উৎসের সন্ধান করেছিল। অনেকেই ক্ষুদ্র জমির মালিক ছিলেন কিন্তু তা পরিবারের সকল সদস্যদের ভরনপোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই যখন ব্যবসায়ীরা গ্রামে এসে তাদের পণ্য তৈরি করার জন্য অগ্রিম অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব করে তখন কৃষক পরিবারগুলি উৎসাহের সাথে সম্মত হয়।

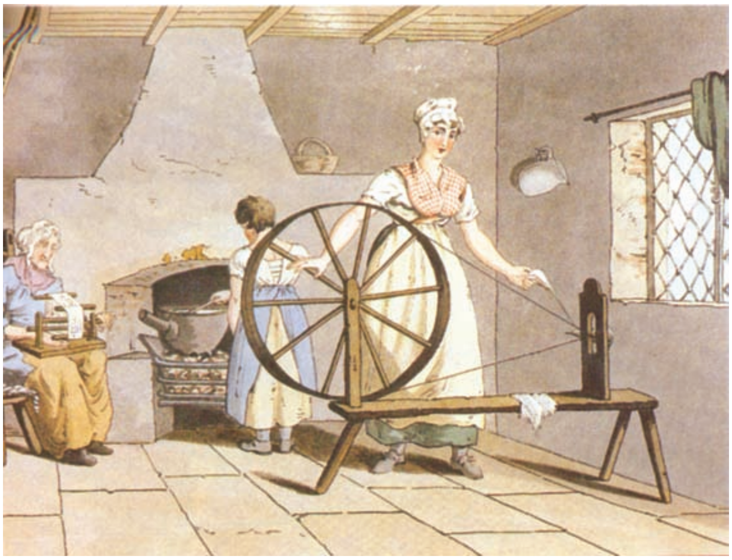

ছবি 3– অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পিনিং
তোমরা সুতা উৎপাদনের সাথে যুক্ত পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে দেখতে পাচ্ছ। লক্ষ করো একটি চাকা একটি টাকুকেই চালাতে পারে।

ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে কাজ করার পাশাপাশি তারা গ্রামেই থাকতে পারত এবং নিজেদের ছোট ছোট জমির অংশেও চাষবাস করতে পারত।

এই ব্যবস্থার ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ব্যবসায়ীরা শহর কেন্দ্রীক হলেও তাদের কাজ বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলেই চলতে থাকে। ইংল্যান্ডের কাপড় ব্যবসায়ীরা পশম স্টেপলার থেকে পশম কাপড় কিনে সূতা প্রস্তুতকারকের কাছে নিয়ে যেত, এর থেকে যে সূতা পাওয়া যেত তা **বয়নশিল্পী**, ধোপা এবং বস্ত্র রং করার শিল্পীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হত। ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক বিক্রি করার পূর্বে লণ্ডনে এর চূড়ান্ত রূপ (finishing) দেওয়া হত। লন্ডন বাস্তবিকই কাপড়ের চূড়ান্ত রূপদানকারী (finishing centre) কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এই আদি-শিল্পায়ন ব্যবস্থা এইভাবে বাণিজ্যিক বিনিময় ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক এর একটি অংশ ছিল। এটি ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং এই পণ্যগুলো কারখানায় নয় বরং তাদের পরিবারের খামারগুলোতে কাজ করে এমন বিশাল সংখ্যক উৎপাদনকারী দ্বারা তৈরি হয়েছিল। উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে ২০-২৫ জন শ্রমিক প্রত্যেক ব্যবসায়ী দ্বারা নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ শত শত শ্রমিক প্রত্যেক কাপড় ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করত।

নতুন শব্দ

স্টেপলার— এমন একজন ব্যক্তি যে পশমকে তন্তুর ধরণ অনুসারে স্টেপল বা শ্রেণি বিভক্তকরণ করতে পারে।

ফুলার (ধোপা)— একজন ব্যক্তি যে ধোয়— অর্থাৎ সংগ্রহ করে ... পোশাক ভাঁজ করে।

পেঁজা— একটি পদ্ধতি যার দ্বারা তন্তু যেমন সূতি বা পশম, প্রক্রিয়াজাতকরণের আগে প্রস্তুত করা হয়।

1.1 কারখানার আবির্ভাব

1730 এর দশকে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম কারখানা শুরু হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

নতুন যুগের প্রথম প্রতীক ছিল তুলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এর উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। 1760 খ্রিঃ ব্রিটেন তার কার্পাস শিল্পের জন্য 25 লক্ষ পাউন্ড কাঁচা তুলো আমদানি করে। 1787 খ্রিঃ এই আমদানি বৃদ্ধি পেয়ে 2 কোটি 20 লক্ষ পাউন্ড হয়। এই বৃদ্ধি উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কয়েকটি পরিবর্তনের সাথে যুক্ত ছিল। এই ধরনের কিছু পরিবর্তন সংক্ষেপে দেখা যাক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেকগুলো আবিষ্কার উৎপাদন প্রক্রিয়ার (পেঁজা, সূতা কাটা, বুনন এবং পাকানো) প্রতিটি ধাপের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। শ্রমিক প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি শ্রমিক আরও বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম হয় এবং তারা শক্তিশালী তন্তু ও সূতা উৎপাদনে সক্ষম হয়। রিচার্ড অর্করাইট একটি কটন মিল তৈরি করেন। তোমরা দেখেছো, এই সময় পর্যন্ত কাপড় উৎপাদন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে তা করা হতে থাকে। কিন্তু এই সময় ব্যয়বহুল মেশিন ক্রয়, কারখানার ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব ছিল। কারখানার সমস্ত প্রক্রিয়া

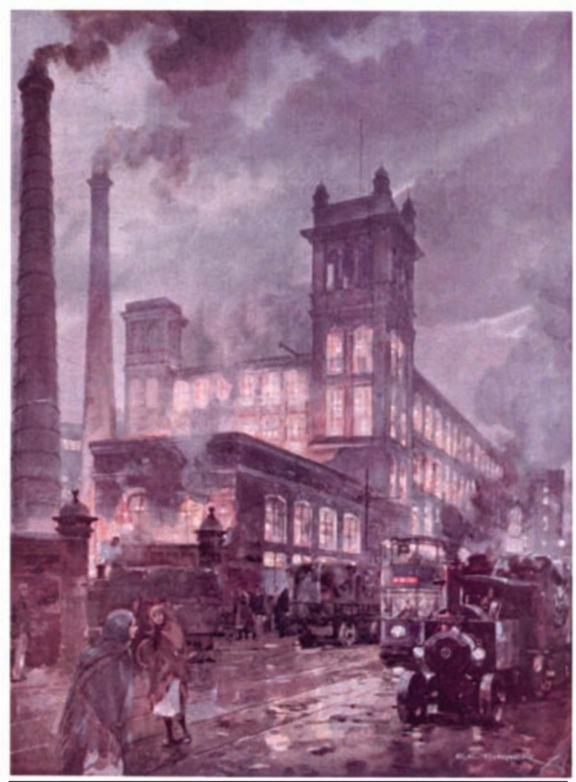

ছবি 4– 'The Illustrated London News' এ C.E. Turner এর আঁকা লঙ্কাশায়ার এর একটি কটন মিল।
চিত্রকার এর মতে, যদি আর্দ্র বায়ুমণ্ডলের দৃষ্টিতে দেখা যায়, যা লঙ্কাশায়ারকে বিশ্বের আদর্শ কার্পাস বুনন কেন্দ্রে পরিণত করে, তবে গোধূলিতে বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল বিশাল কটন মিল চিত্তাকর্ষকরূপে দেখা যায়।

এক ছাদের নিচে এবং এক ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা হয়। এই ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর আরো বেশি নজরদারী, গুণমান বজায় রাখা, শ্রমিকের কাজের উপর নজরদারী রাখা সম্ভব হয়। যখন গ্রামে এইসব উৎপাদন প্রক্রিয়া চলছিল, তখন এই কাজগুলো করা সহজ ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কারখানাগুলো দ্রুত গতিতে ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক মাণচিত্রের একটি অংশে পরিণত হয়। এই নতুন কারখানা, এই বিশাল এবং নতুন প্রযুক্তির শক্তি এতই জাদুকরী ছিল যে, তা তৎকালীন মানুষদের চোখ ঝলমলিয়ে (dazzled) দেয়। তারা গলিপথ এবং কারখানা যেগুলোতে তখনও উৎপাদন চলছিল সেগুলোর কথা প্রায় ভুলে গিয়ে মিলগুলোর উপর মনোনিবেশ করে।

কার্যাবলি

যে ভাবে ঐতিহাসিকরা ছোট ছোট কর্মশালার পরিবর্তে শিল্পায়নের উপর আলোকপাত করে, এটা একটা উত্তম উদাহরণ যে, আজ আমরা অতীত সম্পর্কে যা বিশ্বাস করি তা প্রভাবিত হয় ঐতিহাসিকরা কি লক্ষ্য করে বা কি উপেক্ষা করে তা চয়ন করেছে তার উপর। তুমি তোমার নিজের জীবনের একটি ঘটনা বা দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করো যা তোমার মাতা-পিতা বা শিক্ষকের মতো বড়োরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না, কিন্তু তুমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো।

ছবি 5 – 'The Illustrated London News' এ M. Jackson এর আঁকা শিল্পকারখানা ম্যাঞ্চেস্টার এর চিত্র।
ধোঁয়া বের হওয়া চিমনিগুলি শিল্প এলাকার বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল।

1.2 শিল্পে পরিবর্তনের গতি

শিল্পায়ন প্রক্রিয়া কতটা দ্রুতগতি সম্পন্ন ছিল? শিল্পায়ন বলতে কি শুধু কারখানা শিল্পের বিকাশকেই বোঝায়?

প্রথমত : ব্রিটেনের সবচেয়ে গতিশীল শিল্প স্পষ্টতই ছিল তুলো এবং ধাতুশিল্প। 1840 সাল পর্যন্ত দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে তুলো ছিল শীর্ষস্থানীয় ক্ষেত্র। পরে লোহা ও ইস্পাত শিল্প শিল্পায়নে গতি আনে। 1840 এর দশকে ইংল্যান্ডে এবং 1860 এর দশকে উপনিবেশগুলোতে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য লোহা ও ইস্পাতের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। 1873 সালের মধ্যে ব্রিটেনে 7 কোটি 70 লক্ষ পাউন্ড মূল্যের লোহা ও ইস্পাত রপ্তানি করে, যা তুলো রপ্তানি মূল্যের দ্বিগুণ ছিল।

কার্যাবলি

চিত্র 4 এবং 5 লক্ষ্য করো। তুমি দুটি চিত্রে শিল্পায়নকে প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো? সংক্ষিপ্তভাবে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

দ্বিতীয়ত : নতুন শিল্প খুব সহজে ঐতিহ্যবাহী শিল্পের স্থান দখল করতে পারেনি। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত শিল্প কারখানাগুলোতে 20% এর কম কর্মী নিযুক্ত ছিল। বস্ত্র শিল্প সবচেয়ে গতিশীল ক্ষেত্র ছিল কিন্তু এই উৎপাদনের একটি বড় অংশ কারখানায় নয় বরং ঘরোয়াভাবে উৎপাদিত হতে থাকে।

তৃতীয়ত : ঐতিহ্যগত শিল্পে পরিবর্তনের গতি বাষ্পচালিত কার্পাস বা ধাতু শিল্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, নির্মাণ, মৃৎশিল্প, কাঁচের কাজ, চর্মশিল্প, আসবাবপত্র তৈরি এবং উৎপাদন সরঞ্জাম এর মতো অনেক অ-যান্ত্রিক ক্ষেত্রে যে বিকাশ ঘটেছিল তা প্রধানত সাধারণ এবং ছোট ছোট আবিষ্কারের ফলেই হয়েছিল।

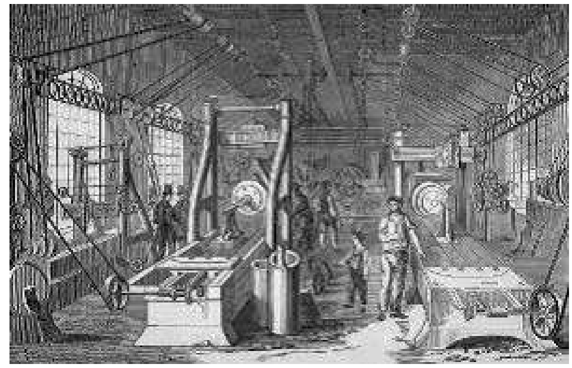

ছবি 6 – 'The Illustrated London News' এ প্রকাশিত ইংল্যান্ডে রেলের বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়ার কারখানা বা দোকান।
এই দোকানে নতুন গতিশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন তৈরি করা হত, আর পুরানো ইঞ্জিন মেরামত করা হত।

চতুর্থত : প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটেছে। শিল্পক্ষেত্রগুলোতে লক্ষণীয়ভাবে তা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েনি। নতুন প্রযুক্তি ব্যয় বহুল ছিল, তাই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতো। মেশিন প্রায়ই নষ্ট হত এবং তা মেরামত ছিল ব্যয়বহুল। এগুলো তাদের আবিষ্কারক বা নির্মাতাদের দাবিমত এতটা কার্যকর ছিল না।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের বিষয়টি আলোচনা করা যায়। নিউকামেন এর তৈরি করা ইঞ্জিনকে আরো উন্নত করেন জেমস্ ওয়াট এবং 1781 খ্রিঃ নতুন ইঞ্জিনের পেটেন্ট করিয়ে নেন। তার শিল্পপতি বন্ধু ম্যাথু বোল্টন এই নতুন মডেলের ইঞ্জিন তৈরি করেন। কিন্তু অনেক বছর তিনি কোন ক্রেতা পাননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সারা ইংল্যান্ডে 321টির বেশি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ছিল না। এর মধ্যে কার্পাস শিল্প কারখানায় 80টি, পশম কারখানায় 9টি এবং বাকীগুলো খনি, খাল নির্মাণ এবং লৌহ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এই শতাব্দীর অনেক পরে পর্যন্ত অন্যান্য শিল্পে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার হয়নি। তাই সেই নতুন প্রযুক্তিও শিল্পপতিরা সহজে গ্রহণ করেনি, যা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারত।

ঐতিহাসিকরা বর্তমানে ক্রমান্বয়ে স্বীকার করেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একজন আদর্শ শ্রমিক যন্ত্রচালক ছিলেন না, বরং একজন ঐতিহ্যবাহী কারিগর বা শ্রমিক ছিলেন।

ছবি 7 – 1830 খ্রিঃ এক বয়ন শিল্প কারখানা।
তোমরা দেখতে পাচ্ছো কীভাবে বাষ্পশক্তি দ্বারা চালিত দৈত্যকার চাকা একসাথে শত শত সূতাকাটার টাকুকে (Spindles) চালিত করতে পারে।

2 কায়িক শ্রম ও বাষ্পশক্তি

ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ব্রিটেনের শ্রমিকের কোন অভাব ছিল না। গরিব কৃষক এবং যাযাবর লোকেরা ব্যাপক সংখ্যায় কাজের সন্ধানে শহরে ঘুরে বেড়াতো। তোমরা জানো শ্রমিকের যোগান বেশি হলে মজুরি হ্রাস পায়। তাই শিল্পপতিদের জন্য শ্রমিকের ঘাটতি বা উচ্চ মজুরির খরচের সমস্যা ছিল না। তাই যার দ্বারা শ্রমিকরা পরিত্রাণ পেতে পারে এবং যেখানে বড় পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়— এই ধরনের মেশিনের সূত্রপাত তারা করতে চাননি।

অনেক কারখানায় শ্রমিকের চাহিদা ছিল মরশুমি। ঠাণ্ডার মাসগুলোতে গ্যাসের কাজ এবং ভাঁটিখানায় (breweries) প্রচুর কাজ ছিল। তাই তাদের সর্বোচ্চ চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। খ্রিস্টমাসের সময়ে খাদ্য পরিবেশন এবং এই বাঁধাই করা এবং প্রিন্টিং এও প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হত। নদী, সরোবর ইত্যাদির সন্নিহিত শহরাঞ্চলেও ঠাণ্ডার দিনে জাহাজ মেরামত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হত। যে সব কারখানায় মরশুম অনুসারে উৎপাদনে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে সেইসব স্থানে শিল্পপতিরা মেশিনের পরিবর্তে শ্রমিকদের হাতে কাজ করানোই পছন্দ করতেন।

কিছু কিছু দ্রব্য শুধুমাত্র হাতেই তৈরি সম্ভব হত। মেশিনে একই ধরনের উৎপাদিত

ছবি 8 – কাজের খোঁজে ঘোরাফেরা করা লোক ***'The Illustrated London News' 1879***
কিছু কিছু মানুষ ছোট ছোট জিনিস-পত্র বিক্রি করার জন্য এবং অস্থায়ী কাজ খোঁজার জন্য সবসময় বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতো।

দ্রব্য বিপুল সংখ্যক বাজারের জন্য তৈরি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু বাজারে বেশিরভাগ একটু আলাদা রকমের নক্‌শা এবং বিশেষ আকারের জিনিস দামি ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটেনে 500 রকমের হাতুড়ি ও 45 রকমের কুড়াল তৈরি হত।

উৎস (ক)

উইল থর্ন ঋতু অনুসারে কাজের খোঁজ করা একজন লোক ছিলেন, তিনি ইট বোঝাই ও অন্যান্য কাজ করতেন। কাজের সন্ধানকারীরা লন্ডনে কিভাবে কাজের খোঁজ করত তা তিনি বর্ণনা করেন :

আমি সবসময় লন্ডনে যেতে চেয়েছিলাম এবং আমার ইচ্ছা— এক পুরানো সহকর্মীর চিঠির দ্বারা তা আরো উদ্দীপিত হয়.. সে ওল্ড কেন্ট (old kent) এ গ্যাস এর কাজ করত... আমি শেষ পর্যন্ত 1881 খ্রিঃ নভেম্বরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম... আমরা হয়ত চাকুরী জোগাড় করতে পারব এই আশা নিয়ে দুই বন্ধু সহ আমি যাত্রা শুরু করি। আমার বন্ধুর আন্তরিক সহযোগিতায় যখন আমরা সেখানে পৌঁছাই... যখন আমরা বেরিয়েছিলাম আমাদের কাছে অর্থ খুব কম ছিল, লন্ডনে পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের খাবার ও রাত্রি যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না, কিছুদিন আমরা গড়ে 20 মাইল পর্যন্ত হেঁটে চলেছি আর কিছুদিন হয়তো একটু কম। তৃতীয় দিনে আমাদের অর্থ শেষ হয়ে যায়। দুই রাত্র আমরা বাইরে কাটিয়েছি— একবার খড়ের গাঁদার নিচে আর একবার পুরোনো খামারের ভিতর। লন্ডন পৌঁছানোর পর আমরা আমাদের বন্ধুকে খোঁজার চেস্টা করি... কিন্তু অসফল হই। অর্থ তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই অনেক রাত্র পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না, এবং ঘুমানোর জন্য আমরা জায়গা খোঁজার চেস্টা করলাম, আমরা একটা পুরোনো বিল্ডিং দেখতে পেলাম এবং সেখানে রাত্রিযাপন করলাম। পরেরদিন রবিবার, বিকেল বেলা আমরা ওল্ড কেন্ট গ্যাস ওয়ার্ক এ পৌঁছাই, সেখানে আমরা কাজ পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করি, আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে, আমরা যাকে খুঁজছিলাম সে, সেই সময় সেখানে কাজ করছিল, সে ফোরম্যান এর সাথে কথা বলল এবং আমাকে একটা কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিল।

H.J. Dyos এবং Michael Wolff এর *The Victorian City: Images and Realities*, 1973 এ রাফেল স্যামুয়েল এর লেখা 'Comers and Goers' থেকে উদ্ধৃত।

কার্যাবলি

কল্পনা কর যে তুমি একজন ব্যবসায়ী। একজন সেলসম্যানকে তুমি পাল্টা পত্র লিখছ যে তোমাকে নতুন মেশিন কেনার জন্য প্ররোচিত করার চেস্টা করছে। তুমি চিঠিতে ব্যাখ্যা কর যে তুমি কি শুনেছ এবং কেন তুমি নতুন প্রযুক্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে চাও না।

এগুলো তৈরি করতে যান্ত্রিক প্রযুক্তির পরিবর্তে মানুষের হাতের নিপুণতা প্রয়োজন ছিল।

ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ব্রিটেনে উচ্চ শ্রেণির অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণির লোকেরা— হাতের তৈরি জিনিস পছন্দ করত। হাতের তৈরি জিনিসকে পরিমার্জিত ও সুরুচির প্রতীক মানা হতো। এই জিনিসগুলোর কাজ নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ করা হতো, যত্নপূর্বক পৃথক পৃথক নক্‌শা করে তৈরি করা হতো।

যেসব দেশে শ্রমিকের যোগান কম ছিল সেখানে শিল্পপতিরা মেশিনের শক্তি ব্যবহার করতে চাইতো যাতে শ্রমিকের কায়িক শক্তি কম ব্যবহার করতে হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাতে এই ধরনের পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু ব্রিটেনের শ্রমিক নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না।

ছবি 9 – 1861 সালে উইলিয়াম বেল স্কটের আঁকা চিত্রে, উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের একটি লোহার কারখানার কর্মীরা।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অনেক চিত্রকার শ্রমিকদের আদর্শ হিসেবে দেখাতে শুরু করেন। দেশের জন্য তারা কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে— এইসব চিত্রে প্রদর্শিত হয়।

2.1 শ্রমিকদের জীবনযাত্রা

বাজারে শ্রমের প্রাচুর্য শ্রমিকদের জীবনকেও প্রভাবিত করে। সম্ভাব্য চাকুরির খবর গ্রামে গিয়ে পৌঁছালে শত শত লোক শহরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চাকুরি পাওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের যোগাযোগের উপর নির্ভরশীল ছিল। যদি কোন কারখানায় কারো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন থাকে তবে চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সবার এই ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ছিল না, অনেক চাকুরি প্রত্যাশিকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হতো, কোন সেতুর নীচে বা রাতের আশ্রয়স্থলে রাত্রিযাপন করতে হতো।

ছবি 10 – 1878 স্যামুয়েল লিউক ফিলডার্স কর্তৃক অঙ্কিত গৃহহীন ও ক্ষুধার্ত মানুষদের চিত্র।
এই চিত্রতে দেখানো হয়েছে একটি ওয়ার্ক হাউসে রাত্রি যাপনের জন্য লোকেরা আবেদনপত্র জমা করছে। এই আশ্রয়স্থলগুলো নিঃস্ব, পথভ্রষ্ট, পর্যটক ও অজ্ঞাত পরিচয় শিশুদের জন্য Poor Law Commissioners (দরিদ্র আইন কমিশনারের) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। এই ওয়ার্ক হাউজগুলোতে থাকা অপমানজনক ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে রোগ আছে কি না তা দেখার জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা করা হত, তাদের শরীর এবং পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা তাও খতিয়ে দেখা হত। তাদের কঠোর পরিশ্রমও করতে হতো।

কেউ কেউ রাত্রিযাপনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তৈরি আশ্রয়স্থলগুলিতেও থাকতেন। অনেকে দরিদ্র আইন কর্তৃপক্ষের (Poor Law authority) দ্বারা পরিচালিত অস্থায়ী আশ্রয়স্থলেও থাকতেন।

যেসব কারখানা মরশুমি কাজের জন্য ছিল সেখানে অনেক সময়ই শ্রমিকদের বেকার হিসেবে কাটাতে হতো। কাজের ব্যস্ততম সময় চলে যাওয়ার পর গরিব লোকেরা আবার অসহায় হয়ে পড়ত। গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে শীতের শেষে অনেকে গ্রামে ফিরে যেত, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই শহরে বিভিন্ন কাজ খুঁজে বেড়াত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত এই কাজ পাওয়াও কঠিন ছিল।

ঊনিশ শতকের প্রথমদিকে মজুরি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর দ্বারা শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। গড় পরিসংখ্যান— বাণিজ্যের বৈচিত্র্যতা এবং বছর বছর বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে লুকিয়ে ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নেপোলিয়নের দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে দ্রব্য মূল্যের দাম হ্রাস পেলে শ্রমিকদের আয়ের বাস্তবিক মূল্য হ্রাস পায়। উল্লেখযোগ্য যে, তাদের মজুরি পূর্বের মতো থাকলেও খুব অল্প পরিমাণ জিনিস ক্রয় করার ক্ষমতাই তাদের ছিল। তাছাড়া শ্রমিকদের আয় শুধু মজুরির হারের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কর্মসংস্থানের সময়টিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রমিকদের কাজের দিনের সংখ্যা অনুসারে তাদের গড় দৈনিক আয় নির্ধারিত হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সবচেয়ে ভাল সময়েও শহরের জনসংখ্যার প্রায় 10 শতাংশ অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। 1830 এর দশকে অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও বিভিন্ন অঞ্চলে বেকারদের সংখ্যা 35 থেকে 75 শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

বেকারত্বের ভয়ে শ্রমিকরা নতুন প্রযুক্তির প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন ছিল।

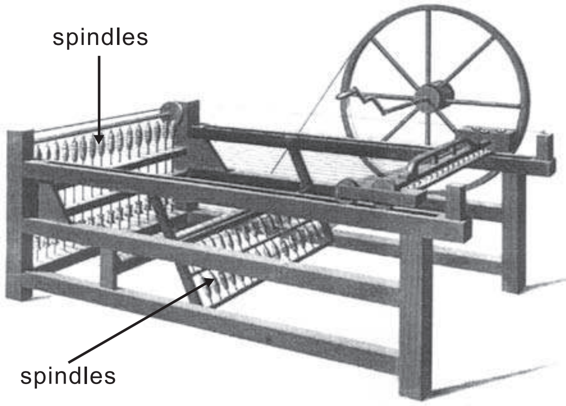

ছবি 11 – 1835 খ্রিঃ টি.ই. নিকোলসন এর আঁকা স্পিনিং জেনি। *লক্ষ্য কর কতগুলো সুতাকাটার টাকু একটি চাকা দিয়ে ঘোরানো হত।*

নতুন শব্দ

স্পিনিং জেনি— 1764 খ্রিঃ জেমস্ হারগ্রেভস্ এর তৈরি এই মেশিন সূতা কাটার প্রক্রিয়ায় গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল, আর শ্রমিকের চাহিদা কমিয়ে দিয়েছিল। এতে একটি চাকা ঘুরাতো এমন একজন শ্রমিক যে এই মেশিনে অনেকগুলো টাকু একসাথে ঘুরাতে পারত এবং এক সাথে কয়েকটি সূতা তৈরি করতে পারত।

উৎস (খ)

1790 সালে একজন ম্যাজিস্ট্রেট একটি ঘটনার বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন যখন এক উৎপাদনকারীর সম্পত্তি শ্রমিকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছিল। প্রথমে তারা ঔদ্ধত্য মনোভাবের সঙ্গে এগিয়ে আসে। তারা পশম কারখানায় সম্প্রতি ব্যবহার করা মেশিনগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার উদ্দেশ্যে শপথ নেয়। তারা মনে করে এই সব মেশিন চলতে থাকলে কায়িক শ্রমের চাহিদা কমে যাবে। মহিলারা গণ্ডগোল শুরু করে। পুরুষদের সঙ্গে আলোচনা করা সহজ ছিল এবং সামান্য প্রতিবাদের পর তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত করে শান্তিপূর্ণভাবে বাড়িতে ফিরে যেতে রাজি করা হয়।

J.L. Hammond and B. Hammond, *The Skilled Labourer 1760-1832*, *The Age of Manufactures* এ প্রকাশিত।

আলোচনা কর :

চিত্র 3, 7 এবং 11 দেখো। এরপর উৎস খ পুনরায় পড়ো। ব্যাখ্যা কর কেন বেশিরভাগ শ্রমিক স্পিনিং জেনি ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিল?

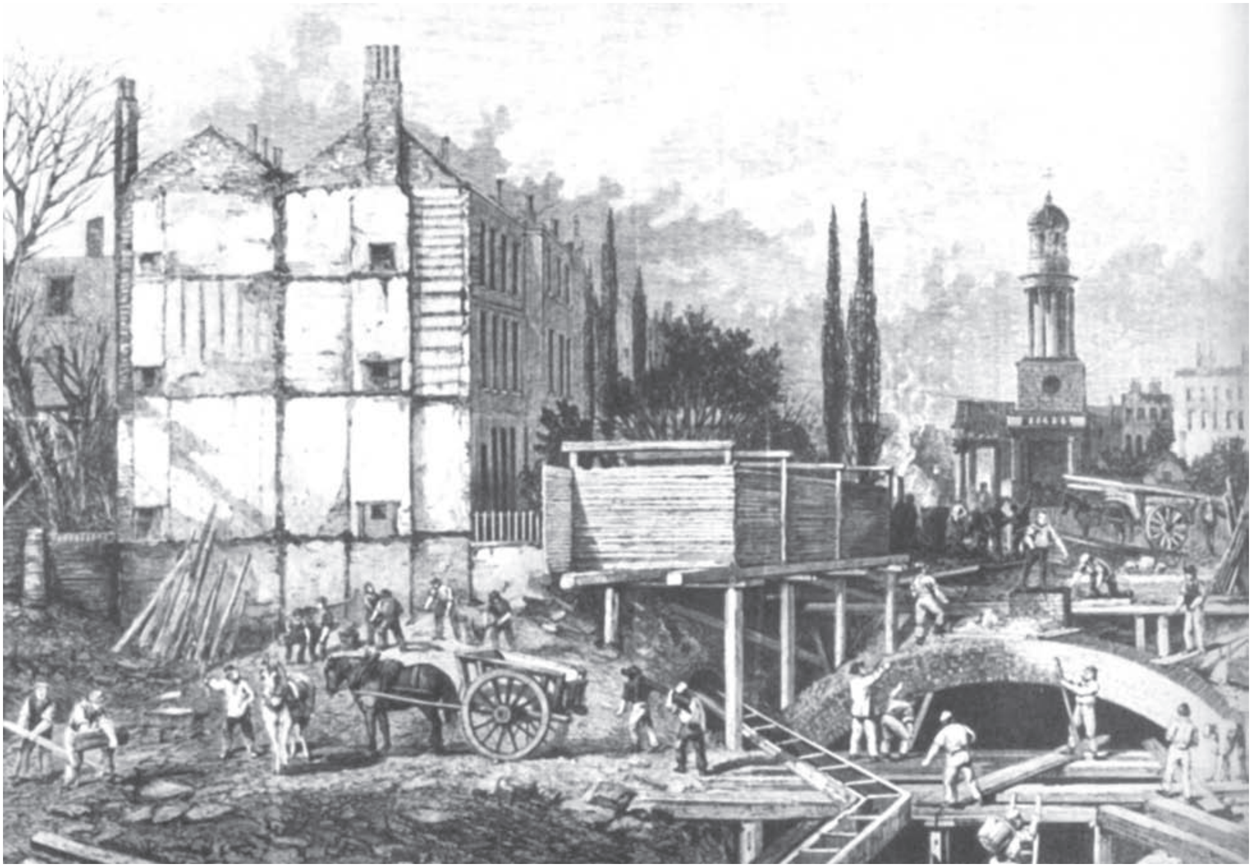

ছবি 12 – মধ্য লন্ডনে নির্মিত একটি অগভীর ভূগর্ভস্থ রেলপথ, 1868 খ্রিঃ 'The Illustrated London News' এ প্রকাশিত।
1850 এর দশকে লন্ডন জুড়ে রেলস্টেশন তৈরি হতে শুরু করে। ফলে সুড়ঙ্গ করার জন্য কাঠের কাঠামো সোজা করার জন্য, ইট ও লোহার কাজ করার জন্য ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। চাকুরি প্রার্থীরা এক নির্মাণ স্থল থেকে অন্য নির্মাণ স্থলে ঘোরাফেরা করে।

পশম শিল্পে স্পিনিং জেনির ব্যবহার শুরু হলে যারা হাতে পশম কাটত, সেইসব মহিলারা নতুন মেশিনের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। স্পিনিং জেনির ব্যবহার শুরু হলে এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

1880 এর দশকের পর শহরগুলোতে ভবন নির্মাণ বেড়ে যায়। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। রাস্তা বিস্তৃত করা হয়। নতুন নতুন রেল স্টেশন গড়ে তোলা হয়। রেলপথের বিস্তার ঘটানো হয়, সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়, নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী তৈরি করা হয়, নদীতে বাঁধ তৈরি করা হয়। পরিবহণ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা 1840 এর দশকে দ্বিগুণ হয় এবং পরবর্তী 30 বছরে তা আরও দ্বিগুণ হয়।

3 উপনিবেশগুলিতে শিল্পায়ন

চলো আমরা ভারতের দিকে লক্ষ্য করি একটি উপনিবেশে কীভাবে শিল্পায়ন হয়। আরও একবার আমরা কেবলমাত্র শিল্প কারখানার দিকে লক্ষ্য করব না। এর পাশাপাশি অযান্ত্রিক ক্ষেত্রের দিকেও লক্ষ্য, করব আমাদের আলোচনা প্রধানত বস্ত্র শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

3.1 ভারতীয় বস্ত্রের যুগ

যন্ত্র শিল্পের যুগের আগে ভারতের রেশম এবং সুতির পণ্য বয়ন শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করত। মোটা তুলো অনেক দেশেই উৎপাদিত হত কিন্তু সুক্ষ্ম জাতের তুলো প্রায়শই ভারত থেকে আসত। আর্মেনিয়া এবং পার্সিয়ার ব্যবসায়ীগণ পাঞ্জাব থেকে আফগানিস্থান, পার্সিয়ার পূর্বাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ায় পণ্য সামগ্রী নিয়ে যেতো। মিহি কাপড়ের থান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হয়ে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে এবং মরুভূমি দিয়ে উটের পিঠে বহন করে নেওয়া হত। মুখ্য প্রাক্ ঔপনিবেশিক বন্দরগুলোর মাধ্যমে গতিশীল সমুদ্র বাণিজ্য চলত। গুজরাটের সুরাট বন্দর ভারতকে উপসাগর এবং লোহিত সাগরের বন্দরগুলোর সঙ্গো যুক্ত করে করমণ্ডল বন্দরের মসুলিপতম এবং বাংলায় হুগলির সঙ্গো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

রপ্তানি বাণিজ্যের এই নেটওয়ার্কের সঙ্গো বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় বণিক এবং মহাজনগণ যুক্ত ছিলেন। তারা উৎপাদনের পুঁজি লগ্নি করেন। পণ্য সামগ্রী পরিবহণ করেন এবং রপ্তানিকারকদের যোগান দেন। পণ্য যোগানকারী বণিকদের মাধ্যমে বন্দর শহরের সঙ্গো অভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলো যুক্ত ছিল। তারা তাঁতিদের দাদন দিতেন। গ্রামগুলো থেকে তৈরি কাপড় সংগ্রহ করতেন এবং বন্দরগুলোতে এগুলো পৌঁছিয়ে দিতেন। বন্দরে বড় বড় জাহাজের মালিক এবং রপ্তানিকারী বণিকদের দালাল ছিল যারা দর কষাকষি করত এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় নিযুক্ত যোগাযোগকারী বণিকদের কাছ থেকে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করত।

1750 এর দশক পর্যন্ত ভারতীয় বণিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়ছিল।

ধীরে ধীরে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর শক্তি বৃদ্ধি পায়— প্রথমেই তারা স্থানীয় শাসকদের থেকে বিভিন্ন প্রকারের ছাড় নিশ্চিত করে, তারপর ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার আদায় করে। এর ফলে স্থানীয় বণিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুরনো বন্দর সুরাট এবং হুগলির পতন হয়। এই বন্দরগুলো থেকে রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। পূর্বে যে ঋণ থেকে বাণিজ্য চলত সেটা ধ্বংস হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে স্থানীয় মহাজনরা দেউলিয়া হতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের বছরগুলোতে সুরাট বন্দরের মাধ্যমে হওয়া ব্যবসার সার্বিক মূল্য ছিল 1 কোটি 60 লক্ষ টাকা। 1740 এর দশকের মধ্যে এই অঙ্ক কমে গিয়ে দাঁড়ায় 30 লক্ষে।

কার্যাবলি

এশিয়ার মানচিত্রে ভারত থেকে মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বস্ত্র বাণিজ্যের সমুদ্র এবং স্থল পথের চিহ্নিত কর।

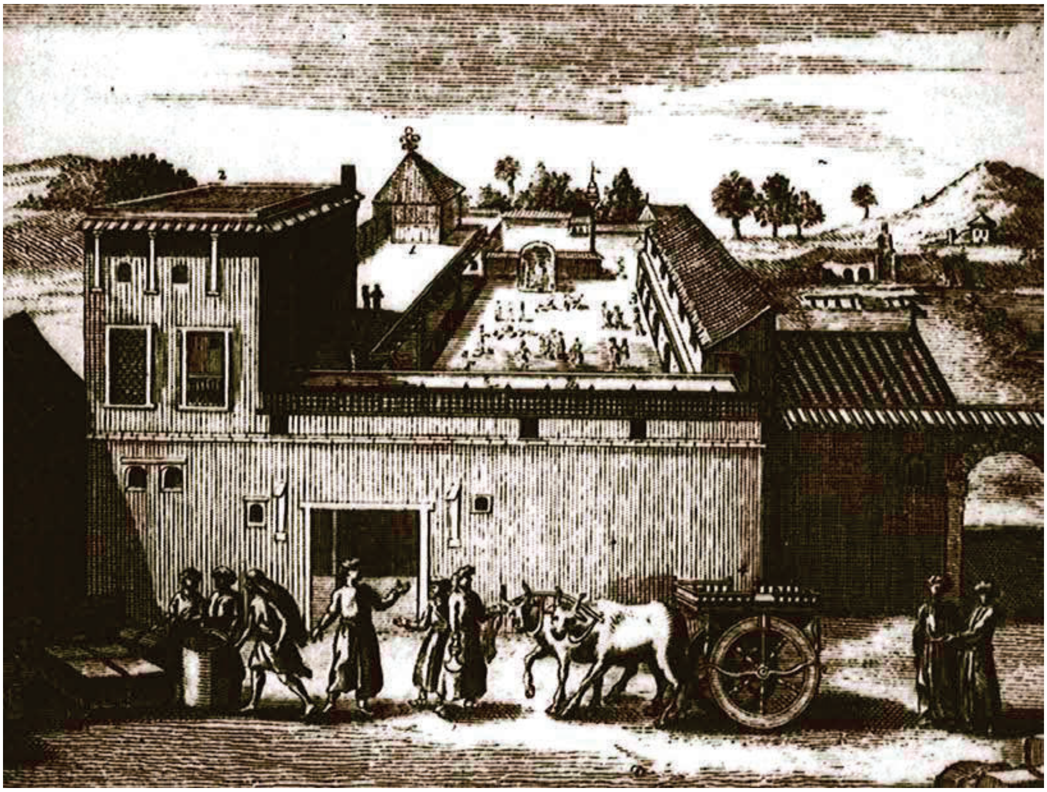

ছবি 13 – সুরাটে ব্রিটিশ কারখানা, সপ্তদশ শতাব্দীর একটি চিত্র।

যখন সুরাট এবং হুগলি পতনের দিকে ধাবিত হয় তখন বোম্বাই এবং কলিকাতা বেড়ে উঠে। পুরনো বন্দর থেকে নতুন বন্দরে স্থানান্তরিত হওয়াটা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি বৃদ্ধির একটি সূচক। নতুন বন্দরের মাধ্যমে চলা ব্যবসা ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ইউরোপীয় জাহাজগুলোর মাধ্যমেই এটা হত, যেখানে অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ধসে পড়ে। যারা বেঁচে থাকতে চেয়েছিল তাদেরকে ইউরোপীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর তৈরি করা নেটওয়ার্কের মধ্যে থেকে কাজ করতে হত।

এই পরিবর্তনগুলো তাঁতি এবং অন্যান্য কারিগরদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

3.2 তাঁতিদের কী হয়েছিল?

1760 এর দশকের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার শুরুতে ভারতের বস্ত্র রপ্তানি হ্রাস পায়নি। ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্পের তখনও প্রসার ঘটেনি এবং ইউরোপে ভারতীয় সুক্ষ্ম কাপড়ের প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। সুতরাং কোম্পানি ভারত থেকে বস্ত্র রপ্তানি প্রসারে উৎসাহি ছিল।

রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পূর্বে 1760 এবং 1770 এর দশকে বাংলা এবং কর্ণাটকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি করার জন্য পণ্য দ্রব্যের নিশ্চিত নিয়মিত যোগান কষ্ট

ছবি 14 – গুজরাটে একজন তাঁতি কাজে ব্যস্ত।

সাধ্য ছিল। বোনা কাপড়কে আয়ত্তে আনার জন্য ফরাসি, ডাচ, পর্তুগিজদের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও বাজারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। সুতরাং তাঁতি এবং সরবরাহকারী ব্যবসায়ীগণ দর কষাকষি করতে পারত এবং উচ্চ মূল্যের ক্রেতার কাছে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করার চেষ্টা করত। লন্ডনে প্রেরণ করা তাদের পত্রে কোম্পানির আধিকারিকগণ যোগান এবং অধিকমূল্যজনিত অসুবিধার ক্রমাগত অভিযোগ জানাতে থাকে।

যাই হোক, একবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে কোম্পানি বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার জাহির করতে পারত। সে প্রতিযোগিতা নির্মূলকরণ, ব্যয়সংকোচ এবং সূতি ও রেশম বস্ত্রের নিয়মিত যোগান সুনিশ্চিত করার জন্য পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

প্রথম : কোম্পানী বস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী এবং দালালদের নির্মূল করার চেষ্টা করে এবং তাঁতিদের উপর আরও বেশি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। সে তাঁতিদের তত্ত্বাবধান, যোগান সংগ্রহ এবং বস্ত্রের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য গোমস্তা নামে বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত করে।

দ্বিতীয় : এটা কোম্পানির তাঁতিদের অন্য ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যবসা করা থেকে বিরত রেখেছিল। এরকম করার একটি উপায় হল দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা। একবার কাজের বরাত পাওয়ার পর উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য তাঁতিদের ঋণ দেওয়া হত। যারা ঋণ নিত তাদের উৎপাদিত বস্ত্র গোমস্তার কাছেই দিতে হত। তারা একে অন্য ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতে পারত না।

ঋণের সহজলভ্যতা, সূক্ষ্ম কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে আরও বেশি উপার্জনের আশায় তাঁতিরা সাগ্রহে দাদন নিতে থাকে। অনেক তাঁতিদের কাছে ছোট জমির খণ্ড ছিল, যেখানে তারা আগে কাপড় বোনার সাথে সাথে চাষবাসও করত এবং এই উৎপাদন থেকে তারা তাদের পরিবারের প্রায়োজন মেটাত। এখন তারা এই জমি ইজারা দিয়ে পুরো সময় বোনার কাজে মনোনিবেশ করে। আসলে বোনার কাজে শিশু এবং মহিলা সহ পুরো পরিবারের শ্রমের দরকার এবং তারা সবাই এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত থাকে।

যা হোক, শীঘ্রই তাঁতিদের অনেক গ্রাম থেকে তাঁতি এবং গোমস্তাদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর আসতে থাকে। পূর্বে যোগানকারী ব্যবসায়ীগণ প্রায়শই তাঁতিদের গ্রামগুলোতে থাকতেন এবং তাঁতিদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকত। তাঁরা তাঁতিদের বিভিন্ন প্রয়োজনের খোঁজ খবর রাখতেন এবং সংকটের সময় তাদের সাহায্য করতেন। নতুন গোমস্তারা ছিলেন বাইরের লোক। গ্রামের সঙ্গে তাদের দীর্ঘকালীন সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। তারা অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করত; সিপাহী এবং চাপরাশিদের নিয়ে গ্রামে ঢুকত এবং যোগান দেরি করার জন্য তাঁতিদের সাজা দিত— প্রায়শই তাদের মারধর করত এবং চাবুক দিয়ে মারত। তাঁতিরা মূল্যের জন্য দর কষাকষি করার সুযোগ হারিয়েছিল এবং অন্যান্য ক্রেতাদের কাছেও বিক্রি করতে পারত না। কোম্পানির কাছ থেকে যে মূল্য পেত সেটা ছিল খুবই কম এবং ঋণ গ্রহণ করায় কোম্পানির কাছে তারা দায়বদ্ধ।

নতুন শব্দাবলী

সিপাই— সিপাহী শব্দটাকে ব্রিটিশগণ এভাবেই উচ্চারণ করতেন। এর মানে হল ব্রিটিশের অধীনে কর্মরত একজন ভারতীয় সৈনিক।

কর্ণাটক এবং বাংলার অনেক জায়গায় তাঁতিরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তারা অন্য গ্রামগুলোতে যেখানে তাদের পরিবারের কিছু আত্মীয় স্বজন রয়েছে সেখানে বয়নযন্ত্র স্থাপন করে। অনেক স্থানেই তাঁতিরা গ্রামের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলে কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। নির্দিষ্ট সময়কালের পরে অনেক তাঁতিরা ঋণ ফেরত দিতে অস্বীকার করতে শুরু করে, কারখানা বন্ধ করে দেয় এবং কৃষিজাত শ্রমিকে পরিণত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে তাঁতিরা নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

3.3 ম্যানচেস্টারের ভারতে আগমন

1772 সালে কোম্পানির অফিসার হেনরি পটুলো বলেছিলেন যে, ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা কখনই কম হতে পারে না কারণ অন্য কোন দেশে একই রকম গুণগত মানের দ্রব্য উৎপাদিত হয় না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারত থেকে কাপড়ের রপ্তানি কমতে শুরু হয় যা অনেক সময় ধরে চলতে থাকে। 1811-12 সালে ভারতের রপ্তানির 33 শতাংশ ছিল সুতিবস্ত্র। 1850-51 সালে এটা 3 শতাংশের বেশি ছিল না।

কেন এটা ঘটেছিল? এর প্রভাবগুলো কী কী ছিল?

যখন ইংল্যান্ডে সুতিবস্ত্র শিল্প বিকশিত হয়, শিল্পপতিরা অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারা সুতিবস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক আরোপ করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। যাতে আমাদানিকৃত সামগ্রীর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন ছাড়াই ব্রিটেনে ম্যানচেস্টারের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করতে পারে। একই সময়ে শিল্পপতিরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতের বাজারগুলোতে ব্রিটিশ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করতে উৎসাহিত করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্রের রপ্তানি অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে সুতি বস্ত্রের আমদানি প্রায় হতই না। কিন্তু 1850 এর মধ্যেই সুতিবস্ত্রের আমদানির মোট মূল্যের 31 শতাংশে পরিণত হয়। 1870 এর মধ্যে এই পরিসংখ্যান 50 শতাংশের উপর চলে যায়।

এভাবে ভারতে তাঁতিরা একই সময়ে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের রপ্তানি বাজার ধসে পড়ে এবং স্থানীয় বাজার সংকুচিত হয়, ম্যানচেস্টারের আমদানিকৃত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। খুব কম খরচে যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদিত হওয়া আমদানিকৃত সুতিবস্ত্রগুলো এত সস্তা ছিল যে, তাঁতিরা তাদের সঙ্গে সহজে টক্কর দিতে পারত না। 1850 এর মধ্যে ভারতের অধিকাংশ তাঁতিদের এলাকা থেকে পাওয়া প্রতিবেদনে পতন ও ক্ষয়ক্ষতির বিভিন্ন গল্প বর্ণিত হয়।

উৎস (গ)

পাটনা কমিশনার লিখেন :

'মনে হয় কুড়ি বছর আগে জাহানাবাদ ও বিহারে বস্ত্র উৎপাদন ব্যাপক আকারে হত। জাহানাবাদে এই উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিহারে এই উৎপাদন খুব সীমিত হয়ে পড়ে। ম্যানচেস্টার থেকে সস্তা এবং টেকসই দ্রব্যসামগ্রী আসার ফলে স্থানীয় উৎপাদকরা এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষম ছিল।

জে কৃষ্ণমূর্তির 'দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইন গঙ্গেটিক বিহার ডিওরিং দ্য নাইটিন্থ্ সেঞ্চুরি', দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমিক এন্ড সোসিয়াল হিস্টরি রিভিও, 1985 প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

উৎস (ঘ)

সেন্সাস রিপোর্ট অফ সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস-এ তাঁতিদের সম্প্রদায় 'কোষ্টি'র উপর প্রতিবেদন বর্ণিত হয় :

ভারতের অন্যান্য অংশে সুক্ষ্ম কাপড় তৈরি করা তাঁতিদের মত কোস্টিদেরও দুঃসময় চলছিল। তারা ম্যানচেস্টার থেকে প্রচুর পরিমাণে আসা চটকদার দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষম ছিল। তাদের এক বড় সংখ্যা শেষের বছরগুলোতে প্রবাসিত হয়। বিশেষত বেরারে যেখানে তারা দিনমজুর হিসাবে মজুরি উপার্জন করতে সক্ষম...

সেন্সাস রিপোর্ট অফ সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস্ 1872 সুমিত গুহ, 'দ্য হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি ইন সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, 1825-1950', দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমিক এন্ড সোসিয়াল হিস্টরি রিভিওতে উদ্ধৃত।

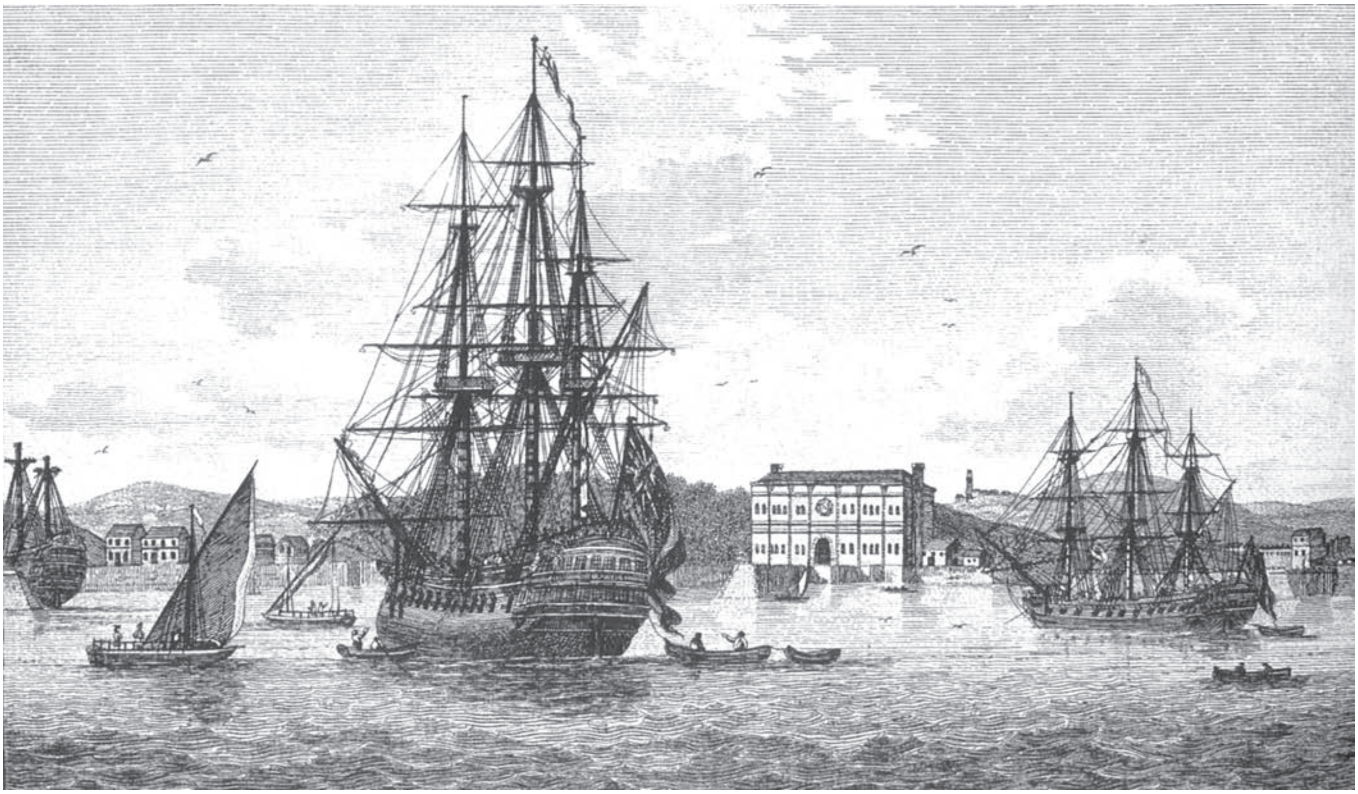

ছবি 15 – বোম্বে হার্বার, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের চিত্র।
1780 এর দশকের পর থেকে বোম্বে এবং কলিকাতা ব্যবসায়িক বন্দর হিসাবে বিকশিত হয়। এটা পুরনো ব্যবসায়িক বন্দর হিসাবে বিকশিত হয়। এটা পুরনো ব্যবসায়িক ব্যবস্থার পতন ও উপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশকে চিহ্নিত করেছিল।

1860-এর মধ্যে তাঁতিরা নতুন এক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা ভাল গুণমান সম্পন্ন তুলার পর্যাপ্ত যোগান পেত না। যখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং আমেরিকা থেকে তুলা যোগান বন্ধ হয়। তখন ইংল্যান্ড ভারতের দিকে ঝুকে পড়ে। ভারত থেকে কাঁচা তুলার রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে এর দাম বেড়ে যায়। ভারতে তাঁতিদের মধ্যে কাঁচা তুলার যোগানের জন্য হাহাকার পড়ে যায় এবং অত্যধিক মূল্যে তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় বয়ন শিল্প তাদের জীবনধারনের প্রয়োজনীয় রসদ যোগাতে পারেনি।

এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁতি এবং অন্যান্য শিল্প কাজে নিযুক্ত কারিগররা অপর আরেকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতে কারখানায় উৎপাদন শুরু হয় এবং যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যে বাজার ছেয়ে যায়। কীভাবে বয়নশিল্প টিকে থাকা সম্ভব?

4 কারখানার সূত্রপাত

বোম্বেতে প্রথম কাপড়ের মিল 1854 সালে স্থাপিত হয় এবং এর দুবছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু হয়। 1862 সালের মধ্যে চারটি মিল কাজ করছিল যেখানে 94000 চরকার টাকু এবং 2150টি তাঁত ছিল। একই সময় বাংলায় পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথমটি 1855 সালে এবং এর সাত বছর পর অপর আরেকটি 1862 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 1860 এর দশকে উত্তর ভারতে কানপুরে এলগিন মিল চালু হয় এবং এক বছর পরে আহমেদাবাদে প্রথম বস্ত্র কারখানা চালু হয়। 1878 সালের মধ্যে মাদ্রাজে কারখানায় প্রথম সুতা কাটা এবং বয়ন শুরু হয়ে যায়।

এই শিল্পগুলো কে প্রতিষ্ঠা করেছিল? কোথা থেকে পুঁজি এসেছিল? মিলে কাজ করার জন্য কারা এসেছিল?

ছবি 16 – জামশেদজী জীজীভাই।
জীজীভাই ছিলেন একজন পার্সী তাঁতির সন্তান। তাঁর সময়ের অন্য অনেক লোকের মত তিনি চীনা ব্যবসা এবং জাহাজযোগে মাল আদান-প্রদানের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব এক বিরাট বড় জাহাজের বহর ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার জাহাজ কোম্পানীগুলোর প্রতিযোগিতায় তাঁকে 1850 সালের মধ্যে জাহাজগুলো বিক্রি করতে বাধ্য করেছিল।

4.1 প্রারম্ভিক শিল্প উদ্যোগ

বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন লোক শিল্প স্থাপন করে। চলো দেখি তারা কারা।

অনেক বণিকগোষ্ঠীর ইতিহাস বহু আগে থেকেই চীনের সঙ্গে জড়িত। তোমরা জান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে ব্রিটিশরা চীনে আফিমের রপ্তানি শুরু করে এবং চীন থেকে চা ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। এই ব্যবসায় অনেক ভারতীয় নতুন ব্যবসায়ী হিসাবে এসেছিল যারা অর্থ যোগাত, মালের যোগান সুনিশ্চিত করত এবং জাহাজের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য আনা-নেওয়া করত। বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জনের পর তাদের মধ্যে কিছু ব্যবসায়ী ভারতে শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বাংলার দ্বারকানাথ ঠাকুর শিল্প বিনিয়োগে পরিণত হওয়ার আগে চীনা বাণিজ্যে তাঁর ভাগ্য গড়ে তুলেছিলেন। 1830 এবং 1840 এর দশকে তিনি 6টি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 1840 এর দশকে ব্যাপক বাণিজ্য সংকটের সময় অন্যদের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগও ডুবে যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অনেক চীনা ব্যবসায়ী সফল শিল্পপতিতে পরিণত হন। বোম্বেতে দিনশ পেটিট এবং জামসেদজী নুসেরওয়ানর্জী টাটার মত পার্সী ব্যবসায়ীগণ ভারতে বিশাল শিল্প সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা আংশিকভাবে চীনে এবং ইংল্যান্ডে কাঁচা তুলা রপ্তানি করে তাদের প্রাথমিক ধন সম্পদ পুঞ্জীভূত করেন। শেঠ হুকুমচাঁদ নামে একজন মারওয়ারী ব্যবসায়ী যিনি 1917 সালে কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় পাটকল স্থাপন করেন, তিনিও চীনের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। বিখ্যাত শিল্পপতি জি.ডি. বিরলার পিতা এবং পিতামহও এই কাজে যুক্ত ছিলেন।

ব্যবসায়ীরা অন্য ব্যবসার মাধ্যমেও পুঁজি সঞ্চয় করেছিলেন। মাদ্রাজের কিছু ব্যবসায়ী বার্মার সঙ্গে ব্যবসা করত এবং অন্যান্যরা মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। তাদের ছাড়াও কিছু বাণিজ্যিক গোষ্ঠী ছিল

ছবি 17 – দ্বারকানাথ ঠাকুর।
দ্বারকানাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, পশ্চিমিকরণ ও শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারতের উন্নতি সম্ভব। তিনি জাহাজের মাধ্যমে পরিবহণ, জাহাজ তৈরি, খনি খনন, ব্যাঙ্কিং, বাগান তৈরি এবং বীমা ক্ষেত্রে লগ্নী করেছিলেন।

যারা বহির্বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল না। তারা ভারতেই ব্যবসা করত। তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাল নিয়ে যেত, সুদে টাকা চালাতো, শহরগুলোর মধ্যে টাকা পৌঁছে দিত এবং ব্যবসায়ীদের অর্থ যোগান দিত। যখন শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ আসল, তাদের মধ্যে অনেকেই কারখানা স্থাপন করলেন।

ভারতীয় ব্যবসার উপর ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তৎপরতা খুব দ্রুত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। ইউরোপের সঙ্গে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা করতে তাদেরকে বাধা দেওয়া হল। তারা মুখ্যত কাঁচা মাল এবং খাদ্যশস্য— কাঁচা তুলা, আফিম, গম এবং নীল রপ্তানি করতে পারত। যা ইংরেজদের দরকার ছিল। তাদেরকে জাহাজের ব্যবসা থেকেও ধীরে ধীরে বের করে দেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় ব্যবস্থাপনার সংস্থাগুলো আসলে ভারতীয় শিল্পের বিশাল ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ করত। বৃহত্তম সংস্থাগুলোর মধ্যে তিনটি হল বার্ড হিগলার্স এন্ড কো., এন্ড্রিও ইয়ুল এবং জ্যারাডিন স্কিনার। এই সংস্থাগুলো পুঁজি সংহত করত, যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলত এবং তাদের পরিচালিত করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় ধনিকশ্রেণি পুঁজি যোগান দিত যেখানে সমস্ত বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলো ইউরোপীয় সংস্থাগুলো গ্রহণ করত। ইউরোপীয় বণিক শিল্পপতিদের নিজস্ব বণিকসভা ছিল যেখানে ভারতীয় বণিকদের যোগদানের অনুমতি ছিল না।

ছবি 18 – উদ্যোগ সহযোগীগণ- জে.এন.টাটা, আর.ডি. টাটা, স্যার আর.জে. টাটা এবং স্যার ডি.জে. টাটা।
1912 সালে জে.এন. টাটা সর্বপ্রথম ভারতের জামশেদপুরে লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা স্থাপন করেন। ভারতে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প বস্ত্রশিল্পের অনেক পরে শুরু হয়। ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি, রেলপথ এবং রেল ইঞ্জিন প্রধানত আমদানিকৃত ছিল। সুতরাং স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারি শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি হয়নি।

4.2 শ্রমিকরা কোথা থেকে এসেছিল ?

কারখানাগুলোতে শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। কারখানার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের চাহিদাও বেড়ে যায়। 1901 সালে ভারতীয় কারখানাগুলোতে 5,84,000 শ্রমিক ছিল। 1946 সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 24.36,000। কোথা থেকে এই শ্রমিকরা এসেছিল ?

অধিকাংশ শিল্প অঞ্চলে শ্রমিকরা আশেপাশের জেলা থেকে আসত। যে সমস্ত কৃষক এবং কারিগররা গ্রামে কাজ পেত না তারা কাজের সন্ধানে শিল্পকেন্দ্রগুলোতে চলে যেত। 1911 সালে বোম্বেতে সূতি বস্ত্রের কারখানার 50 শতাংশের উপর শ্রমিক প্রতিবেশী জেলা রত্নগিরি থেকে আসত। যেখানে কানপুরের মিলে অধিকাংশ বস্ত্রশিল্পী কানপুর জেলার গ্রামগুলো থেকে আসত। কারখানার শ্রমিকরা প্রায়শই গ্রাম এবং শহরের মধ্যে আসা যাওয়া করত। তারা ফসল কাটার সময় এবং উৎসবের সময় গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেত।

পরবর্তী সময় কাজের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দূর-দূরান্ত থেকে শ্রমিকরা কারখানায় কাজের আশায় চলে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সংযুক্ত প্রদেশগুলো থেকে বোম্বের কাপড়ের কারখানাগুলোতে এবং কলিকাতার পাটকলগুলোতে কাজ করার জন্য শ্রমিকরা চলে যায়।

ছবি 19 – বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বোম্বের একটি কারখানার তরুণ কর্মচারীগণ।
কর্মচারীগণ গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার সময় ভাল জামা কাপড় পরিধান করতে পছন্দ করত।

কাজ পাওয়া সবসময়ই কষ্টকর ছিল, এমনকি যখন কারখানার সংখ্যা বেড়ে যেত এবং শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে যেত তখনও। সবসময়ই কাজের চাইতে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি ছিল। কারখানায় প্রবেশেও সীমাবদ্ধতা ছিল। শিল্পপতিরা সাধারণত নতুন শ্রমিক নিয়োগ করার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করতেন। প্রায়ই এই ঠিকাদার এক পুরনো এবং বিশ্বস্ত শ্রমিক হতো। সে তার গ্রাম থেকে লোক আনত, তাদের কাজ সুনিশ্চিত করত, শহরে থাকতে সহযোগিতা করত এবং সংকটের সময় টাকা দিয়ে সাহায্য করত। এভাবে ঠিকাদার কিছু কর্তৃত্ব সম্পন্ন এবং শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সে তার সাহায্যের পরিবর্তে টাকা অথবা পুরস্কার চাইতে শুরু করে এবং শ্রমিকদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কারখানা শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যাই হোক, তোমরা দেখবে, সমগ্র শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমশক্তিতে তাদের অনুপাত খুবই নগণ্য ছিল।

ছবি 20 – একজন প্রধান ঠিকাদার।
লক্ষ করো কীভাবে ঠিকাদারের অঙ্গভঙ্গি এবং পোশাক-আশাকে তার কর্তৃত্বের প্রকাশ পায়।

উৎস (ঙ)

বসন্ত পারকর যিনি একসময় একটি কারখানার শ্রমিক ছিলেন, তিনি বলেন :

শ্রমিকরা কারখানায় তাদের সন্তানদের কাজ পাইয়ে দেবার জন্য ঠিকাদারদের টাকা দিতেন... নিজ গ্রামের সঙ্গে শ্রমিকের দৈহিক ও গভীর আবেগময় সম্পর্ক ছিল। সে ফসল কাটা এবং বীজ রোপণ করার জন্য বাড়িতে যেতো। কোঙ্কনীয়রা ধান কাটতে এবং ঘাঁটি অর্থাৎ আখ কাটতে বাড়িতে যেতো। এটা একটা স্বীকৃত ব্যবস্থা ছিল যার জন্য কারখানার মালিক ছুটি মঞ্জুর করত।

মীনা মেনন এবং নীরা আদারকার, ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস্ : ওয়ান হানড্রেড ভয়েসেস্, 2004.

উৎস (চ)

ভাই ভোসলে বোম্বের একজন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা যিনি 1930 এবং 1940 এর দশকে তার শৈশব জীবনের স্মৃতিচারণ করেন :

'ঐ দিনগুলোতে বিকাল 5টা থেকে সকাল 3টা পর্যন্ত 10 ঘণ্টা চরম কাজের সময় ছিল। আমার বাবা 35 বছর চাকরি করেন; তাঁর এজমার মত রোগ হয় এবং তিনি আর কাজ করতে পারেননি... এরপর তিনি গ্রামে ফিরে যান।'

মীনা মেনন এবং নীরা আদারকার, ওয়ান হানড্রেড ভয়েসেস্।

ছবি 21 – আহমেদাবাদের একটি কারখানায় সুতা কাটনীরা কর্মরতা।
মহিলারা প্রধানত সুতা কাটার বিভাগে কাজ করত।

5 শিল্প বিকাশের বিশেষত্বগুলি

ভারতে শিল্পোৎপাদনে কর্তৃত্ব করা ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সিগুলো বিশেষ ধরনের উৎপাদনে আগ্রহী ছিল। তারা ঔপনিবেশিক শাসক থেকে সস্তায় জমি অধিগ্রহণ করে চা এবং কফি বাগান গড়ে তুলেছিল। তারা খনি, নীল এবং পাট চাষে টাকা লগ্নী করেছিল। এই উৎপাদনগুলোর অধিকাংশই ভারতে বিক্রির জন্য নয় বরং প্রধানত রপ্তানির জন্য প্রয়োজন ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা শিল্প স্থাপন করতে শুরু করে তখন তারা ভারতীয় বাজারে ম্যানচেস্টারে তৈরি দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে। ব্রিটেন থেকে ভারতে রপ্তানিতে সূতার খুব একটা গুরুত্ব ছিল না। তাই ভারতে শুরুরদিকে কাপড়ের কলগুলো বস্ত্রের পরিবর্তে মোটা সূতির সূতা উৎপাদন করত। যখন সূতার আমদানি করত তখন সেটা শুধুমাত্র উৎকৃষ্টতর প্রকারেরই হত। ভারতীয় সূতা কাটার যন্ত্রে তৈরি সূতা ভারতে হস্তচালিত তাঁতের তাঁতিরাই ব্যবহার করত অথবা চীনে রপ্তানি করা হত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে ধারাবাহিক পরিবর্তন শিল্পায়নের ধরণকেই প্রভাবিত করেছিল। যখনই স্বদেশী আন্দোলন গতি পেল তখনই জাতীয়তাবাদীরা বিদেশী বস্ত্র বয়কট করতে মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল। শিল্পপতিরা তাদের সমষ্টিগত স্বার্থকে রক্ষা করতে, শুল্ক সংরক্ষণ বৃদ্ধি করতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে এবং অন্যান্য ছাড় মঞ্জুর করার জন্য নিজেদের সংগঠিত করে। 1906 সালের পর চীনের বাজারে চীন এবং জাপানের মিলে উৎপাদিত দ্রব্যে ভরে যাবার ফলে চীনে ভারতীয় সূতার রপ্তানি কমে যায়। তাই ভারতীয় শিল্পপতিরা সূতার পরিবর্তে বস্ত্র উৎপাদন শুরু করে। 1900 থেকে 1912 এর মধ্যে ভারতে সূতিবস্ত্রের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্পের বিকাশ খুব ধীরে ধীরে হয়। এই যুদ্ধ নাটকীয়ভাবে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ কারখানাগুলো সেনার প্রয়োজন মেটাবার জন্য যুদ্ধ উপকরণ তৈরিতে ব্যস্ত ছিল এবং ফলে ভারতে ম্যানচেস্টারের আমদানি কমে যায়। হঠাৎ করে ভারতীয় কারখানাগুলো এক বিশাল দেশী বাজার পেয়ে যায়। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবার ফলে ভারতীয় কারখানাগুলো যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাটের থলি, সেনার পোশাক তৈরির কাপড়, তাঁবু এবং চামড়ার জুতা, ঘোড়া এবং খচ্চরের জিন এবং অন্য অনেক প্রকার জিনিস সরবরাহ করার জন্য ডাক পেল। নতুন নতুন কারখানা স্থাপিত হয় এবং পুরনো কারখানাগুলো পালা করে কাজ চালায়। অনেক নতুন শ্রমিক চাকরি পায় এবং প্রত্যেককেই আগের থেকে বেশি সময় কাজ করতে হয়। যুদ্ধের বছরগুলোতে শিল্প দ্রব্য উৎপাদন খুব দ্রুত বেড়ে যায়।

ছবি 22 – মাদ্রাজ চেম্বার অফ কমার্সের প্রথম কার্যালয়।
ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীগণ ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ এবং সমষ্টিগত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করে এবং চেম্বার্স অফ কমার্স গঠন করে।

যুদ্ধের পর ম্যানচেস্টার ভারতীয় বাজারে তার পুরনো অবস্থান কখনই ফিরে পায়নি। যুদ্ধের পরে

আধুনিকীকরণে অক্ষমতা এবং আমেরিকা, জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ব্রিটেনের অর্থ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। তুলার উৎপাদন ধসে পড়ে। আর ব্রিটেন থেকে সুতি বস্ত্রের রপ্তানি ভীষণভাবে হ্রাস পায়। উপনিবেশগুলোতে বিদেশী উৎপাদনগুলো সরিয়ে দিয়ে স্থানীয় শিল্পপতিরা স্থানীয় বাজার দখল করে এবং ধীরে ধীরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

5.1 ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য

যদিও শিল্প কারখানা যুদ্ধের পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় কিন্তু বৃহৎ শিল্পগুলো অর্থব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র ছিল। এদের অধিকাংশ— 1911 সালে প্রায় 67 শতাংশ বাংলা এবং বোম্বেতে অবস্থিত ছিল। দেশের বাকি সমস্ত অংশে ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন প্রাধান্য পেতে থাকে। নিবন্ধিত কারখানাগুলোতে শিল্প শ্রমশক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র কাজ করত। এই সংখ্যা 1911 সালে 5 শতাংশ এবং 1931 সালে 10 শতাংশ ছিল। অবশিষ্টরা পথচারীদের কাছে অদৃশ্য গলি এবং চোরাগলিতে অবস্থিত ছোট ছোট কারখানা এবং পারিবারিক কর্মক্ষেত্রগুলোতে কাজ করত। বস্তুত কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে হস্ত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এটা হস্ততাঁতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। যন্ত্রে তৈরি সস্তা সূতা ঊনবিংশ শতাব্দীর সূতা কাটার শিল্পকে ধ্বংস করে কিন্তু এত সমস্যা সত্ত্বেও তাঁতিরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। বিংশ শতাব্দীতে হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্র উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে 1900 এবং 1940 এর মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়।

এটা কীভাবে সম্ভবপর হল?

এটা আংশিকভাবে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে ঘটেছিল। অত্যধিক খরচ ছাড়া যদি উৎপাদন বাড়ানো যায় তবে হস্তশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তাঁতিরা উড়ন্ত মাকু যুক্ত তাঁতের ব্যবহার করছে। এতে প্রত্যেক শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের গতি বাড়ে এবং শ্রমিকের চাহিদা কমে যায়। 1941 এর মধ্যে ভারতে 35 শতাংশের বেশি তাঁত উড়ন্ত মাকুর সঙ্গে যুক্ত হয়। ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ, মহিশূর, কোচিন, বাংলার মত অঞ্চলে এই হার ছিল 70 থেকে 80 শতাংশ। এছাড়াও অন্য অনেক ছোট ছোট আবিষ্কার হয়েছিল যা তাঁতিদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে এবং যান্ত্রিক ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সাহায্য করে।

ছবি 23 – হাতে বোনা কাপড়।
হাতে বোনা কাপড়ে জটিল নকশাগুলি খুব সহজে মিলগুলি নকল করতে পারত না।

নতুন শব্দাবলী

উড়ন্ত মাকু— এটা দড়ি এবং কপিকলের মাধ্যমে চলা বুননে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র। এটা অনুভূমিক সূতাকে (The weft) উলম্ব সূতার (The warp) মধ্যে স্থাপন করে। উড়ন্ত মাকুর আবিষ্কার তাঁতিদের বড় আকারের তাঁত পরিচালনা করতে এবং প্রশস্ত কাপড় বুনতে সাহায্য করেছিল।

কারখানা শিল্পের সঙ্গো প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার ক্ষেত্রে কিছু তাঁতির দল অন্যদের থেকে অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। তাঁতিদের মধ্যে কিছু লোক মোটা কাপড় উৎপাদন করত যেখানে কিছু লোক বিভিন্ন ধরনের মিহি কাপড় বুনত। মোটা কাপড় গরিবরা ক্রয় করত এবং এর চাহিদা মারাত্মকভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। শস্যহানি এবং দুর্ভিক্ষের সময় যখন গ্রামীণ গরিব লোকদের খাদ্যের অভাব ছিল এবং তাদের নগদ আয় শেষ হয়ে যায় তখন তাদের পক্ষে কাপড় ক্রয় করা সম্ভব হত না। অবস্থাপন্ন লোকদের দ্বারা ক্রয় করা মিহি কাপড়ের চাহিদা অধিকতর স্থিতিশীল ছিল। এমনকি গরিব লোকরা যখন অনাহার থাকত তখনও ধনী লোকরা এই কাপড় ক্রয় করতে পারত। বেনারসি অথবা বালুচরি শাড়িগুলোর বিক্রিতে দুর্ভিক্ষ কোন প্রভাব ফেলেনি। উপরন্তু তোমরা যা দেখেছ, মিলগুলো বিশেষ প্রকারের বুননের অনুকরণ করতে পারত না। পাড় বোনা শাড়ি অথবা মাদ্রাজের বিখ্যাত লুঙ্গি এবং রুমালের জায়গা খুব সহজে মিলের উৎপাদন দখল করতে পারেনি।

তাঁতি এবং অন্যান্য কারুশিল্পীরা যারা বিংশ শতাব্দী জুড়ে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে থাকে। যদিও তারা বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারেনি। তারা কঠোর জীবন যাপন করত এবং দিনরাত কাজ করত। অধিকাংশ সময় মহিলা এবং শিশুরা সহ সমগ্র পরিবারের লোক উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে কাজ করত। কিন্তু তারা শুধু অতীতের কারখানার যুগের ক্ষুদ্র অংশমাত্র ছিল না। তাদের জীবন এবং শ্রম ছিল শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

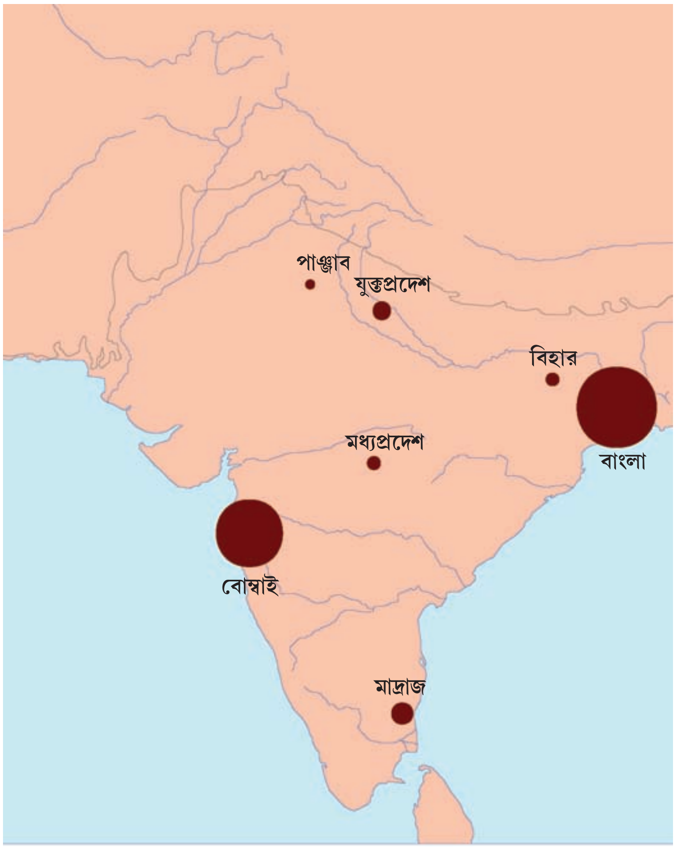

ছবি 24 – ভারতে বৃহৎশিল্পের অঞ্চল, 1931.

বৃত্তগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের আকারকে নির্দেশ করে।

6 পণ্যের বাজার

আমরা দেখেছি কীভাবে ব্রিটিশ উৎপাদনকারীরা ভারতীয় বাজার দখল করার চেষ্টা করে এবং কীভাবে ভারতীয় বয়নশিল্পী, কারিগর, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদ করে। তারা শুল্ক সুরক্ষার দাবি করে, তাদের নিজস্ব স্থান তৈরি করে এবং তারা পণ্যের জন্য বাজার প্রসারিত করারও চেষ্টা করে।

কিন্তু যখন নতুন পণ্য উৎপাদিত হয় তখন লোকদের তা ক্রয় করার জন্য উৎসাহিতও করতে হয়। তাদের অনুভব করতে হবে যে, এই দ্রব্য তাদের প্রয়োজন। কীভাবে এই কাজ করা হয়?

নতুন ক্রেতা তৈরি করার একটি পথ ছিল বিজ্ঞাপন দেওয়া। তোমরা জানো, বিজ্ঞাপন পণ্যকে কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় করে তোলে। বিজ্ঞাপন মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করে নতুন প্রয়োজনীয়তা (needs) সৃষ্টি করে। আজ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে আমাদের চারপাশেই রয়েছে বিজ্ঞাপন। পত্রিকা, ম্যাগাজিন, হোর্ডিং, প্রাচীর, টিভির পর্দা সব জায়গাতেই শুধু বিজ্ঞাপন। কিন্তু যদি আমরা ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই আমরা দেখতে পাই, শিল্পায়নের একেবারে প্রারম্ভিক সময়ে, পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে এবং একটি ক্রেতা সংস্কৃতি রূপায়ণে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যখন ম্যানচেস্টারের শিল্পপতিরা ভারতে কাপড় বিক্রি করা শুরু করে তারা কাপড়ের বান্ডিলের উপর লেবেল লাগিয়ে দেয়। লেবেলের দ্বারা কোম্পানির নাম এবং উৎপাদন স্থান সম্পর্কে ক্রেতারা অবগত হতে পারে। এছাড়া লেবেল গুণমানেরও প্রতীক ছিল। যখন ক্রেতারা লেবেলে মোটা অক্ষরে 'MADE IN MANCHESTER' দেখেন, তখন তারা কাপড় কেনার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হন।

ছবি 25 – 1928 খ্রিঃ এম.বি ধুরন্ধর এর আঁকা চিত্র 'Gripe Water calendar'.
শিশুদের পণ্যগুলো জনপ্রিয় করার জন্য বালক কৃষ্ণের ছবি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

ছবি 26(ক)

ছবি 26(খ)

ছবি 26(ক) – বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ম্যানচেস্টারের লেবেল।
আমদানি করা কাপড়ের লেবেলে অসংখ্য ভারতীয় দেবদেবী— কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতীর ছবি অঙ্কিত করা হতো, যার দ্বারা বাজারজাত বস্তুর গুণমান প্রদর্শিত হতো।
ছবি 26(খ) – ম্যানচেস্টারের লেবেলে মহারাজা রঞ্জিত সিং এর চিত্র।
উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি সম্মানের মনোভাব তৈরি করার জন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ছবি ব্যবহার করা হতো।

কিন্তু লেবেল শুধু শব্দ এবং অক্ষরেই ছিল না, এগুলোতে ছবি থাকত এবং তা সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হত। যদি আমরা পুরানো লেবেলগুলো লক্ষ করি, আমরা দ্রব্য নির্মাতাদের মানসিকতা, তাদের চিন্তাভাবনা এবং মানুষদের আকর্ষণ করার জন্য তাদের আবেদন সম্পর্কে ধারণা করতে পারব।

এইসব লেবেগুলোতে ভারতীয় দেবদেবীর ছবি পর্যায়ক্রমে দেখা যেত। এটা করা হত কারণ পণ্যদ্রবাদি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তবে তা ঈশ্বরের অনুমোদন প্রাপ্ত— এই ধারণা তৈরি হয়। কৃষ্ণ বা দেবী সরস্বতীর ছবিগুলো ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে তৈরি হওয়া উৎপাদিত বস্তুও ভারতীয়দের কাছে পরিচিত বলে মনে করানো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বস্তু নির্মাতারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যকে জনপ্রিয় করার জন্য ক্যালেন্ডার ছাপাতে শুরু করে। পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়াশুনা জানা লোকেরা বুঝতে পারত, কিন্তু ক্যালেন্ডার পড়াশুনা না জানা লোকেদের কাছে বোধগম্য হতো। তারা ক্যালেন্ডারগুলো অফিস ও মধ্যবিত্তের অ্যাপার্টমেন্ট, চায়ের দোকান ও দরিদ্র মানুষদের ঘরে ঝুলিয়ে দেয়, এবং যারা ক্যালেন্ডারগুলো ঝুলিয়ে দিয়েছিল তারা এই বিজ্ঞাপন দিনের পর দিন সারা বছর ধরে দেখত। এইসব ক্যালেন্ডারেও নতুন উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য দেবদেবীর ছবি ব্যবহৃত হত।

ছবি 27 – 1934 খ্রিঃ সানলাইট সাবানের ক্যালেন্ডার।
এখানে ভগবান বিষ্ণু আকাশ থেকে সূর্যালোক নিয়ে আসছেন।

দেবদেবীর ছবির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যেমন সম্রাট এবং নবাবদের ছবি বিজ্ঞাপন ও ক্যালেন্ডারে শোভা পেত। বেশিরভাগ সময়েই এই বার্তা থাকত যে, যদি তুমি রাজকীয় ব্যক্তিত্বকে সম্মান করো, তবে এই পণ্যকেও সম্মান করবে। যখন পণ্যটি রাজাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় বা রাজকীয় আদেশে উৎপাদিত হয়, তখন এর গুণমান নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না।

যখন ভারতীয় দ্রব্য নির্মাতারা বিজ্ঞাপনে জাতীয়তাবাদী বার্তা দেয়— তা ছিল স্পষ্ট ও জোরালো। যদি তুমি রাষ্ট্রের পরোয়া করো, তবে ভারতীয়দের তৈরি দ্রব্য ব্যবহার করবে। বিজ্ঞাপন, স্বদেশী জাতীয়তাবাদী বার্তাবাহকে পরিণত হয়।

উপসংহার

স্পষ্টত, শিল্পের যুগ বলতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে বোঝায়। এর ফলে কারখানার বিকাশ ঘটে এবং এক নতুন শিল্প শ্রমশক্তি তৈরি হয়। যা হোক তোমরা দেখেছ, হাতে তৈরি প্রযুক্তি ব্যয় ছোট ছোট উৎপাদনও শিল্পায়নের মানচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশে অবস্থান করে।

চিত্র 1 এবং 2 পুনরায় দেখো। এখন বলো ছবি দুটি তৈরির অভিপ্রায় কী ছিল?

ছবি 28 – একটি ভারতীয় কারখানায় তৈরি কাপড়ের লেবেল।
এই ছবিতে দেবী আমেদাবাদ এর কারখানায় তৈরি কাপড় দান করছেন, এবং মানুষদের ভারতে তৈরি কাপড় পড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন।

সংক্ষেপে লেখো

1. নিম্নলিখিতগুলি ব্যাখ্যা কর :
   a) ব্রিটেনের মহিলা শ্রমিকরা স্পিনিঙ্ জেনি আক্রমণ করে।
   b) সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের শহরগুলির ব্যবসায়ীরা কৃষক এবং কারিগরদের গ্রামের মধ্যেই কাজ শুরু করে।
   c) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুরাট বন্দরের পতন ঘটে।
   d) ভারতে তাঁতিদের দেখাশুনা করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গোমস্তাদের নিযুক্ত করে।
2. নীচের বিবৃতিগুলো সত্য-মিথ্যা যাচাই করো :
   a) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে সমগ্র কর্মশক্তির 80 শতাংশ প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত শিল্প ক্ষেত্রে কাজ করত।
   b) অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত সূক্ষ্ম কাপড়ের আন্তর্জাতিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করত।
   c) ভারত থেকে তুলা রপ্তানি কমে যাবার ফলে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হয়।
   d) উড়ন্ত মাকু আসার ফলে হস্ততাঁত শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়।
3. পূর্ব-শিল্পায়ন বলতে কী বোঝায় বর্ণনা কর।

আলোচনা করো

1. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের কিছু শিল্পপতি যন্ত্রের পরিবর্তে কায়িক শ্রমকে কেন পছন্দ করত?
2. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় তাঁতীদের থেকে তুলা এবং রেশমী কাপড়ের নিয়মিত যোগান কীভাবে নিশ্চিত করেছিল?
3. কল্পনা করো যে, ব্রিটেন এবং তুলার ইতিহাসের উপর বিশ্বকোষের জন্য একটি প্রবন্ধ রচনা করতে বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে তুমি তোমার লেখা লিখো।
4. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতে কেন শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায়?

প্রকল্প

তোমার অঞ্চলে যে কোন একটি শিল্পকে বেছে নাও এবং এর ইতিহাস খুঁজে বের কর। এর প্রযুক্তি কীভাবে বদলেছে? শ্রমিকরা কোথা থেকে আসে? কীভাবে উৎপাদনগুলির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং বাজারজাত করা হয়? শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে মালিক এবং কিছু শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করো।

কাজকর্ম, জীবনযাত্রা ও বিশ্রাম (Work, Life and Leisure)

সমকালীন বিশ্বের শহরসমূহ (Cities in the Contemporary World)

1880 সালে দুর্গাচরণ রায় 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' শিরোনামে একটি উপন্যাস লেখেন, যাতে হিন্দু পুরাণ মতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অন্যান্য দেবদেবীদের সাথে নিয়ে ট্রেনে চেপে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ঐ সময়ে কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। বৃষ্টির দেবতা বরুণ ঐ দেবদেবীদের নিয়ে কলিকাতা ভ্রমণে বের হন। এই বিশাল, আধুনিক শহর দেখে সমস্ত দেবদেবীগণ বিস্ময় বিহ্বল হয়ে যান। রেলগাড়ি, গঙ্গানদীতে ভাসমান বিশাল জাহাজ, ধোঁয়া নির্গমনকারী কারখানা, বড়ো বড়ো সেতু, বিশাল স্মারক আর রকমারি দ্রব্যে পূর্ণ চোখ ধাঁধানো দোকান— ইত্যাদি দেখে উনারা খুবই আশ্চর্যান্বিত হন। প্রাচুর্যে ভরপুর মহানগরী দেখে তারা এতটাই প্রভাবিত হন যে, স্বর্গে এমনই একটি সংগ্রহশালা (Museum) এবং রাজদরবার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা নতুন নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা তথা চাকরির ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা ছিল। কিন্তু দেবতারা এই শহুরে জীবনযাত্রার কিছু ব্যাপারে রুষ্ট হয়েছিলেন, যেমন— সেখানকার প্রতারক ও চোর, ভয়ানক দরিদ্রতা, প্রচুর সংখ্যক মানুষের নিম্নমানের বাসস্থান প্রভৃতি। স্বয়ং ব্রহ্মা একজোড়া কমদামি চশমা কিনতে গিয়ে প্রতারিত হন এবং একজোড়া জুতো কেনার চেষ্টা করার সময় সেখানকার দোকানদারদের দেখে ভীষণরকম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ তারা একে অপরকে ঠগ-জোচ্চোর বলে অভিযুক্ত করছিলো। সমস্ত দেবতাগণ জাতি, ধর্ম এবং লিঙ্গাভেদ— প্রভৃতি দেখে ভীষণরকম বিচলিত হয়ে পড়েন। যে সমস্ত সামাজিক ভেদাভেদ সে সময় পর্যন্ত সহজাত তথা স্বাভাবিক বলে মনে করা হত, সেগুলো যেন ভেঙে পড়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুর্গাচরণ রায়ের মতো ভারতবর্ষের অনেক লোক শহরগুলো দেখে একদিকে যেমন আশ্চর্যান্বিত হতেন অন্যদিকে তেমনি দ্বিধাগ্রস্তও হতেন। শহুরে জীবনযাত্রা পরস্পর বিরোধী ভাবমূর্তি আর অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়— একদিকে প্রাচুর্য-তো অন্যদিকে দারিদ্র্য, একদিকে প্রচুর জাঁকজমক তো অন্যদিকে মলিনতা, একদিকে বিশাল সুযোগ তো অন্যদিকে হতাশা।

শহরগুলো কি বরাবর এমনই ছিল ? যদিও নগরায়নের ইতিহাস অনেক পুরোনো। তথাপি বিশ্বব্যাপী আধুনিক শহরগুলোর বিকাশের ইতিহাস 200 বছরের বেশি পুরোনো নয়। শিল্প-পুঁজিবাদের উদয়, বিশ্বের একটি বিরাট অংশে শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশ লাভ— এই তিনটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া আধুনিক শহরগুলোর রূপদানে বিশেষ নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। এই অধ্যায়ে তোমরা নগরায়নের কিছু প্রক্রিয়ার সন্ধান পাবে। এখানে আমরা এটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব যে, কীভাবে এই আধুনিক শহরগুলোর উত্থান হয় এবং এগুলোর মধ্যে কী কী ঘটনা ঘটে।

1 শহরের বৈশিষ্ট্যসমূহ

চলো, সর্বপ্রথমে আমরা নগর, শহর তথা গ্রামের মধ্যে পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করি। উর (Ur), নিপ্পুর (Nippur) এবং মহেঞ্জোদাড়োর (Mohenjodaro) মতো প্রথমদিকের শহর ও নগর— যেগুলো নদী উপত্যকার পাশে প্রথম গড়ে ওঠে সেগুলো তৎকালীন অন্যান্য মানববসতির চেয়ে আকারে বড়ো ছিল। প্রাচীন নগরগুলো তখনই বিকাশ লাভ করত যখন প্রচুর সংখ্যক এমন লোকের জন্য খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভবপর হত যারা খাদ্যশস্য উৎপাদনের সাথে যুক্ত ছিল না। প্রায়শই রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক সমন্বয় সাধন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বৌদ্ধিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্র ছিল শহর এবং শহরগুলো অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী, যেমন— কারিগর, বণিক এবং পুরোহিতগণের উপর নির্ভরশীল ছিল।

শহর তথা নগরগুলো তাদের আকার ও বিভিন্নরকম জটিলতায় একে অপরের চেয়ে বেশ ভিন্ন হতে পারে। এগুলো ঘনজনবসতিপূর্ণ আধুনিক মহানগরীও হতে পারে যেগুলো একটি বিস্তৃত অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করে থাকে এবং একটি বিশাল সংখ্যক অধিবাসীদের সহায়তা করে। তাছাড়াও এগুলো আকৃতিতে এবং কার্যকলাপে নির্দিষ্ট মাপেরও হতে পারে।

এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক বিশ্বে নগরায়ণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব। মহানগরীর বিকাশের উদাহরণ হিসেবে আমরা দু'টি আধুনিক শহরের বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রথমটি হল লন্ডন— বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর যেটি ঊনবিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং দ্বিতীয়টি হল— ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোম্বাই নগরী।

কার্যাবলি

তুমি কি ভারতীয় ইতিহাস হতে নিম্নোক্ত বিভিন্ন শ্রেণি, যথা— একটি ধর্মীয় স্থান, একটি বাজার, শহর, একটি আঞ্চলিক রাজধানী এবং একটি মহানগরের সঠিক উদাহরণ দিতে পারবে?

এগুলোর যে কোনও একটির ইতিহাস খুঁজে বের করবো।

নতুন শব্দ

মহানগরী (Metropolis)— কোনও রাজ্য বা দেশের বিশাল এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহর যা সাধারণতঃ ঐ স্থানের রাজধানী হয়ে থাকে।

নগরায়ণ (Urbanisation)— একটি শহর বা নগরের বিকাশ তথা উন্নয়ন।

1.1 ইংল্যান্ডে শিল্পায়ন এবং আধুনিক নগরীর উত্থান

আধুনিককালে শিল্পায়ন নগরায়নের স্বরূপের উপর খুবই গভীর প্রভাব ফেলেছে। যদিও 1850-এর দশকের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ শিল্পবিপ্লব শুরুর কয়েক দশক পরেও অধিকাংশ পশ্চিমের দেশগুলো ছিল মূলত গ্রামীণ। ব্রিটেনের শুরুর দিকের শিল্পনগরীসমূহ, যেমন— লিড্‌স (Leeds) এবং ম্যানচেস্টার এক বিশাল সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিকদের আকৃষ্ট করেছিল। 1861 সালে ম্যানচেস্টারে বসবাসকারী তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিই ছিল গ্রামীণ এলাকা থেকে আসা অভিবাসী।

চলো এখন আমরা লন্ডনের দিকে তাকাই। 1750 খ্রি. পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্ এর প্রতি নয় জনে একজন লন্ডন শহরে বসবাস করত। এটা ছিল একটা বিশাল শহর যার জনসংখ্যা ছিল প্রায় 6,75,000। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লন্ডন এইভাবেই বিস্তৃত হয়ে চলছিল। 1810 খ্রি. থেকে 1880 খ্রি. এই সত্তর বছরে এর জনসংখ্যা চতুর্গণ বৃদ্ধি পায় এবং 10 লক্ষ থেকে বেড়ে 40 লক্ষে দাঁড়ায়।

যদিও এখানে কোনও বড়ো কল-কারখানা ছিল না। তথাপি অভিবাসী জনগণের কাছে লন্ডন নগরী ছিল একটি শক্তিশালী চুম্বকের মতো এবং তার দুর্নিবার আকর্ষণে তারা এখানে ছুটে চলে আসত। গারেথ স্ট্যাডম্যান জোন্‌সের (Gareth Stedman Jones) ভাষায় ঊনবিংশ শতাব্দীর লন্ডন কেরানি, দোকানদার, ছোটো মালিক, দক্ষ কারিগর, অর্ধশিক্ষিত এবং পরিশ্রমী শ্রমিকশ্রেণি, সৈন্য, চাকর, ঠিকা শ্রমিক, রাস্তার পাশে বসা বিক্রেতা এবং ভিক্ষুকদের শহর ছিল। লন্ডন পোতাশ্রয় (Dockyards) ছাড়াও মুখ্যত পাঁচ ধরনের বড়ো শিল্পে প্রচুর সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়। এগুলো ছিল— বস্ত্র ও জুঁতো শিল্প, কাঠ ও আসবাব শিল্প, ধাতু এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, মুদ্রণ এবং স্টেশনারি শিল্প, শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত উপকরণ এবং ঘড়ির মতো সূক্ষ্ম জিনিস তৈরির শিল্প এবং মূল্যবান ধাতুর জিনিস তৈরির শিল্প। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন (1914-18 খ্রি.) সময়ে লন্ডনে মোটর কার এবং বৈদ্যুতিক সামগ্রীর উৎপাদনও হতে থাকে এবং বড়ো মাপের কারখানার সংখ্যা দিন দিন এত পরিমাণে বাড়তে থাকে যে, শহরের তিন-চতুর্থাংশ কর্মসংস্থান এই কারখানাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

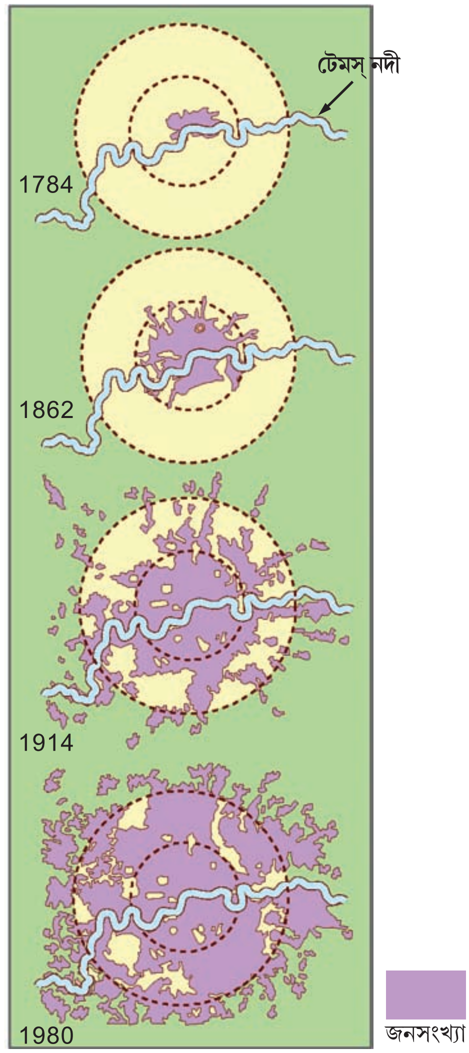

চিত্র 1 – লন্ডন শহরের বৃদ্ধি, চারটি বিভিন্ন যুগে লন্ডন শহরের জনসংখ্যা প্রদর্শনকারী মানচিত্র।

1.2 প্রান্তীয় গোষ্ঠীসমূহ

লন্ডনের বিকাশের সাথে সেখানে অপরাধের মাত্রাও বাড়তে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, 1870 এর দশকে লন্ডনের প্রায় 20,000 অপরাধীর বসবাস ছিল। ওই সময়ের অপরাধমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে আমরা অনেকটাই অবগত, কারণ তখন অপরাধ ব্যাপক চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ দফতর আইন শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিরা (philanthropists) সর্বসাধারণের নৈতিকতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং শিল্পপতিরা পরিশ্রমী এবং সুশৃঙ্খল শ্রমিক শ্রেণি চাইছিলেন। এই সমস্ত কারণে অপরাধীদের সংখ্যা গোনা হত। তাদের কাজকর্মের উপর নজর রাখা হত এবং তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে তদন্ত করা হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হেনরি মেহেও (Henry Mayhew) লন্ডনে বসবাসকারী শ্রমিকদের নিয়ে বেশ কিছু বই লেখেন। অপরাধমূলক কাজকর্ম করে জীবিকানির্বাহ করত এমন লোকদের একটি লম্বা তালিকা তৈরি করেন। উনার তালিকাভুক্ত অপরাধীদের মধ্যে অনেকেই ছিলো গরিব। এরা লোকেদের বাড়ির ছাদ থেকে সিসা চুরি করত, দোকান থেকে খাবার চুরি করত, কয়লা চুরি করত এবং শুকানোর জন্য মেলে দেওয়া কাপড় চুরি করে নিয়ে যেত। অন্যদিকে এমন অপরাধীও ছিল যারা নিজস্ব পেশায় অনেক বেশি দক্ষ ছিল। লন্ডনের রাস্তা ঠগবাজ এবং প্রতারক, পকেটমার এবং ছিচকে চোর-এ পরিপূর্ণ ছিল। জনগণকে সুশৃঙ্খল করার প্রচেষ্টায় প্রশাসন অপরাধীদের জন্য কড়া শাস্তি তথা জরিমানা নির্দিষ্ট করে এবং যারা প্রকৃত দরিদ্র বলে বিবেচিত হত তাদের কাজ পাইয়ে দেওয়া শুরু করে।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকে কলকারখানায় এক বিরাট সংখ্যক মহিলাদের কাজে নিযুক্ত করা হয়। প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে কলকারখানায় মহিলাদের চাকরির সুযোগ কমে আসতে থাকে এবং তারা শুধুমাত্র ঘর-গৃহস্থালীর কাজেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। 1861 সালের জনগণনা অনুযায়ী লন্ডনে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক অন্য লোকের বাড়িঘরে চাকর হিসেবে কাজ করত। যাদের অধিকাংশই ছিল সাম্প্রতিককালে শহরে অভিবাসী হয়ে আসা মহিলা।

নতুন শব্দ

লোক-হিতৈষী ব্যক্তি (Philanthropist)— এমন ব্যক্তি যারা সমাজের উন্নয়নে এবং ভালোর জন্য কাজ করে এবং এর জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করে।

প্রচুর সংখ্যক মহিলা পরিবারের রোজগার বাড়ানোর জন্য নিজেদের বাড়িঘরও ব্যবহার করত। তারা হয়ত কাউকে ভাড়াটে হিসেবে রাখত বা বাড়িতে থেকেই কাপড় সেলাই, কাপড় ধোয়া, দেশলাই বাক্স তৈরি— এ ধরনের কাজ করত। যদিও বিংশ শতাব্দীতে আবার একটি পরিবর্তন দেখা যায়। মহিলারা যুদ্ধকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের শিল্প এবং কার্যালয়ে কাজ পেতে শুরু করে। ফলে তারা গৃহস্থালীর কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

এক বিরাট সংখ্যক শিশুদের স্বল্প মজুরির বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হতে থাকে এবং এর জন্য এদের মা-বাবারাই দায়ী ছিল। 1880 এর দশকে 'দ্য বিটার ক্রাই অফ আউটকাস্ট লন্ডন' (*The Bitter Cry of Outcast London*) নামক বইয়ে এন্ড্রিয়ো মিয়ারনস (Andrew Mearns) নামে জনৈক পাত্রী দেখিয়েছিলেন যে কেন স্বল্প মজুরিতে ছোটো ছোটো কারখানায় কাজ করার চেয়ে অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকা অধিক লাভজনক ছিল। 'সাত বছরের একটি শিশু বড়ো চোর হওয়ার আগেই ছোটো খাটো চুরি করে সপ্তাহে অতি সহজেই 10 শিলিং 6 পেনস রোজগার করে নিত— যা রোজগার করতে ওই বয়সের একটি বাচ্চার সপ্তাহে 65 বাক্স দেশলাই অর্থাৎ প্রতিদিন 1,296টি দেশলাই বানাতে হত। 1870 খ্রি. জারি হওয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন (Compulsory Elementary Education Act in 1870) এবং 1902 খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে কারখানা আইন চালু হওয়ার পরে শিল্প-সংক্রান্ত কাজ হতে শিশুদের দূরে রাখা হতে থাকে।

কার্যাবলি

কল্পনা করো যে তুমি এক সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। আর তোমাকে 1811 খ্রিঃ লন্ডনে আসা পরিবর্তন নিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখতে বলা হল। তাহলে তুমি কোন কোন সমস্যাগুলো তোমার প্রতিবেদনে তুলে ধরবে? আর এই পরিবর্তনের ফলে কারা লাভবান হয়েছিলেনা?

1.3 আবাসন

শিল্প বিপ্লবের পরে বিরাট সংখ্যক জনগণ শহরের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ফলে লন্ডনের মতো পুরোনো শহরগুলো নাটকীয়ভাবে বদলাতে থাকে। ওয়ার্কশপ বা কারখানার

*চিত্র 2 – 1870 খ্রি. 'দ্যা ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ'এ প্রকাশিত একজন অজানা ব্যক্তির বাড়ির ছবি, (**A Stranger's Home**)*
শীতকালে অনেক শহরে দাতব্য সংস্থা আর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তরফে রাত্রিকালীন আশ্রয়স্থল (Night Refuges) এবং অপরিচিতদের বাড়ি (Strangers' Home) খোলা হত। দরিদ্র জনগণ খাদ্য, উষ্ণতা এবং আশ্রয়ের আশায় এগুলোতে ভিড় জমাত।

মালিকরা অভিবাসী শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করত না। তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত জমির মালিকরা নবাগতদের জন্য সস্তায় এবং সাধারণতঃ অসুরক্ষিত ভাড়াবাড়ি বা tenements তৈরি করে দিত।

দারিদ্র্য গ্রামের পাশাপাশি শহরেও খুব বেশি চোখে পড়ার মতো ছিল। 1887 খ্রি. লিভারপুলের এক জাহাজ মালিক চার্লস বুথ (Charles Booth) লন্ডনের ইস্ট এন্ড-এ (East End) স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম সামাজিক জরিপ (Social Survey) করেন। তিনি দেখতে পান যে লন্ডনের কম করে প্রায় 10 লক্ষ অধিবাসী (ওই সময়ে লন্ডনের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ) ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র আর তাদের গড় আয়ু ছিল 29 বছর। (তুলনায় সম্ভ্রান্ত এবং মধ্যবিত্তদের গড় আয়ু ছিল 55 বছর) এই লোকগুলির অধিকাংশকেই কারখানা, হাসপাতাল বা মানসিক রোগীদের আশ্রয়স্থলে মৃত্যুবরণ করতে হত। উপসংহারে তিনি বলেন যে, "নিজের দরিদ্রতম নাগরিকদের জন্য লন্ডনের কম করে আরও 4,00,00 ঘর বানানো প্রয়োজন"।

একটা সময় পর্যন্ত শহরের স্বচ্ছল বাসিন্দারা শহরের বস্তি এলাকাগুলোকে একেবারে উঠিয়ে দিয়ে শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা বিরাট অংশের জনগণ গরিবদের জন্য বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে শুরু করে। এই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ কী ছিল? — প্রথমত গরিবদের বিরাট আকৃতির এক-কক্ষ বিশিষ্ট বাড়িগুলোকে জনগণের স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ দেখা হত। ঐ বাড়িগুলো ছিল ঘিঞ্জি বসতিপূর্ণ, সেগুলোতে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবও ছিল। দ্বিতীয়ত জীর্ণশীল হওয়ায় বাসস্থানগুলোতে আগুন লাগার ভয়ও ছিল। তৃতীয়ত ঐখানে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা নিয়ে ব্যাপক ভীতি ছিল। বিশেষত 1917 সালে সংগঠিত রুশ-বিপ্লবের পর এর ভয়টা বেড়ে যায়। লন্ডনের গরিব বাসিন্দাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠা থেকে বিরত রাখতে শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

চিত্র 3 – ইঁদুর ধরার কল বিক্রেতা, 1799 খ্রি. রওল্যান্ডসন (Rowlandson) কর্তৃক আঁকা একটি ব্যাঙ্গচিত্র।
রওল্যান্ডসন লন্ডনের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যগুলো নথিভুক্ত করেন যেগুলো পুঁজিবাদের আগমণের সাথে সাথে হারিয়ে যেতে থাকে।

নতুন শব্দ

ভাড়াবাড়ি (Tenement)— চলনসই এবং প্রায়শই ভিড়ে ঠাসা বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট (apartments)। এ ধরনের বাড়ি বড়ো বড়ো শহরের গরিব এলাকায় দেখা যেত।

কার্যাবলি

বর্তমানে ভারতের অনেক শহরে গড়ে ওঠা বস্তি এলাকা, যেগুলিতে সাধারণতঃ গরিব অংশের মানুষ বাস করে— সেগুলো উঠিয়ে দিয়ে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গরিব অংশের জনগণের জন্য বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা সরকারের দায়িত্ব কি না- এ নিয়ে আলোচনা করো।

চিত্র 4 – 1889 সালে লন্ডনের একটি বস্তি।
এই ছবিতে রাস্তাকে কী কী কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দেখতে পাচ্ছ? বিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকদের আবাসনে কী কী পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল?

চিত্র 5 – দরিদ্র জনগণের জন্য প্রায়শই রাস্তাই ছিল বিশ্রাম, এবং অবসর বিনোদনের জায়গা।— দ্যা ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ-এ 1856 খ্রি. প্রকাশিত একটি চিত্র।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে অভিজাত শ্রেণির জনগণ রাস্তাঘাটে মদ্যপান এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্য উত্তরোত্তর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সমাজে মদ্যপানের ক্ষতিকারক দিকগুলোর বিরুদ্ধে "মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন" (Temperance Movement) শুরু হয়।

1.4 লন্ডনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

লন্ডন শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ভিড়ে ঠাসা এলাকাগুলোকে ভিড়মুক্ত করার জন্য, খোলাস্থানে সবুজায়নের জন্য, দূষণ-হ্রাস এবং শহরকে সুন্দর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এধরনের আবাসন সমস্যাগ্রস্ত বার্লিন ও নিউইয়র্ক শহরগুলোর অনুকরণে এখানেও বড়ো আকারের আবাসন নির্মাণ করা হয়। ব্রিটেনে তীব্র আবাসন স্বল্পতার প্রভাবকে কমিয়ে আনার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পনগরীগুলোর অত্যধিক ভিড় নির্মল বায়ুর চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলে। লন্ডন শহরে প্রচুর সংখ্যক বিত্তবান নাগরিক গ্রামাঞ্চলে ছুটির দিন কাটানোর বাড়ি (Holiday home) তৈরি করতে সমর্থ ছিল। শহরের বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে তোলার দাবি ওঠে। লন্ডনের আশেপাশে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলে গ্রাম এবং

কার্যাবলি

কল্পনা করো যে, লন্ডনের দরিদ্র শ্রেণির জনগণ কী অবস্থায় বসবাস করত- তা তুমি অনুসন্ধান করছ। ঐ পরিস্থিতি জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য যেসব বিপদ ডেকে এনেছিলো তা নিয়ে একটি টীকা লেখ।

উৎস (ক)

"খোলা স্থানে শিশুদেরও ভুলে যাওয়া চলবে না। সবসময় তাদের ছোটো ছোটো পা-এর পরিমাপ অনুযায়ী কিন্ডার ব্যাংক ([illegible]) [illegible] ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সম্ভব অনুযায়ী তৃণাচ্ছাদিত জায়গায় তাদের জন্য দোলনা, সিস([illegible]), নৌকা চালানোর জন্য জলাশয় এবং এগুলোকে যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বালুকাময় স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে"।

নতুন শব্দ

মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন (Temperance movement)— ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে শুরু হওয়া একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন মদ্যপানকে পরিবার এবং সমাজ ধ্বংসের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বিশেষত শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে মদ্যপাানের পরিমাণ কমিয়ে আনা।

শহরের পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে আনার জন্য কিছু প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

বাস্তুকার এবং পরিকল্পনাকার ইবেনেজার হাওয়ার্ড (Ebenezer Howard) গার্ডেন সিটি (Garden City) এর নীতিমালা প্রস্তুত করেন— যা গাছ ও লতাপাতায় পরিপূর্ণ থাকবে এবং সেখানে মানুষ বসবাস করার পাশাপাশি কাজও করতে পারবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এর ফলে আরও ভালো সুনাগরিক তৈরি হবে। হাওয়ার্ডের চিন্তাধারা অনুসরণ করে রেমন্ড আনউইন (Raymond Unwin) এবং বেরি পার্কার (Barry Parker) নিউ-আর্সউইক (New Earswick) নামে একটি গার্ডেন সিটির নকশা তৈরি করেন। সেখানে ছিল সর্বজনীন বাগান এবং মনোরম দৃশ্য। খুঁটিনাটি জিনিসের উপর বেশ নজর দেওয়া হয়। কিন্তু শেষে দেখা যায় যে, ওই ধরনের বাড়িগুলো কেবলমাত্র আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল শ্রমিকরাই কিনতে পারত।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে (1919-39 খ্রি.) শ্রমিক শ্রেণির জন্য বাসস্থানের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার নিয়ে নেয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রায় 10 লক্ষ বাড়ি নির্মিত হয়। এগুলোর অধিকাংশই ছিল এক পরিবারের থাকার উপযোগী ছোটো বাড়ি। ইত্যবসরে শহর এতটাই সম্প্রসারিত হয় যে, তখন লোকজন আর পায়ে হেঁটে নিজ নিজ কর্মস্থলে যেতে পারছিল না। শহরের আশেপাশে শহরতলি গড়ে উঠার ফলে নতুন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

চিত্র 6 – নিউ-আর্সউইক (New Earswick)। ছবিতে চারদিক ঘেরা বাগান লক্ষ্য করো— যা কি-না নতুন সামাজিক জীবনের প্রসারে সহায়ক।

1.5 শহরে পরিবহণ ব্যবস্থা

যদি শহরতলি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে শহরে যাতায়াতের জন্য কোনো ধরনের পরিবহণের সুবিধা না থাকত তবে জনসাধারণকে শহর ছেড়ে বাগিচাময় শহরতলীতে (Garden Suburbs) গিয়ে বসবাস করার জন্য কীভাবে উৎসাহিত করা যেত? লন্ডনের পাতালরেল আবাসন আংশিক সমাধান করে দেয়। এর মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক লোকের শহরে যাতায়াত সম্ভবপর হয়।

1863 খ্রিস্টাব্দের 10ই জানুয়ারি লন্ডনের পেডিংটন এবং ফারিংটন স্ট্রিটের মধ্যে বিশ্বের প্রথম পাতালরেল পরিষেবার প্রথম শাখার উদ্‌ঘাটন হয়। প্রথমদিনেই 10,000 যাত্রী এই রেলে যাতায়াত করেন। ওইদিন এই লাইনে প্রতি দশ মিনিট পর পর ট্রেন চলাচল করছিল। 1880 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়। যা বৎসরে প্রায় চার কোটি যাত্রী পরিবহণ করছিল। তবে প্রথমদিকে জনসাধারণ পাতালরেলে চলাচল করতে ভয় পেত। এই ব্যাপারে সংবাদপত্রের এক পাঠক নিম্নলিখিত সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন :

> "আমি যে কামরায় বসেছিলাম সেটা পাইপে ধূমপানরত যাত্রীতে পূর্ণ ছিল। কামরার পরিবেশ সালফার, কয়লার গুঁড়ো আর উপরে টাঙানো গ্যাসবাতি থেকে নির্গত দুর্গন্ধে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমন ছিল যে মোরগেট (Moorgate) পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে আমি শ্বাসরোধ (Asphyxiation) এবং গরমের কারণে প্রায় মৃত হয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু এই পাতাল রেল পরিষেবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়াবহ বিপজ্জনক সেহেতু আমার মতে একে অবশ্যই অতি শীঘ্র বন্ধ করে দেওয়া উচিত।"

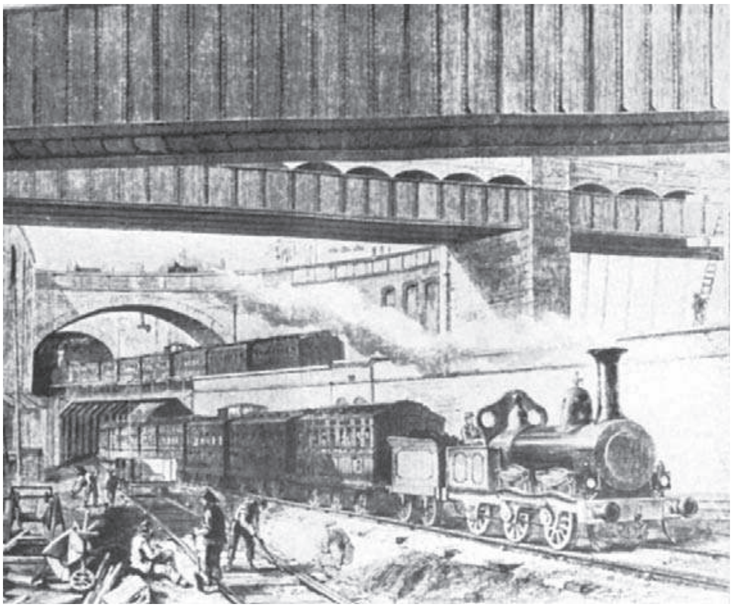

চিত্র 7 – লন্ডনে রেললাইন পাতার কাজ চলছে, "ইলাসট্রেটেড টাইমস" এ 1868 খ্রি: প্রকাশিত চিত্র।

অনেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই 'লৌহ-দানব'গুলো (iron monsters) শহরের বিশৃঙ্খল এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। নির্মাণ প্রক্রিয়ার ফলে হওয়া ব্যাপক ধ্বংসের ব্যাপারে চার্লস ডিকেন্স 1848 খ্রি. প্রকাশিত 'ডম্বে এন্ড সন্স' (Dombey and Son) নামক বইয়ে লেখেন :

> বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়; রাস্তাঘাট ভেঙে বন্ধ করে দেওয়া হয়; জমিতে গভীর গর্ত এবং পরিখা খোঁড়া হয়; চতুর্দিকে প্রচুর মাটির এবং কাদার স্তূপ সৃষ্টি হয়;... সেখানে ছিল কয়েকশো হাজার রকমের এবং আকৃতির অসমাপ্ত কাজ, যেগুলো প্রচণ্ডরকম এলোমেলো হয়ে নিজেদের জায়গা অদলবদল করে, উল্টে তথা মাটিতে ঢুকে থাকা অবস্থায় ছিল।

প্রায় দুই মাইল লম্বা রেলপথ তৈরি করতে গিয়ে 900-এর মতো বাড়িঘর ভাঙতে হত। এভাবে লন্ডনে পাতাল রেলপথের কারণে বিশেষ করে দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে এক বিরাট সংখ্যক দরিদ্র লন্ডনবাসীকে উৎখাত হতে হয়।

এতসব কিছুর পরেও পাতালরেল বিরাট সফলতা লাভ করে। বিংশ শতাব্দী আসতে আসতে নিউইয়র্ক, শিকাগো এবং টোকিওর মতো বড়ো মহানগরীগুলো নিজস্ব সুব্যবস্থিত গণপরিবহণ ব্যবস্থা চালু করে দেয়। ফলে শহরগুলোর জনগণ আশেপাশের শহরতলিতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। সুপরিকল্পিত শহরতলি আর ভালো রেল নেটওয়ার্কের কারণে বিশাল সংখ্যক জনগণের পক্ষে মধ্য-লন্ডনের বাইরে বসবাস করেও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত যাতায়াত করা সম্ভবপর হয়।

এই সমস্ত নতুন সুযোগ-সুবিধা সামাজিক বৈষম্য যেমন কমিয়ে আনে তেমনি নতুন ধরনের বৈষম্যও সৃষ্টি করে। এ সমস্ত পরিবর্তন কীভাবে পারিবারিক জীবন এবং সর্বজনীন জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে? সকল সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য এগুলোর কি একই তাৎপর্য ছিল?

চিত্র 9 – লন্ডনের রাস্তায় গবাদি পশু, 1877 খ্রিঃ দ্যা গ্রাফিক (The Graphic) এ প্রকাশিত চিত্র।
আধুনিক শহর স্থাপনের পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি অঙ্গ ছিল রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। উনবিংশ শতাব্দীতে লন্ডনের রাস্তাঘাটে গবাদি পশুর জন্য সবসময় ট্রাফিক জ্যাম লেগে থাকতো।

নতুন শব্দ

শ্বাসরোধ (Asphyxiation)— অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া।

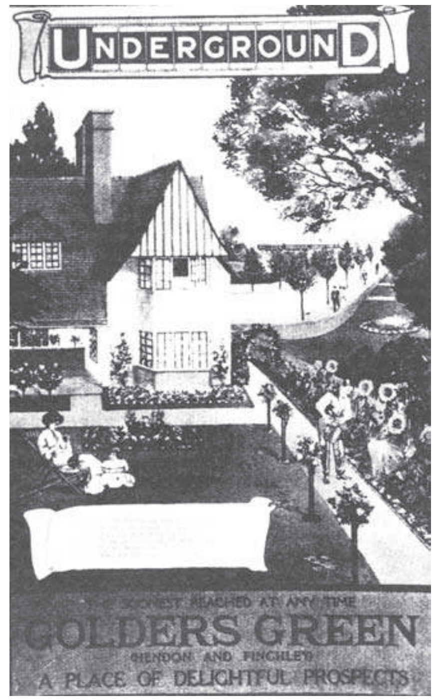

চিত্র 8 – গোল্ডার্স গ্রিন (Golders Green) এর জন্য 1900 খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড (London Underground) এর বিজ্ঞাপন।
তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, এই আন্ডারগ্রাউন্ড বিজ্ঞাপনে জনসাধারণকে সবুজ গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ, কম বসতিপূর্ণ ছবির মতো সুন্দর শহরতলিতে গিয়ে বসবাস করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

2 শহরের সামাজিক পরিবর্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবার ছিল উৎপাদন এবং উপভোগ এর পাশাপাশি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি অংশ। শিল্পনগরীগুলোর জীবনযাত্রা পরিবারের কর্মকুশলতা এবং স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মেল-বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি ভাঙনের দোড়গোড়ায় চলে আসে। অন্যদিকে, ব্রিটেনের উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলারা ক্রমবর্ধমানভাবে খুব বেশি একাকিত্বের মুখোমুখি হয়ে পড়েন। যদিও তাদের জীবনযাত্রা গৃহপরিচারিকাদের দ্বারা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়,— যারা খুবই কম মজুরিতে রান্নাবান্না, সাফাই এবং ছোটো বাচ্চাদের যত্ন আত্তি করত।

মজুরির বিনিময়ে কর্মরতা মহিলারা বিশেষতঃ যারা সমাজের নীচুস্তরে বাস করত— তারা নিজেদের জীবনকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। যাইহোক— অনেক সমাজ-সংস্কারক মনে করতেন যে, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে পড়েছিল এবং ঘরের বাইরে কর্মরত মহিলাদের নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে এই পরিবারকে রক্ষা বা পুনর্গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন।

2.1 শহরে পুরুষ, মহিলা এবং পরিবার

শহরগুলো নিঃসন্দেহে পুরুষ এবং মহিলা— উভয়কেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক বিশেষ ভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তারা সামগ্রিক মূল্যবোধ— যা কিনা ক্ষুদ্র গ্রামীণ জনসমাজের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল— তা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু এই নতুন শহুরে পরিবেশের সব ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলাদের সমান সুযোগ ছিল না। শিল্পক্ষেত্রে মহিলাদের কাজ হারানোর সাথে রক্ষণশীল জনগণ সর্বজনীন এলাকায় তাদের উপস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করা শুরু করে। ফলে মহিলারা পুনরায় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়। সর্বজনীন জায়গাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে পুরুষদের অধিকারে চলে যায় এবং পারিবারিক কর্মক্ষেত্রই মহিলাদের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন, যেমন— 'চার্টিজম' (Chartism) সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকারের দাবির পক্ষে চলা আন্দোলন এবং 'দশ ঘণ্টার আন্দোলন' (10-hour movement)— কারখানাগুলোতে কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য আন্দোলন— এগুলোতে প্রচুর সংখ্যক পুরুষ একজোট হন। ধীরে ধীরে এরও অনেক পরে 1870 এর দশকে মহিলারা ভোটাধিকারের জন্য অথবা বিয়ের পরে সম্পত্তির অধিকারের জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা শুরু করে।

নতুন শব্দ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)— এমন একটি মতবাদ যা সমাজের চেয়ে ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা, অধিকার অথবা স্বাধীন কার্যকলাপকে অধিক গুরুত্ব দেয়।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যে শহুরে পরিবারগুলো একবার আবার বদলাতে শুরু করে। এরজন্য যুদ্ধকালীন কাজকর্মে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাও আংশিকভাবে দায়ী ছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা পূরণে এইসব মহিলারা বড়ো সংখ্যায় কাজে নিযুক্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের আকার অনেক ছোটো হয়ে যায়।

বিভিন্ন সামগ্রী এবং পরিষেবার তথা চিন্তাধারার যে নতুন একটি বাজার গড়ে ওঠে, পরিবার সর্বোপরি তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। নতুন শিল্পনগরীগুলো ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর সাথে সেগুলো রবিবারসহ অন্যান্য ছুটির দিনে ব্যাপক ছুটি উপভোগ করার ফলে সৃষ্ট সমস্যাকেও বাড়িয়ে তোলে। জনগণ তাদের সদ্যপ্রাপ্ত অবকাশের সময়কে কীভাবে ব্যবহার করেছিলো ?

2.2 বিশ্রাম এবং উপভোগ

বিত্তবান ব্রিটিশদের জন্য অনেক আগে থেকেই একটি বাৎসরিক 'লন্ডন সিজন' (London Season) এর রীতি প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 300-400 সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য অপেরা, থিয়েটার এবং শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠানের মতো অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। শ্রমিক শ্রেণিও কাজের ফাঁকে মদ্যপানের উদ্দেশ্যে পানশালায় মিলিত হত এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদান করতো এবং মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠিত করত।

চিত্র 10 – লন্ডনের একটি বিখ্যাত রিসর্ট (Resort) বা ছুটি কাটানোর জায়গা। 1923 খ্রি. টি.ই. টার্নারের আঁকা ছবি।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে লন্ডনে আনন্দ উদ্যান (Pleasure garden) গড়ে ওঠে। যেগুলোতে স্বচ্ছল জনগণের জন্য খেলাধুলা, বিনোদন এবং খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ছিল।

ধীরে ধীরে সাধারণ লোকেদের জন্য বড়ো আকারের আমোদ-প্রমোদ তথা বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যম গড়ে ওঠে। যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সরকারি অর্থানুকূল্যে সম্ভবপর হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণের মধ্যে ইতিহাসের ধারণা দেওয়ার জন্য এবং ব্রিটেনের সাফল্য সম্পর্কে জনগণের মধ্যে গর্ববোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে প্রচুর সংখ্যক লাইব্রেরি, আর্ট গ্যালারি এবং সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়। প্রথমদিকে লন্ডনস্থিত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল বৎসরে কেবলমাত্র 15,000। 1810 খ্রি. সেখানে প্রবেশমূল্য তুলে দেওয়ায় দর্শনার্থীর সংখ্যা দ্রুতহারে বড়তে থাকে। 1824-25 খ্রি. দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল 1,27,643 যা কিনা 1846 খ্রিস্টাব্দে বেড়ে দাঁড়ায় 8,25,901 এ। নীচু শ্রেণির মধ্যে সংগীতসভা খুব জনপ্রিয় ছিল এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সব শ্রেণির দর্শকদের মধ্যে সিনেমা বিনোদনের একটি ব্যাপক জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ শিল্প শ্রমিকদের ছুটির দিনগুলো সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে কাটানোর জন্য উত্তরোত্তর উৎসাহিত করা হয়। যাতে করে তারা সূর্যের আলোয় এবং মুক্ত বাতাসে নিজেদের চাঙ্গা করে তুলতে পারে। 1883 খ্রি. 10 লাখেরও বেশি ব্রিটিশ জনগণ ব্ল্যাকপুলস্থিত সমুদ্রতটে ছুটি কাটাতে যায়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওই সংখ্যাটা 70 লক্ষের উপর চলে যায়।

চিত্র 11 – 1873 খ্রি. 'দ্যা ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ'-এ প্রকাশিত পূর্ব লন্ডনে, নাবিকদের মিলনস্থল বা বাড়ি (Sailor's Home)।
দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণি যেখানে বসবাস করত তার আশেপাশেই আমোদ-প্রমোদ তথা বিনোদনের স্থান তৈরি করে নিত।

চিত্র 12 – পানশালার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা ঘোড়ার গাড়ি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের একটি ছবি।

এই ছবি থেকে এটা পরিষ্কার যে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পানশালা আর ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক ছিল। রেল পরিষেবা শুরুর পূর্বে পানশালাই এমন একটি জায়গা ছিল যেখানে ঘোড়ার গাড়িগুলো এসে দাঁড়াতো। আর পরিশ্রান্ত ভ্রমণকারীরা সেখানেই খাওয়াদাওয়া, মদ্যপাণ এবং রাত্রিযাপন করত। পানশালাগুলো সাধারণতঃ ঘোড়াগাড়ি চলাচলের রাস্তার পাশেই অবস্থিত ছিল এবং সেগুলোতে রাত্রিযাপনের সুবন্দোবস্ত ছিল। রেল এবং বাসপরিবহণ ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পরে ঘোড়ার গাড়ির সাথে সাথে পানশালাগুলোর ব্যবসাও মুখ থুবড়ে পড়ে। রেলস্টেশন এবং বাস ডিপোর কাছেই পানশালা গড়ে ওঠে। তাদের যাত্রাপথে জনগণ সেখানে গল্পগুজব করার জন্য থামত এবং ঝটপট মদ্যপান করে চলে যেত।

3 শহরে রাজনীতি

1886 খ্রিস্টাব্দে শীতকালের তীব্র শৈত্যপ্রবাহের দিনগুলোতে কাজ করার জন্য ঘরের বাইরে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। লন্ডনের গরিব শ্রেণি তাদের তীব্র দরিদ্রতা থেকে মুক্তির দাবিতে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। ডেপ্টফোর্ড থেকে লন্ডনের দিকে এগিয়ে আসা 10,000 লোকের জোরদার ভিড়ের কারণে ভীত দোকানদাররা নিজেদের দোকান বন্ধ করে দেয়। মিছিলে হেঁটে আসা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগাতে হয়। 1887 সালের শেষের দিকেও এধরনের একটি দাঙ্গা সংগঠিত হয় এবং সেসময় পুলিশবাহিনী নৃশংস হাতে তা দমন করে। এই ঘটনা 1887 সালের 'নভেম্বরের রক্তাক্ত রবিবার' (Bloody Sunday of November 1887) নামে পরিচিত।

দুই বছর পরে লন্ডনের কয়েক হাজার বন্দর শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয় এবং শহরে মিছিল সংগঠিত করে। জনৈক লেখকের ভাষায় "কয়েক হাজার ধর্মঘটী শহরে মিছিল বের করে কিন্তু কোথাও কারো পকেট কাটা হয়নি, কিংবা কোনো জানালা ভাঙেনি..."। বন্দর শ্রমিক সংঘের স্বীকৃতি লাভের জন্যই 12 দিনব্যাপী এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

এই উদাহরণগুলো থেকে তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পার যে, বিরাট সংখ্যক জনগণকে একসাথে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করানো যেত। এভাবে শহরের বিপুল জনসংখ্যা সুবিধাজনক হওয়ার সাথে সাথে হুমকিস্বরূপও ছিল। শহরে বিদ্রোহের আশঙ্কাকে কমিয়ে আনার জন্য তথা শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিয়েছিল। এই ব্যাপারে প্যারিস শহরের উদাহরণ দেওয়া যায়।

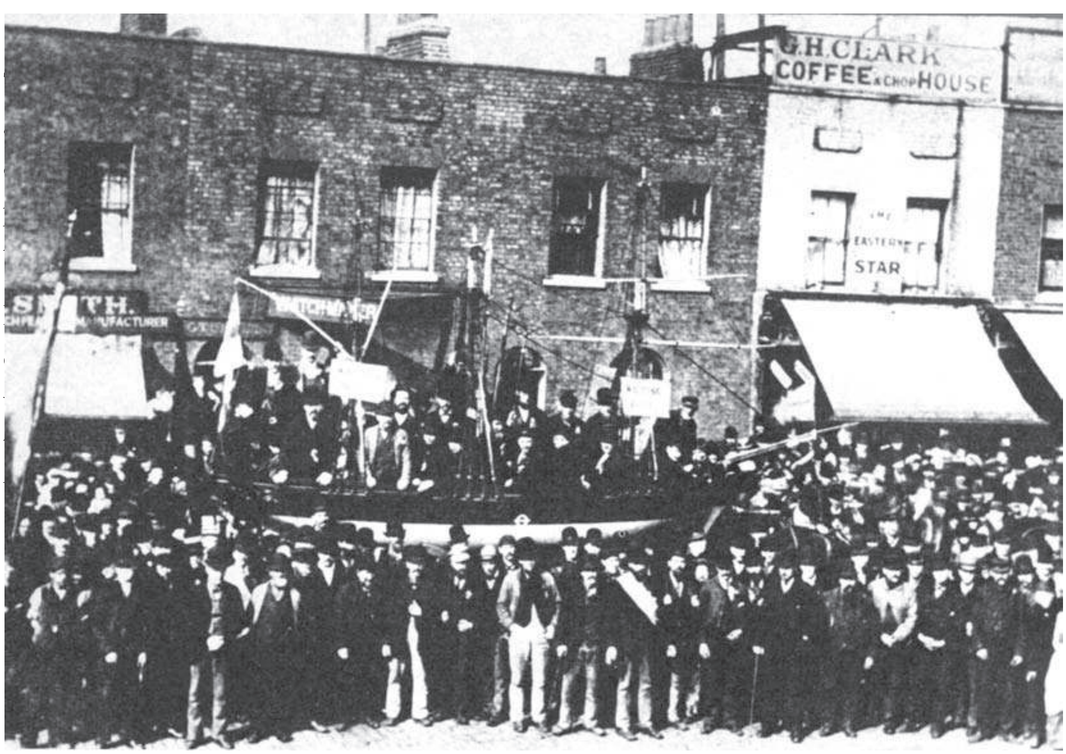

চিত্র 13 – 1889 খ্রিঃ বন্দর শ্রমিকদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মঘটের একটি দৃশ্য।

বক্স 1

প্যারিসের ইউসম্যানাইজেশন (Haussmanisation of Paris)

1852 খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় লুইস নেপোলিয়ন (নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এক ভাইপো) নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। ক্ষমতায় আসীন হয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে প্যারিস শহরের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করে দেন। নতুন প্যারিসের মুখ্য বাস্তুকার (architect) ছিলেন ব্যারন হউসম্যান (Baron Haussmann) তিনি ছিলেন সেইন (Seine) এর প্রধান। শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি তথা শৃঙ্খলা কায়েম রাখার জন্য প্যারিস শহরের বলপূর্বক পুনর্নির্মাণের সাথে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। রাজনৈতিক বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনার জন্য তথা শহরকে সুন্দর করে তোলার জন্য দরিদ্র জনগণকে শহরের মাঝখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়।

1852 খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ 17 বছর ধরে হউসম্যান প্যারিস শহরের পুনর্নির্মানের কাজ চালিয়ে যান। পুরো শহরে সোজা এবং প্রশস্ত রাস্তা বা boulevards নির্মাণ করা হয়, খোলামেলা জায়গা তৈরি করা হয় এবং বড়ো বড়ো গাছ লাগানো হয়। 1870 সালের মধ্যে প্যারিস শহরের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ রাস্তা হউসম্যানের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়। এরই সাথে শহরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়, রাত্রিকালীন টহলের ব্যবস্থা করা হয়, বাস রাখার জায়গা তৈরি করা হয় এবং জলের বন্দোবস্ত করা হয়।

এত বড়ো মাপের কাজ করার জন্য বিরাট সংখ্যক লোক নিযুক্ত করা হয়। 1860 এর দশকে প্যারিসের প্রতি পাঁচজনে একজন কর্মী নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ছিল। এই পুনর্নির্মাণের ফলে প্যারিসের মাঝখানে বসবাসকারী প্রায় 3,50,000 লোক বাস্তুচ্যুত হয়।

প্যারিসের কিছু বিত্তশালী বাসিন্দাও মনে করতেন যে, তাদের শহরকে বিকটভাবে বদলে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, 1860 খ্রিস্টাব্দের দিকে গনকোর্ট ভাইয়েরা (Goncourt brothers) নিজেদের লেখায় পুরোনো জীবনশৈলীর অবসান এবং এক উচ্চবর্ণীয় সংস্কৃতির বিকাশ হওয়ায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন যে, হউসম্যান একইরকম দেখতে 'বউলেভার্ডস' (boulevards) বা ছায়াযুক্ত সড়ক এবং ফেসেড্স (facades) বা দালানের সম্মুখভাগে পূর্ণ, ফাঁকা, একঘেয়েমিতে পূর্ণ শহর নির্মাণ করতে গিয়ে রাস্তাঘাট এবং তার আশপাশের জীবনধারাকে হত্যা করেন। 1866 খ্রি. লেখা 'মেইসন নুভে' (Maison Neuve) নামক নাটকে একজন বৃদ্ধ দোকানদার বলেন, 'বর্তমানে ছোটখাট প্রমোদ ভ্রমণের জন্যও কয়েক মাইল পথ যেতে হয়! এমন এক অনন্ত ফুটপাথ নির্মাণ করা হয়েছে যার কোনও শেষই নেই। 'একটি গাছ, একটি বেঞ্চ, একটি কিয়স্ক! একটি গাছ, একটি বেঞ্চ, একটি কিয়স্ক (কেবিন)! একটি গাছ, একটি বেঞ্চ...'

হউসম্যানের দ্বারা নির্মিত প্যারিসের বিরুদ্ধে চলা হই চই খুব শীঘ্রই পরিবর্তিত হয়ে নাগরিকদের কাছে গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই নতুন রাজধানী সমস্ত ইউরোপের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্যারিস বহু স্থাপত্য বিষয়ক, সামাজিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যা পুরো বিংশ শতাব্দীব্যাপী ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য অংশেও প্রভাব বিস্তার করে।

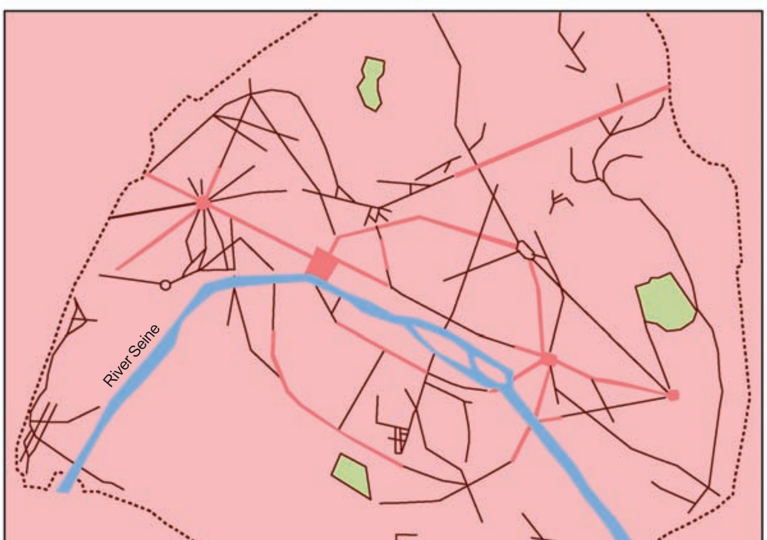

চিত্র 14 – ব্যারন হউসম্যানের দ্বারা 1850 থেকে 1880 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত প্যারিসের প্রধান সড়কগুলোর নকসা।

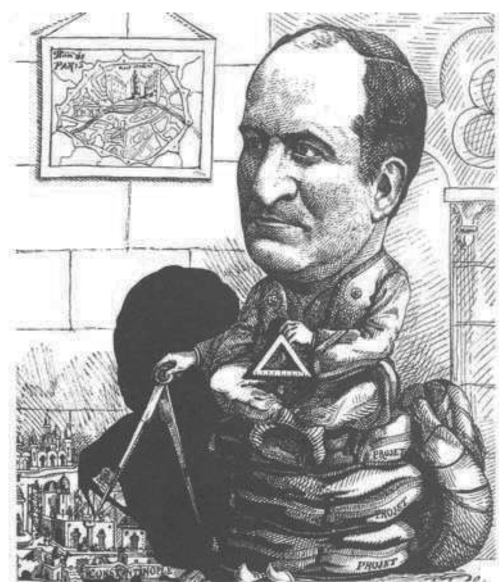

চিত্র 15 – ত্রিকোণ এবং কম্পাস হাতে প্যারিসের পরিকল্পনায় প্রভাববিস্তারকারী হিসেবে দেখানো হউসম্যানের একটি ব্যাঙ্গাচিত্র,— যাতে উনাকে 'সরলরেখার এটিলা' (Attila of the Straight Line) হিসেবে বলা হয়েছে।

4 ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শহর

উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের শহরগুলোর তুলনায় ভারতবর্ষের শহরগুলোর এত দ্রুত বিকাশ ঘটেনি। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষে শহরীকরণের গতি ছিল খুবই মন্থর। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে খুব বেশি হলে 11 শতাংশ ভারতীয় শহরে বসবাস করত। এই শহুরে জনসংখ্যার মধ্যেও একটা বড়ো অংশ তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের বাসিন্দা ছিল। এই শহরগুলো ছিল বহুবিধ সুযোগসুবিধা সম্পন্ন। সেগুলোতে প্রধান প্রধান বন্দর, গুদামঘর, বাড়িঘর, বিভিন্ন অফিস, সেনাবাহিনীর ছাউনি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যাদুঘর এবং গ্রন্থাগার প্রভৃতি ছিল। বোম্বাই ছিল ভারতের প্রধান শহর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্ন হতে এই শহরটির দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। 1872 সালে এর জনসংখ্যা ছিল 6,44,405 জন, যা 1941-এ বেড়ে দাঁড়ায় 15,00,000 এর কাছাকাছি।

চলো, আমরা দেখি বোম্বাই শহর কীভাবে বিকাশ লাভ করে—

নতুন শব্দ

প্রেসিডেন্সি শহর (Presidency cities)— ব্রিটিশ শাসনকালে বোম্বাই, বাংলা এবং মাদ্রাজের রাজধানীগুলো প্রেসিডেন্সি শহর নামে পরিচিত ছিল।

আলোচনা কর :

উৎস (খ) যত্নসহকারে পড়ো। শহুরে জীবনযাত্রার কোন্ কোন্ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লেখকেরা উল্লেখ করেছেন? উনারা কোন্ কোন্ পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরেছেন?

চিত্র 16 – বোম্বের নাল্ বাজারের একটি ব্যস্ত সড়ক। রাজা দীনদয়ালের তোলা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি ছবি।

উৎস (খ)

শহরগুলোর পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতা

Contradictory experiences of cities

কালীপ্রসন্ন সিংহ 1862 খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে কলিকাতা শহরের ভারতীয় অংশে একটি সান্ধ্যকালীন দৃশ্যের বর্ণনা করে বাংলায় একটি ব্যাঙ্গধর্মী রচনা লেখেন :

'ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, ইংরেজি জুতো, শান্তিপুরী মাফলার আর সিমলা ধুতির কল্যাণে আপনার পক্ষে উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ করা অসম্ভব। হাসি-ঠাট্টারত এবং ইংরেজিতে কথোপকথনরত দ্রুতগামী যুবকের দল কখনও এ দরজার তো কখনও ওই দরজায় টোকা দিচ্ছিল। সন্ধ্যার বাতিগুলো জ্বলার সময় তারা ঘর থেকে বেরিয়েছিল। আর যখন ময়দা কলগুলোর কাজকর্ম শুরু হবে তখন তারা বাড়ি ফিরে যাবে।... কারও কারও মুখ মাফলারে ঢাকা। তারা হয়তো ভাবে যে কেউ তাদের চিনতে পারবে না। এমন সন্ধ্যা... । একটি শনিবার এবং শহরে অস্বাভাবিক ভিড়।'

1862 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'হুতুম প্যাঁচার নকশা' কলিকাতা শহরের নাগরিক জীবন নিয়ে লেখা ছোটো ছোটো উপাখ্যানের সংকলন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটির অনুবাদ করেন।

1899 খ্রিস্টাব্দে জি. জি. আগরকর বোম্বাই সম্পর্কে লেখেন :

'বোম্বাই শহরের ব্যাপক বিস্তার; এর বিশাল তথা প্রাসাদোপম সরকারি ও বেসরকারি অট্টালিকা, চওড়া রাস্তা— যেগুলোতে একই সাথে ছয়-ছয়টি ঘোড়ার গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে... বিভিন্ন গলিতে ঢোকার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘন ঘন চলাচলকারী যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী রেলগাড়ির হুইসল এবং চাকার বিরক্তিকর শব্দ, বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে পকেটে রুপোর টাকা-পয়সা নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো ক্রেতা এবং তাদের প্রতিটি বাজারে ক্লান্তিকর দর কষাকষি, পোতাশ্রয়ে দৃশ্যমান হাজার হাজার নৌকার ভিড়, বারবার ঘড়ির দিকে নজর দেওয়া সরকারি এবং বেসরকারি কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন গতিতে ব্যস্তভাবে ছুটে চলা, ফ্যাক্টরির চিমনি থেকে নির্গত কালো ধুঁয়ার কুণ্ডলি এবং দালানের ভিতর থেকে আসা যন্ত্রপাতির বিকট আওয়াজ... । প্রত্যেক জাতি এবং পদমর্যাদার পুরুষ-মহিলা, সপরিবারে বা একা, ঘোড়ার পিঠে কিংবা গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে দিগন্তরেখায় ডুবন্ত সূর্যের তীর্যক আলোয় হাওয়া খেতে কিংবা গাড়ি চড়া উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়া... ।'

জি. জি. আগারকর কর্তৃক লিখিত 'দ্যা অভার্স সাইড অফ ব্রিটিশ রুল অর আওয়ার ডাইয়ার পভার্টি, (The Obverse Side of British Rule or our Dire Poverty) বই থেকে নেওয়া।

Source

4.1 বোম্বাই : ভারতের প্রধান শহর?

সপ্তদশ শতাব্দীতে বোম্বাই ছিল পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণাধীন সাতটি দ্বীপের একটি সমষ্টি। 1661 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সাথে পর্তুগালের রাজকুমারীর বিয়ের পর দ্বীপগুলোর নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতে চলে যায়। এর পরে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি পশ্চিম ভারতে নিজেদের মুখ্য বন্দর সুরাট থেকে তাদের কার্যালয় বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত করে।

চিত্র 17 – 1852 খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ের একটি দৃশ্য।
এই ছবিতে ডানদিকে তোমরা কোলাবা লাইট হাউস এবং দূরের পটভূমিতে সেন্ট থমাস গির্জাঘর দেখতে পাচ্ছ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও চিত্রশিল্পীরা ছবি আঁকার জন্য মনোরম জায়গা খুঁজে পেতেন। বড়ো আকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলো তখনও পর্যন্ত শুরু হয়নি।

শুরুর দিকে গুজরাট থেকে আসা সূতি কাপড়ের প্রধান বিক্রয়স্থল ছিল বোম্বাই। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বোম্বাই একটি বন্দর হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে তুলা এবং আফিমের মতো কাঁচামাল রপ্তানি করা হতো। ধীরে ধীরে এটা পশ্চিম ভারতের এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রেও পরিণত হয়ে পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এটা একটা প্রধান শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে।

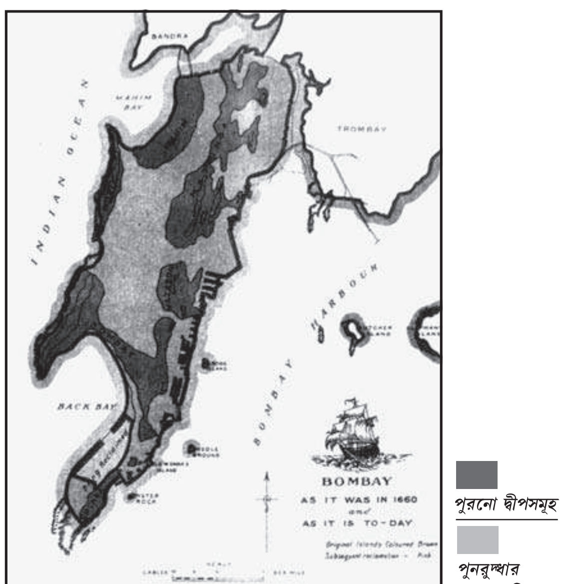

চিত্র 18 – 1930 এর দশকে বোম্বাইয়ের মানচিত্র, যাতে সাতটি দ্বীপ এবং পুনরুদ্ধার করা এলাকা দেখানো হয়েছে।

4.2 শহরে কর্মসংস্থান

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের পর 1819 খ্রি. বোম্বাই শহর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হয়। এর পরে শহরের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। কার্পাস এবং আফিমের বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রচুর ব্যবসায়ী, মহাজন, বিভিন্ন ধরনের কারিগর এবং দোকানদারও বোম্বাইয়ে এসে বসবাস করতে শুরু করে। কাপড়ের মিলগুলো স্থাপনের ফলে নতুন করে আরোও ব্যাপক সংখ্যক লোক শহরের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

বোম্বাইয়ে প্রথম সূতি কাপড়ের মিল 1858 খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। 1921 সালের মধ্যে সেখানে এমন 85টি কাপড়ের মিল চালু হয়ে যায় যেগুলোতে প্রায় 1,46,000 শ্রমিক কাজ করত।

1881 থেকে 1931 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাইয়ে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে কেবলমাত্র এক-চতুর্থাংশ এমন ছিল যারা বোম্বাইয়ে জন্মেছিল। বাকিরা সবাই বাইরে থেকে এসে সেখানে বসবাস শুরু করে। নিকটবর্তী রত্নাগিরি জেলা থেকে অনেক লোক বোম্বাইয়ের কাপড়ের মিলগুলোতে কাজের উদ্দেশ্যে চলে আসে।

1919 থেকে 1926 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাপড়ের মিলগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ২৩ শতাংশ ছিল। এর পরে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায় এবং মোট শ্রমশক্তির 10 শতাংশেরও নীচে এসে দাঁড়ায়। 1930 এর দশকের শেষের দিকে মহিলাদের কাজের জায়গা দখল করে নেয় মেশিন এবং পুরুষ শ্রমিকেরা।

বিংশ শতাব্দীর অনেক সময় পর্যন্ত ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর বোম্বাইয়ের কর্তৃত্ব ছিল, বোম্বাই শহর দু'টি মুখ্য রেলপথের সংযোগস্থলও (Junction) ছিল। রেল যোগাযোগের কারণে প্রচুর সংখ্যক লোক শহরে আসতে উৎসাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, 1888-89 খ্রিস্টাব্দে কচ্ছ এর শুষ্ক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ফলে অসংখ্য লোক বোম্বাইয়ে চলে আসে। শহরে অভিবাসীদের ঢল নামায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উদ্বেগ তথা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। 1898 খ্রিস্টাব্দে প্লেগজনিত মহামারির সময় দলে দলে বোম্বাই অভিমুখী জনগণের কারণে শঙ্কিত জেলা কর্তৃপক্ষ জনগণকে নিজেদের মূল স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া শুরু করে। 1901 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় 30,000 লোককে তাদের নিজেদের মূলস্থানে ফেরত পাঠানো হয়।

কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো এবং বক্তাদের নিম্নলিখিত প্রসঙ্গে পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে বলো।
'সম্প্রদায় এবং জীবনশৈলীর বিনাশ ছাড়া শহরের বিকাশ সম্ভবপর নয়। এটা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ'।

4.3 আবাসন এবং তার সন্নিহিত এলাকাসমূহ

বোম্বাই ছিল একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহর। 1840 এর দশকে প্রত্যেক লন্ডনবাসী গড়ে 155 বর্গগজ জায়গা ভোগ করত। যেখানে বোম্বাইয়ে এটা ছিল জনপ্রতি কেবলমাত্র 9.5 বর্গ গজ। 1872 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লন্ডনের প্রতিটি বাড়িতে গড়ে 8 জন লোক বাস করত, যেখানে ঐ সময়ে বোম্বাইয়ের জনঘনত্ব ছিল বাড়ি প্রতি গড়ে 20 জন। শুরু থেকেই বোম্বাই কোনোরকম নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বিকশিত হয়নি। বাড়িঘর, বিশেষত ফোর্ট এলাকায় ছড়ানো-ছিটানো বাগান বা উদ্যান ছিল। 1800 সালের শুরুর দিকে বোম্বাই ফোর্ট এলাকা শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যা দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি পরিচিত ছিল 'নেটিভ' নামে যেখানে বসবাসকারীদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়। আর অন্য অংশে ইউরোপীয় বা সাদা চামড়ার লোকেরা বাস করত। ফোর্ট-এর বসতি এলাকার উত্তর দিকে একটি ইউরোপীয় শহরতলি এবং শিল্প এলাকা বিকশিত হতে শুরু করে। দক্ষিণ দিকেও এইরকম শহরতলি এবং সেনা ছাউনি গড়ে ওঠে। এ ধরনের জাতিগত বৈষম্য তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরেই পরিলক্ষিত হতো।

চিত্র 19 – জে.এন. টাটার জন্য নির্মিত এসপ্লেনেড হাউসের অভ্যন্তরভাগ। ১৮৮৭ খ্রি. তোলা ছবি।

শহরের দ্রুত এবং অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে 1850 এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাসস্থান এবং জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়। কাপড়ের মিলগুলো চালু হওয়ায় বোম্বাইয়ের বসতি এলাকাগুলোতে আরও চাপ বাড়ে।

ইউরোপীয় অভিজাতদের মতো বোম্বাইয়ের ধনী পার্সি, মুসলিম এবং উচ্চবর্ণের বণিক তথা শিল্পপতিরাও উঁচু এবং বড়ো বড়ো বাংলোবাড়িতে বসবাস করত।

চিত্র 20 – 1826 খ্রিস্টাব্দে রবার্ট গ্রিন্ডলের আঁকা বোম্বাইয়ের একটি দৃশ্য।
ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, চৌরাস্তায় অনেকগুলো পালকি বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে 70 শতাংশেরও বেশি শ্রমিক শ্রেণির লোক ঘনবসতিপূর্ণ ‘চল’ (Chawl) এলাকায় বসবাস করত। শ্রমিকদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে যেতে হত। এজন্য 90 শতাংশ মিল শ্রমিক গিরনগাও নামক একটি মিল-গ্রামে বসবাস করত, যা মিলগুলো থেকে খুব বেশি হলে 15 মিনিটের হাঁটা দূরত্বে অবস্থিত ছিল।

‘চল’ (Chawl) ছিল বোম্বাইয়ের ‘নেটিভ’ অংশে অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি। এগুলোর নির্মাণ 1860 এর দশক থেকে শুরু হয়। লন্ডনের ‘টেনেমেন্টস (tenements) এর মতো এই বাড়িগুলোর মালিকও ছিল মূলত জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন এবং গৃহনির্মাণের সাথে যুক্ত ঠিকাদারগণ, যারা বাইরে থেকে আসা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকেদের কাছ থেকে দ্রুত এবং সহজে অর্থ রোজগারের ধান্দায় থাকত। প্রত্যেক ‘চল’ টেনেমেন্টের মতো ছোটো ছোটো এককামরার অনেকগুলো ঘরে বিভক্ত ছিল এবং এগুলোতে কোনো ব্যক্তিগত শৌচালয় ছিল না।

প্রতিটি ভাড়াবাড়িতে এক সাথে অনেকগুলো পরিবার বসবাস করত। ১৯০১ সালের জনগণনায় বলা হয় যে, দ্বীপের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ অর্থাৎ মোট জনবসতির 80 শতাংশ এক কামরাওয়ালা ভাড়াবাড়িতে বসবাস করত। অত্যধিক ভাড়ার কারণে শ্রমিকরা শহরে আগত নিজেদের আত্মীয়স্বজন বা স্বজাতির লোকেদের সাথে একটি কামরায় ভাগাভাগি করে বসবাস করতে বাধ্য হত। ঘরের ঠিক পাশেই পুঁতিগন্ধময় নর্দমা, শৌচালয়, মহিষের খামার প্রভৃতি থাকায় অত্যন্ত আর্দ্র আবহাওয়াতেও ঘরের জানালা সবসময় বন্ধ করে রাখতে হত। জল সরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যেক সকালে জল সংগ্রহ করা নিয়ে লোকেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকত। তবুও পর্যবেক্ষকদের মতে তাদের ঘরগুলো বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত।

ঘরগুলো ছোটো হওয়ায় জায়গার স্বল্পতার কারণে রান্নাবান্না, কাপড়-চোপড় ধোওয়া এবং ঘুমানোর জন্য শ্রমিকরা রাস্তাঘাট এবং আশেপাশের খালি জায়গাগুলো ব্যবহার করত।

কার্যাবলি

চিত্র [illegible]-এর দিকে তাকাও। কোন্ শ্রেণির লোক এই ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহার করত বলে তুমি মনে কর? চিত্র- [illegible] এ দেখানো ঘোড়ার টানা ট্রাম এবং বৈদ্যুতিক ট্রামের সাথে এর তুলনা করো : এই দুই ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার একটা উল্টো সম্পর্ক লক্ষ করো। ঘোড়ায় টানা বা বৈদ্যুতিক ট্রামে শুধুমাত্র একজন চালকের প্রয়োজন— অন্যদিকে শুধুমাত্র একজন যাত্রীর জন্য বেশ কয়েকজন পালকিবাহকের প্রয়োজন হত।

উৎস (গ)

কেন জায়গাগুলো পরিষ্কার করা সম্ভবপর হচ্ছিল না?

[illegible] খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়েরপুরসভারপ্রথম কমিশনারহিসেবে আর্থার ক্রফোর্ডকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বেশ কিছু বিপজ্জনক বাণিজ্যকে দক্ষিণ বোম্বাইয়ের বাইরে রাখতে চেষ্টা করেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে নির্মাণকারীরা এবং শিল্পোদ্যোগীরা খোলা জায়গাকে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো ব্যবহার করার জন্য পরিদর্শকদের ঘুষ দিত। যদিও তাদের কাজকর্মের ফলে দুষণের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলছিল :

“... কেসসোওজি নায়েক তার বস্ত্ররঞ্জকগুলো (dyers) পুনরায় উনার পুরনো কোয়ার্টারে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমি তাদের দোষী সাব্যস্ত করি, কিন্তু সফল হইনি। কেসসোওজি জলের মতো পয়সা খরচ করেন। বিশিষ্ট ডাক্তাররাও শপথ করে বলে যে, রং করার পাত্র স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী!... এই কুখ্যাত সফলতা দেখে জার্মানির একটি শক্তিশালী কোম্পানিও প্রভাদেবী মন্দিরের কাছে বাষ্পচালিত কাপড় রঙ করার একটি বিশাল কারখানা স্থাপন করার সাহস দেখায়। এর থেকে নির্গত নোংরা জল মাহিম উপসাগরের সুন্দর বালিকে দূষিত করে তোলে...। শেষে যা না বললেই নয়— ভোয়, দাস, সেনভি, ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত ধরনের জী-রা তাদের মর্জিমাফিক স্থানে, যেমন— বায়কুল্লা ক্লাব, রেসকোর্স, কামাথিপুরা ফোরাস রাস্তায়, খেতওয়াড়ি, গিরগাম রোড এবং চৌপাট্টির মতো জায়গায় সুতিবস্ত্র এবং সুতো বোনার কারখানা খুলে বসে।

এ ধরনের বর্ণনা পড়ার সময় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা ইংরেজদের সৎ এবং ভারতীয়দের দুর্নীতিগ্রস্ত, ইংরেজদের পরিবেশদূষণ সম্পর্কে সচেতন এবং ভারতীয়দের এই সমস্ত ব্যাপারে অনুৎসাহী বা অসচেতক হিসেবে দেখাত।

যেখানে খালি জায়গা পাওয়া যেত সেখানেই মদের দোকান এবং আখড়া (Akharas) খুলে যেত। অবসরকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মনোরঞ্জনের জন্যও রাস্তাঘাট ব্যবহৃত হত। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নিজের ছোটোবেলার সময়গুলো মনে করতে গিয়ে পার্বতীভাই ভোর লিখেছেন : "আমাদের চারটি 'চল' এর মাঝখানটায় একটা খোলা জায়গা ছিল। সেখানে জাদুকর, বানরের খেলা দেখানো লোকেরা অথবা ব্যায়ামের খেলা দেখানো লোকেরা এসে নিয়মিত তাদের খেলা ইত্যাদি দেখিয়ে যেত। সেখানে নন্দী নামে একটি ষাঁড়ও আসত। আমি বিশেষত কড়কলক্ষ্মীকে ভয় পেতাম। খাদ্যের জন্য তাদের দুজনের মারামারি আমাকে ভয় পাইয়ে দিত।" 'চল'গুলো রোজগার, ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং আন্দোলনের ব্যাপারে খবর আদান-প্রদানের অন্যতম জায়গা ছিল।

মিলগুলোর আশেপাশের বসতি এলাকার জনগণ জাতিগত এবং পরিবারগতভাবে দলবদ্ধ হয়ে বাস করত এবং তাদের দলপতি বা নেতা একজন গ্রাম-প্রধানের বরাবর ছিল। অনেক সময় মিল-শ্রমিকদের ঠিকাদার বা দালালরাই আশেপাশের স্থানীয় এলাকার সর্দার বা নেতা হত। শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা, খাদ্য সরবরাহের বন্দোবস্ত করা এবং প্রয়োজনে ছোটো-খাটো ধার দেওয়া ইত্যাদি কাজ ওই সর্দাররাই করে থাকত। রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর তারাই শ্রমিকদের জন্য নিয়ে আসত।

অবদমিত শ্রেণির জনগণের পক্ষে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা আরও কঠিন ছিল। অনেক 'চল' এ নীচু জাতির লোকেদের থাকতে দেওয়া হত না। প্রায়শইঃ ঢেউটিন, পাতা এবং বাঁশের খুঁটির দ্বারা নির্মিত ঘরে থাকতে তারা বাধ্য হত।

লন্ডনে নগর পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হয় সামাজিক বিপ্লবের ভয়ে। আর বোম্বাইয়ে এই কাজ হাতে নেওয়া হয় প্লেগ নামক মহামারি ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে। 1898 খ্রিস্টাব্দে "সিটি অফ বম্বে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট" স্থাপিত হয়। এই ট্রাস্ট শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত দরিদ্র জনগণের বসতিগুলো সরিয়ে শহরকে পরিচ্ছন্ন করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করে। এই ট্রাস্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী 1918 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 68,000 লোককে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়, কিন্তু কেবলমাত্র 14,000 লোককে নতুন বাসস্থান দেওয়া হয়। ঘরভাড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে 1918 খ্রিস্টাব্দে একটি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন (Rent Act) পাশ হয়। কিন্তু এর ফল হয় উল্টো। বাড়ির মালিকরা কম সংখ্যক ঘর ভাড়া দিতে শুরু করে। ফলে ভাড়া ঘরের সঙ্কট চরম আকার ধারণ করে।

বোম্বাই শহরের সম্প্রসারণে সবসময়ই একটি বড়ো সমস্যা হল জমির অভাব। যেসব পদ্ধতিতে এই বোম্বাই শহরের বিকাশ করা সম্ভব হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ব্যাপক জমির পুনরুদ্ধার (Reclamation) প্রকল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

4.4 বোম্বাইয়ে জমি পুনরুদ্ধার

তোমরা কি এটা জানতে যে, বোম্বাইকে যে সাতটি দ্বীপ মিলিয়ে বিকশিত করা হয় সেগুলো অনেকদিন ধরে জোড়া দেওয়ার কাজ চলছিল? এই কাজে সর্বপ্রথম প্রকল্পটি শুরু হয় 1784 খ্রিস্টাব্দে। বোম্বাইয়ের গভর্ণর উইলিয়াম হর্নবি বোম্বাইয়ের নিম্নাঞ্চলগুলোকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঐ সময় সমুদ্রের পাশে বিশাল প্রাচীর নির্মাণের কাজে অনুমোদন দেন।

চিত্র 21 – বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কলবাদেবী সড়কের পাশে নির্মিত একটি 'চল'।
এই দালানবাড়িতে কীভাবে জায়গার ব্যবহার করা হয়েছে বলে তুমি দেখতে পাও?

কার্যাবলি

মনে করো তুমি 'চল' এ বসবাসকারী একজন অল্পবয়সি ব্যক্তি। সেখানে তোমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একদিনের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

নতুন শব্দ

আখড়া (Akharas)— প্রথাগত কুস্তি শেখার জায়গা। এগুলো সাধারণত প্রত্যেক এলাকার আশেপাশে অবস্থিত ছিল যেখানে কমবয়সী লোকেরা শারীরিক এবং নৈতিক সক্ষমতা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ নিত।

অবদমিত শ্রেণি (Depressed classes)— এই শব্দটি এমন লোকেদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যাদের জাতপাতের হিসেবে 'নীচুজাতি' এবং 'অস্পৃশ্য' হিসেবে গণ্য করা হয়।

জমি পুনরুদ্ধার (Reclamation)— জলাভূমি বা জলে নিমজ্জিত এলাকা অথবা অন্য কোনো পতিত জমিকে বাসস্থান, কৃষি বা অন্য কোনও কাজের উদ্দেশ্য পুনরুদ্ধার করা।

ওই সময় হতে জমি পুনরুদ্ধারে বেশ কিছু প্রকল্প চালু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্যবসায়িক কারণে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন পড়ায় সরকারি এবং বেসরকারি কোম্পানি উভয়ে মিলে সমুদ্র হতে আরও বেশি জমি পুনরুদ্ধার করতে বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নেয়। বেসরকারি কোম্পানিগুলো অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিতে বেশি উৎসাহ দেখায়। 1864 খ্রিস্টাব্দে বেক বে রিক্লেমেশন কোম্পানি (Back Bay Reclamation Company) মালাবার হিল থেকে কোলাবার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলের জমি পুনরুদ্ধার করার স্বত্ব লাভ করে। জমি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়শই বোম্বের আশেপাশের পাহাড়ি এলাকার মাটি কেটে সমতল করা হত। যদিও অধিকাংশ বেসরকারি কোম্পানিগুলো বিপুল ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ হওয়ায় বন্ধ হয়ে যায়। তবুও 1870 এর দশকের মধ্যে বোম্বাই শহরের এলাকা বেড়ে প্রায় 22 বর্গমাইল-এ পৌঁছায়, বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ব্যবহারযোগ্য জমির প্রত্যেক অংশে নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং সমুদ্র অঞ্চল হতে আরও নতুন নতুন জমি পুনরুদ্ধারে কাজ চলতে থাকে।

চিত্র 22 – ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তোলা কোলাবা কসওয়ের (Colaba Causeway) ছবি।
এই ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, ট্রামগুলো ঘোড়ার দ্বারা টানা হচ্ছে। তোমরা বাঁদিকে ঘোড়ার আস্তাবল এবং পেছনে ট্রাম কোম্পানির কার্যালয় দেখতে পাচ্ছ।

‘বোম্বে পোর্ট ট্রাস্ট’ একটি সফল জমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প হাতে নেয়। ট্রাস্ট 1914 থেকে 1918 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একটি ড্রাই-ডক (Dry-dock) নির্মাণ করে এবং এর থেকে খুঁড়ে পাওয়া মাটি ব্যবহার করে 22 একর বিশিষ্ট ‘ব্যালার্ড-এস্টেট’ (Ballard Estate) বানিয়ে ফেলে। পরবর্তীকালে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত মেরিন ড্রাইভও গড়ে তোলা হয়।

চিত্র 23 – মেরিন ড্রাইভ।
বোম্বাইয়ের একটি সুপরিচিত জায়গা। বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্র হতে পুনরুদ্ধার করা জমিতে এটা গড়া হয়।

স্বপ্নের শহর বোম্বাই : সিনেমা এবং সংস্কৃতির জগৎ

বোম্বাইকে তার চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে কে না সম্পর্কিত করে? এখানকার ব্যাপক ভিড়াভড় এবং কঠিন জীবনযাত্রা সত্ত্বেও অনেকের কাছেই বোম্বাই একটি মায়াপুরী বা স্বপ্নের শহর।

বোম্বাইয়ের অনেক ছায়াছবির বিষয়বস্তু হল শহরে চলে আসা নবাগতরা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রকৃত কঠিন পরিস্থিতির সাথে তাদের মোকাবিলা। বোম্বাই চলচ্চিত্র শিল্পের কিছু জনপ্রিয় সংগীত শহরের পরস্পর বিরোধী দিকগুলো তুলে ধরে। সি.আই.ডি (1956) নামক ছায়াছবিতে নায়কের বন্ধু গান গায়— ‘এ দিল হে মুশকিল জিনা য়হা; জরা হট্‌কে জরা বচ্‌কে, ইয়ে হ্যায় বোম্বাই মেরি জান’। (আমার হৃদয়— এখানে বেঁচে থাকা মুশকিল একটু সরে যাও। তোমার যত্ন নাও। প্রিয়-এটা বোম্বাই) ‘গেস্ট হাউস’ (1959) ছায়াছবিতে আরও মোহভঙ্গ কণ্ঠে শোনা যায়— ‘জিস্‌কা জুতা উস্‌কি সর, দিল হে ছোটা বড়ে শহর। আরে বাহরে বাহ তেরি বোম্বাই’। (তোমার শহর বোম্বাই কি এক জায়গা! এখানে কেউ নিজের জুতোর দ্বারা নিজেই মার খায়। শহর বড়ো কিন্তু মানুষের হৃদয় ছোটো)।

বোম্বাই চলচ্চিত্র সর্বপ্রথম কখন উদিত হয়? হরিশচন্দ্র সাখারাম ভাটাওয়াদেকর নামে এক ব্যক্তি 1896 খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ের হেংগিঙ গার্ডেনস্ (Hanging Gardens) এ অনুষ্ঠিত একটি কুস্তি প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন এবং এটাই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম চলচ্চিত্র।

এর কয়েক বছর পরে 1913 খ্রিস্টাব্দে দাদাসাহেব ফালকে 'রাজা হরিশচন্দ্র' সিনেমাটি তৈরি করেন। এর পরে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। 1925 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ভারতের ফিল্ম ক্যাপিটেল বা চলচ্চিত্রের রাজধানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সেখানে দেশের সফল দর্শকদের জন্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ হতে থাকে। 1947 খ্রিস্টাব্দে প্রায় 50টি ভারতীয় ছায়াছবি তৈরি হয়। যা বানাতে 75.6 কোটি টাকা খরচ হয়। 1987 সাল আসতে আসতে এই চলচ্চিত্র শিল্পে কর্মরত লোকের সংখ্যা 5,20,000 এ দাঁড়ায়।

চলচ্চিত্র শিল্পে কর্মরত অধিকাংশ লোকই ছিল কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং লাহোরের মতো অন্য শহর থেকে আসা। বিভিন্ন ধরনের জায়গা থেকে আসা লোকজনের কারণে চলচ্চিত্র শিল্প একটি জাতীয় চরিত্র লাভ করে। লাহোর এবং তার পরে পাঞ্জাব থেকে আসা লোকেরা হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অনেক বিখ্যাত লেখক, যেমন— ইসমৎ চুঘতাই এবং সাদাত হাসান মান্টোর নাম হিন্দি ছায়াছবির সাথে জড়িয়ে আছে।

বোম্বাই শহরকে স্বপ্ন ও বাস্তবতা তথা বস্তি ও চক্‌মকে বাংলোবাড়ির একটি মিশ্রিত ভাবমূর্তি প্রদানে বোম্বাইয়ের সিনেমাগুলোর বিরাট অবদান ছিল।

আলোচনা করো :

উৎস (ঘ) পড়ো। এই কবিতা প্রতিটি নতুন প্রজন্মের জন্য সুযোগ এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপারে কী বার্তা দেয়?

উৎস (ঘ)

বোম্বের অনেক দিক

আমার বাবা সেহাদ্রিস থেকে এসেছিলেন
কাঁধে একটি কম্বল নিয়ে,
তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তোমার দ্বারে
শুধুমাত্র উনার শ্রমকে পুঁজি করে,
...
টিফিনের বাক্স নিয়ে আমি
যেতাম মিল-এ সেই শৈশব হতে
এভাবেই গড়ে উঠি আমি
যেভাবে কামার বানায় হাতুড়ি
আমি দড়ি পাকাতে শিখি
তাঁত যন্ত্রে কাজ করতে করতে
মাঝে মাঝে আমি শিখেছি
ধর্মঘটে শামিল হতে

খেটে খেটে আমার বাবা গেলেন চলে
তেমনভাবে যাবো আমিও— আমার সন্তানরাও যাবে এর পরে
হয়তো তাদেরও কাটাতে হবে বিষণ্ণ রাত্রি
অন্ধকারের কুণ্ডলি জড়িয়ে।

[illegible] খ্রিস্টাব্দে নারায়ণ সুর্ভে রচিত 'মাঝে বিদ্যাপীঠ' কবিতার অংশ।

এই কবিতার পঙক্তিগুলোতে চলচ্চিত্রের ঝক্‌ঝকে দুনিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়। এই পঙ্‌ক্তিগুলো শহরে আসা নবাগতদের সীমাহীন পরিশ্রম এবং কঠিন পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে।

বক্স 1

এশিয়ার দেশগুলোতে সমস্ত শহরই কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে বিকাশ লাভ করেনি। অনেক শহরকেই যত্নসহকারে চিন্তাভাবনা করে সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। আধুনিক সিঙ্গাপুর এমনই একটি শহর।

লি কুয়ান ইও-র সিঙ্গাপুর

আমাদের অধিকাংশের কাছেই সিঙ্গাপুর আজ একটি সমৃদ্ধশালী এবং সুপরিকল্পিত শহর। সারা বিশ্বের মধ্যে এই শহরটি নগর-পরিকল্পনার এক উল্লেখযোগ্য মডেল। বলা চলে যে, এই শহরটি অতিসম্প্রতি এই মর্যাদা লাভ করেছে। [illegible] খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর কেবলমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল এবং এশিয়ার অন্যান্য শহরের মতো সমস্যাগ্রস্ত ছিল। যদিও নগর-পরিকল্পনা নামক ব্যাপারটি [illegible] খ্রিস্টাব্দ থেকেই সিঙ্গাপুরে চালু ছিল কিন্তু এই পরিকল্পনা কেবলমাত্র সিঙ্গাপুরে শাসনকারী ক্ষুদ্র অংশের সাদা চামড়ার লোকেদের জন্যই কার্যকর হতো। শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাদেরই জনাকীর্ণ এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, জীর্ণশীর্ণ বাড়িঘরে দরিদ্রতার মধ্যে বসবাস করতে হত।

[illegible] খ্রিস্টাব্দে যখন 'পিপলস্ একশন পার্টি'র অধ্যক্ষ লি কুয়ান ইওর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা লাভ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় তারপর থেকেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। একটি ব্যাপক আবাসন এবং উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়, যা এই দ্বীপরাষ্ট্রের পুরো চেহারাটাই বদলে দেয়। পুরো পরিকল্পনার কর্মসূচি অনুযায়ী শহরের এলাকার প্রতিটি ইঞ্চির হিসাব রাখা হয়। প্রায় [illegible] শতাংশ জনগণের হাতে ভালো গুণমান সম্পন্ন বাসস্থানের মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করে সরকার ব্যাপক জনসমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়। উঁচু উঁচু আবাসনগুলোতে বায়ু চলাচল তথা অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয় যেগুলো ছিল বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার উত্তম উদাহরণ। এই উঁচু বাড়িগুলো শহরের সামাজিক জীবনকে নতুন রূপ দান করে। গলিপথগুলো বাইরের দিকে থাকায় শহরে অপরাধের মাত্রাও কমে যায়। বয়স্ক সদস্যদেরও তাদের পরিবারের সাথে থাকার জায়গা দেওয়া হয়। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য প্রত্যেক দালানে ফাঁকা মেঝে ('void decks' or empty floor) রাখা হয়।

শহরে বহিরাগতদের আগমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জাতিগত দ্বন্দ্ব প্রতিহত করতে প্রধান তিনটি গোষ্ঠীর (চিনা, মালয়ী এবং ভারতীয়) মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সংবাদপত্র, জার্নাল, সকলপ্রকার যোগাযোগ মাধ্যম এবং সংগঠনের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়।

1986 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় দিবসের শোভাযাত্রায় (National Day Rally) নিজ ভাষণে পরিকল্পনা শুরুর দিকের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে লিকুয়ান ইউ বলেন, "... যদি আমরা আমাদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতাম তাহলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হতামনা। যেমন : আপনার প্রতিবেশী কারা, আপনি কেমনভাবে জীবন-যাপন করেন, আপনি বেশি হই-চই বা গোলমাল করেন না তো, আপনি কোথায়, কীভাবে থুতু ফেলেন অথবা আপনি কোন্ ভাষায় কথা বলেন। আমরাই ঠিক করি— কোন্টা সঠিক। লোকে কী চিন্তা করে— তার পরোয়া আমরা করি না"।

দ্যা স্ট্রেইটস্ টাইমস্-এ উদ্ধৃত।

যদিও সিঙ্গাপুরের নাগরিকরা খুবই উচ্চমাত্রার আরাম আয়েস এবং সম্পদ ভোগ করে তবুও অনেকে মনে করেন যে, এই শহরে প্রাণবন্ত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশেষ অভাব রয়েছে।

চিত্র 24 – সমুদ্র ভরাট করে পাওয়া জমিতে নির্মিত সিঙ্গাপুর মরিনা (Singapore Marina)

কার্যাবলি

প্যারিসের ব্যারন হউসম্যান এবং তাঁর প্রায় একশো বছর পরে সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইওর দ্বারা করা কাজের তুলনা কর। এই প্রসঙ্গে আলোচনা কর যে, কেবলমাত্র সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই কি শহরে বস্তুগত সুযোগ সুবিধা এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা সম্ভব? তুমি কি মনে কর যে, জনগণ কীভাবে ব্যক্তিগত জীবন-যাপন করবে সে ব্যাপারে নিয়মকানুন তৈরির জন্য এটাই যথেষ্ট ভালো কারণ?

5 শহর এবং পরিবেশের চ্যালেঞ্জ

যেখানে যেখানে শহরের বিকাশ হয়েছে সেখানেই বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশের উপর তার প্রভাব পড়েছে। কলকারখানা, বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ক্রমবর্ধমান জায়গার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা পরিবর্তন করা হয়েছে। শহরগুলোতে উৎপন্ন হওয়া ব্যাপক পরিমাণে নোংরা আবর্জনা বায়ু এবং জলকে দূষিত করে। অন্যদিকে অতিরিক্ত শব্দ বা আওয়াজ যেন শহুরে জীবনযাত্রার একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বাড়িঘর এবং শিল্পক্ষেত্রে কয়লার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়। লিড্‌স, ব্র্যাডফোর্ড এবং ম্যানচেস্টারের মতো শিল্পনগরীর কারখানাগুলোর কয়েকশ চিমনি থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া বের হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। লোকে ঠাট্টা করে বলত যে, এই শহরের মানুষগুলো এটা বিশ্বাস করেই বড়ো হয়েছিল যে, আকাশটা আসলে ছাই রঙের এবং সমস্ত গাছপালা কালো। দোকানদার, বাড়ির মালিক এবং অন্যান্যরা পুরো শহরে ছেয়ে থাকা কালো কুয়াশা নিয়ে অভিযোগ জানায় যেগুলোর কারণে তারা ধোঁয়াজনিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তারা সহজেই রাগান্বিত হয়ে পড়ে এবং তাদের কাপড়-চোপড়ও নোংরা হতে থাকে।

জনগণ যখন প্রথমবার বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য প্রচারে শামিল হয় তখন তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই উপদ্রবকে নিয়ন্ত্রণ করা। যদিও কাজটি সহজ

চিত্র 25 – লন্ডনের ধোঁয়াশা। 1847 খ্রি. দ্যা ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ-এ প্রকাশিত ছবি। কারখানা এবং বাড়িঘরে ব্যবহৃত কয়লা হতে নির্গত ধোঁয়ায় পুরো লন্ডন ঢেকে যায়। ফলে শ্বাস নেওয়া বা রাস্তায় কোনও কিছু স্পষ্টভাবে দেখা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

ছিল না। কারণ কারখানা এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মালিকরা তাদের যন্ত্রগুলো উন্নত করার জন্য প্রযুক্তির পেছনে অর্থ খরচ করতে রাজি ছিল না।

1840-এর দশকের মধ্যে ডার্বি, লিডস এবং ম্যানচেস্টারের মতো কিছু শহরে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ধোঁয়া মাপা বা তার উপর নজর রাখা সহজ কাজ ছিল না। কারখানার মালিকরা নিজেদের মেশিনগুলোতে কেবলমাত্র ছোটো-খাটো পরিবর্তন করেন— যেগুলো ধোঁয়া বন্ধ করার ব্যাপারে কোনো কাজেই আসেনি। 1847 এবং 1853 খ্রিস্টাব্দের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ আইন (Smoke Abatement Acts of 1847 and 1853) বাতাসকে নির্মল করতে সর্বদা কার্যকরী হয়নি।

কলিকাতার বায়ুদূষণের ইতিহাসও অনেক পুরোনো। সেখানকার বাসিন্দারা সবসময়, বিশেষত শীতকালে ছাইরঙের ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে বাধ্য হত। কলিকাতা যেহেতু জলাভূমিতে গড়ে ওঠে ফলে সেখানে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হত এবং তা ধোঁয়ার সাথে মিশে গাঢ় কালো ধোঁয়াশার সৃষ্টি করত। শহরে উচ্চমাত্রার দূষণের পেছনে এর বিশাল জনসংখ্যাও দায়ী ছিল, যারা জ্বালানী হিসেবে ঘুঁটে এবং লাকড়ি ব্যবহার করত। যদিও কয়লা চালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিনের দ্বারা চলা বিভিন্ন শিল্প এবং প্রতিষ্ঠানগুলোই ছিল বায়ু দূষণের মুখ্য কারণ। ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রথমদিকে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী অথবা ক্ষতিকারক গ্যাস উৎপন্নকারী স্থানগুলোকে পরিষ্কার করতে মনস্থ করে। কিন্তু 1855 খ্রিস্টাব্দে রেললাইন চালু হওয়ার পরে এগুলোর সাথে যোগ হয় রানিগঞ্জ থেকে আসা কয়লা। ভারতীয় কয়লায় ছাইয়ের উপস্থিতির পরিমাণ বেশি যা সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলে। নোংরা মিলগুলোকে শহর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য অনেক নিষ্ফল আবেদন-নিবেদন করা হয়। কলিকাতা ছিল ভারতবর্ষের প্রথম শহর, যেখানে 1863 খ্রিস্টাব্দে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়।

1920 খ্রিস্টাব্দে টালিগঞ্জের ধানের মিলগুলো কয়লার পরিবর্তে ধানের তুষ জ্বালানো শুরু করে। যার ফলে আশেপাশের বাসিন্দারা অভিযোগ জানায় যে, "বাতাস কাল ভুসাকালিতে পরিপূর্ণ, যেগুলো সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গুঁড়িবৃষ্টির মতো পড়ে এবং এখানে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।' শেষপর্যন্ত বেঙ্গাল স্মোক নুইস্যান্স কমিশনের পরিদর্শক শিল্প থেকে নির্গত ধোঁয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আনেন। যদিও বাড়িঘর থেকে নির্গত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা অনেক অসুবিধাজনক ছিল।

কার্যাবলি

'বেঙ্গাল স্মোক নুইসেন্স কমিশন' এর পক্ষ থেকে শিল্প ক্ষেত্র হতে নির্গত ধোঁয়ার ক্ষতিকারক এবং বিপজ্জনক প্রভাব বর্ণনা করে এক কারখানা মালিকের উদ্দেশ্যে একটি নোটিশ লেখো। নোটিশে তাকে কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়ার বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে জানাও।

উপসংহার

সমস্তরকম অসুবিধা সত্ত্বেও স্বাধীনচেতা এবং সুযোগ সন্ধানী জনগণের কাছে শহর সবসময়ই একটি আকর্ষণীয় জায়গা। এমনকি এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখিত দুর্গাচরণ রায় রচিত উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই যে, কলিকাতার সব সুযোগ-সুবিধা দেখে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে দেবতাদের কাছে স্বর্গকেও এর তুলনায় অসম্পূর্ণ মনে হয়। তবুও নগরজীবনের যে সমস্ত দিকগুলো দেখে দেবতারা মর্মাহত হন সেগুলিই ছিল ওই লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতার নতুন পথ নির্দেশ, যারা শহরকেই নিজেদের বাড়ি বানিয়ে নেয়।

সংক্ষেপে লেখো

1. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে লন্ডনের জনসংখ্যা কেন বৃদ্ধি পায়?
2. ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লন্ডনে মহিলাদের জন্য সহজলভ্য কাজকর্মে কী ধরনের পরিবর্তন আসে? এই সমস্ত পরিবর্তন কী কী কারণে হয়— তা ব্যাখ্যা করো।
3. বিশাল শহুরে জনসংখ্যা থাকার ফলে নিম্নলিখিতগুলোর উপর কী প্রভাব পড়ে? ইতিহাস থেকে উদাহরণ নিয়ে বর্ণনা কর।
   a) একজন জমিদার।
   b) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট।
   c) একটি রাজনৈতিকদলের একজন নেতা।
4. নিম্নলিখিতগুলি ব্যাখ্যা কর :
   a) ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বচ্ছল লন্ডনবাসীরা কেন দরিদ্রদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন জানায়?
   b) কেন বোম্বাইয়ের বেশ ভালো সংখ্যক চলচ্চিত্র শহরের বাইরে থেকে আসা লোকেদের জীবনযাত্রার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়?
   c) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বোম্বাইয়ের জনসংখ্যা কেন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়?

আলোচনা কর :

1. ঊনবিংশ শতাব্দীতে লন্ডনে অবসরকালীন সময়ে জনসাধারণের বিনোদনের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা ছিল?
2. লন্ডনে পাতালরেলপথ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার পেছনে যেসকল সামাজিক পরিবর্তন দায়ী ছিল সেগুলো ব্যাখ্যা করো। এই পাতাল রেল পরিষেবাকে কেন সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়?
3. প্যারিসের হউসম্যানাইজেসন বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করো। এ ধরনের উন্নয়নের তুমি কতটুকু সমর্থন বা বিরোধিতা কর? এর সমর্থনে বা বিরোধিতায় যথেস্ট কারণ দেখিয়ে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লেখো।
4. সরকারি নিয়ম এবং নতুন নতুন আইন দূষণের সমস্যাকে কতটুকু সমাধান করেছে?

   নিম্নলিখিতগুলোর মানোন্নয়নে প্রণয়ন হওয়া আইনের সফলতা এবং ব্যর্থতার একটি করে উদাহরণ দাও।
   a) সামাজিক জীবন।
   b) ব্যক্তিগত জীবন।

প্রকল্প

এই অধ্যায়ে বোম্বাইয়ের যেসব ছায়াছবি বা চলচ্চিত্রের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আলোচিত একটি ছায়াছবি এবং বোম্বাইয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া সাম্প্রতিককালে তোমার দেখা অন্য কোনও একটি ছায়াছবিতে শহরটিকে যেভাবে দেখানো হয়েছে— তার তুলনা করো।

ভাগ III

প্রাত্যহিক জীবন, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি

মুদ্রণ সংস্কৃতি এবং আধুনিক পৃথিবী
(Print Culture and the Modern World)

মুদ্রিত বিষয়বস্তু ছাড়া এই পৃথিবীর কল্পনা করা আমাদের কাছে খুবই কষ্টদায়ক। আমাদের চারপাশে যেদিকেই তাকাই না কেন, সব জায়গাতেই আমরা মুদ্রিত বস্তু দেখতে পাব। যেমন— পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা, খবরের কাগজ, বিখ্যাত চিত্রের প্রতিলিপি, এছাড়াও প্রাত্যহিক কিছু অভিনয় মঞ্চের মতো অনুষ্ঠান, সরকারি বিজ্ঞপ্তি, দেওয়াল পঞ্জিকা, ডায়েরি, রাস্তার মোড়ে বিজ্ঞাপন এবং সিনেমার পোস্টার প্রভৃতি। আমরা ছাপানো সাহিত্য পাঠ করি, মুদ্রিত চিত্র দেখি, খবরের কাগজ থেকে খবর পড়ি এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে চলতে থাকা বিতর্কগুলো মুদ্রণের মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা সব সময় মুদ্রণ জগৎ এর অস্তিত্বকেই মেনে চলি। মুদ্রণের আগেও যে একটা সময় ছিল তা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। মুদ্রণেরও যে নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে সেটা মনে হয় আমরা একেবারেই অনুভব করি না। এমনকি এই ইতিহাসই আমাদের সমকালীন বিশ্বকে রূপদান করেছিল। এর ইতিহাস কী? কখন থেকে মুদ্রিত সাহিত্যের প্রসার শুরু হয়? আধুনিক বিশ্ব সৃষ্টিতে মুদ্রণের ভূমিকা কী ছিল?

এই অধ্যায়ে আমরা মুদ্রণের অগ্রগতিকে দেখব, কীভাবে এই মুদ্রণ পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু হয়ে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছিল। আমরা মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রসার এবং প্রভাবকে বোঝাতে পারব, এবং মুদ্রণ যন্ত্রের আগমনের ফলে মানুষের সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জগৎ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব।

চিত্র 1 – 1595 সালে, আখ্‌লাক্‌-ই-নাসিরি পুস্তকটি মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগে তৈরি করা হয়।

ভারতবর্ষে মুদ্রণযন্ত্র সূচনার অনেক আগে, ষোড়শ শতাব্দীর সময়ের একটি রাজকীয় কর্মশালা। চিত্রটিতে তোমরা দেখতে পাবে যে, পুস্তকগুলো প্রথমে মুখে বলে লেখানো হত এবং এরপরে ছবি তৈরি করা হত। মুদ্রণের আবিষ্কারের আগে পুস্তক তৈরির ক্ষেত্রে সুন্দর লিখন এবং অঙ্কনের অনেক গুরুত্ব ছিল। মুদ্রণযন্ত্রের আগমনের পর এই রকম শিল্পকর্মের কী হয়েছিল, তা ভেবে দেখো।

1 সর্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তকসমূহ

মুদ্রণের সবচেয়ে প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যা চিন, জাপান এবং কোরিয়াতে বিকশিত হয়েছিল। এই মুদ্রণ ব্যবস্থা ছিল হস্তচালিত। 594 সালের পর থেকে চিনে কালিযুক্ত কাঠের ফলকের মধ্যে কাগজকে ভালো করে ঘষে পুস্তক মুদ্রণ করা হত। কাগজগুলো পাতলা ও ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় তার উভয় পৃষ্ঠায় মুদ্রণ সম্ভব হত না। এই জন্য পারম্পরিক চিনা পুস্তক 'একর্ডিয়ন' (accordion book) এর কিনারাকে ভাঁজ করার পর সেলাই করা হত। সুদক্ষ কারুশিল্পী ও হস্তলিপিবিদ্যা (calligraphy) জানা লোকেরা অসাধারণ নিপুণতার সাথে পুস্তকগুলোর প্রতিলিপি প্রস্তুত করত।

নতুন শব্দ

হস্তলিপিবিদ্যা (Calligraphy)— সুন্দর ও রচনাশৈলী সম্পন্ন লিখনের কৌশল।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুদ্রণ সামগ্রীর সবচেয়ে বড়ো উৎপাদক ছিল চিন সাম্রাজ্য। চিনে একটি বিশাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল, যেখানে কর্মীদের নিযুক্ত করা হত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে। চিনা সাম্রাজ্য এইসব পরীক্ষার জন্য বিশাল পরিমাণ পুস্তক মুদ্রণ করত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তার সাথে মুদ্রণের পরিমাণও বেড়ে যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চিনে শহুরে সংস্কৃতির প্রকাশ পায়, এবং মুদ্রণের ব্যবহারের মধ্যেও বৈচিত্র আসে। তখন মুদ্রণ সামগ্রীর ব্যবহার শুধুমাত্র পণ্ডিত ও আধিকারিকরাই করত না, ব্যবসা সংক্রান্ত খবরাখবর সংগৃহীত হওয়ার ফলে ব্যবসায়িকরাও তাদের প্রাত্যহিক জীবনে মুদ্রণ সামগ্রী ব্যবহার করত। পড়াশুনা ক্রমবর্ধমানভাবে অবসর যাপনের একটি কার্যকলাপে পরিণত হয়েছিল। নতুন পাঠক সম্প্রদায়দের পছন্দের বিষয়ের মধ্যে ছিল কাল্পনিক কাহিনি, কবিতা, আত্মজীবনী, সেরা সাহিত্য সংকলন এবং প্রেমপূর্ণ নাটক প্রভৃতি। বিত্তশালী মহিলারাও পড়াশোনা আরম্ভ করে এবং কিছু সংখ্যক মহিলা স্বরচিত কবিতা এবং নাটকেরও প্রকাশনা করেছিল। আধিকারিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের স্ত্রীরা তাদের রচনাগুলোকে প্রকাশিত করে, এবং বারাঙ্গনারাও তাদের সামাজিক অবস্থা তথা জীবন সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেছিল।

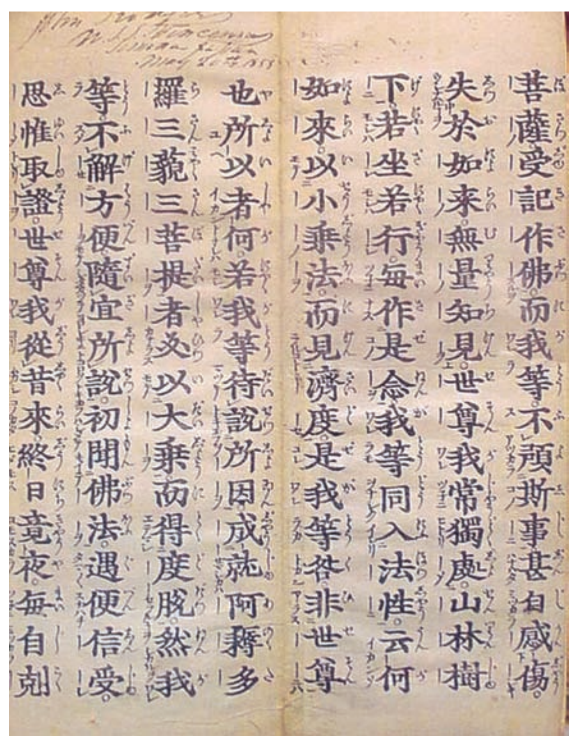

চিত্র 1(ক) – 'ডায়মণ্ড সূত্র' পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা।

পড়াশোনার এই নতুন সংস্কৃতির সাথে একটি নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা যুক্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলো চিনে ঘাঁটি স্থাপন করার সময় থেকেই পাশ্চাত্য মুদ্রণ প্রযুক্তি এবং যন্ত্রচালিত মুদ্রণ ব্যবস্থার আমদানি শুরু হয়। পাশ্চাত্য রীতিতে চালিত স্কুলগুলোর প্রয়োজনীয়তাকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সাংহাই নতুন মুদ্রণ সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। হস্তচালিত মুদ্রণের বদলে ধীরে ধীরে তখন যন্ত্রচালিত মুদ্রণের ব্যবহার শুরু হয়।

1.1 জাপানে মুদ্রণ ব্যবস্থা

768-770 খ্রি. এর কাছাকাছি সময়ে চিনের বৌদ্ধ প্রচারকগণ জাপানে হস্তচালিত মুদ্রণ কৌশলের সূচনা করে। জাপানের সবচেয়ে পুরোনো পুস্তক 'ডায়মন্ড সূত্র'। ছয় পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তকটি 868 খ্রি. মুদ্রিত হয় এবং কাঠের খণ্ডে ছবিগুলো খোদিত হয়। এই ছবিগুলোকে প্রায়ই কাপড়ে, তাস খেলার পাতায় এবং কাগজের মুদ্রায় ছাপানো

হত। মধ্যযুগীয় জাপানের কবি ও গদ্যকারেরা প্রতিনিয়ত তাদের লেখনিগুলো প্রকাশ করত, এই পুস্তকগুলো ছিল সস্তা এবং এইগুলো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, 'ত্রিপিটকা কোরিয়ান এর' কার্ডের ফলকের মুদ্রণটি, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের একটি কোরিয়ান সংগ্রহ। এই গ্রন্থটির প্রায় 80,000টি খণ্ড কার্ডের ফলকের মধ্যে খোদাই করা হয়। 2007 সালে এইগুলোকে 'ইউনেস্কা মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ লিপিবদ্ধ করা হয়।

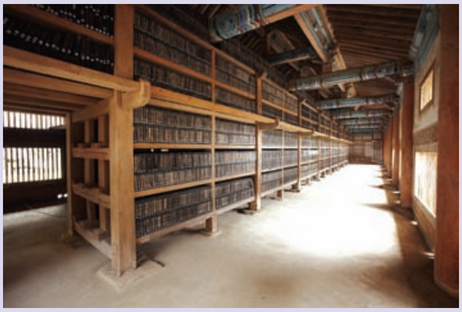

চিত্র 1(খ) – ত্রিপিটকা কোরিয়ানা

দৃশ্যমান বিষয়বস্তু তথা উপকরণের মুদ্রণ, প্রকাশনার ব্যাপক আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, এডো (Edo) (পরবর্তী সময়ে যেটি টোকিও নামে পরিচিত) এর উন্নত শহুরে এলাকার সংগৃহীত চিত্রগুলোকে একটি সুরুচিপূর্ণ শহুরে সংস্কৃতিতে তুলে ধরা হয়, যেখানে শিল্পী, বারাঙ্গনা এবং চায়ের দোকানের ভিড়কে দেখানো হয়েছে। হাতে ছাপানো বিভিন্ন ধরনের পুস্তক যেমন— মহিলাদের সম্পর্কে লিখিত পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, হিসেব-নিকাশ, চা-এর অনুষ্ঠান, ফুলবিন্যাস, শিষ্টাচার, রান্নাবান্না এবং বিখ্যাত স্থান-এর সম্পর্কে লিখিত পুস্তক প্রভৃতি দিয়ে গ্রন্থাগার এবং বইয়ের দোকানগুলো পরিপূর্ণ থাকত।

বাক্স 1

বিতাগাবা উতামারো, 1753 সালে এডো-তে (Edo) জন্মগ্রহণ করেন। উকিও (ভাসমান বিশ্বের ছবি) নামের একধরনের চিত্রকলা শৈলীতে কিতাগাবা উতামারো-র অবদানের জন্য তিনি সুপরিচিত। যেখানে বিশেষ করে শহুরে সাধারণ মানুষের জীবন অভিজ্ঞতাকে অঙ্কন করা হয়। এই চিত্রগুলো সমকালীন ইউরোপ এবং আমেরিকাতে গিয়ে পৌঁছায়, এবং ম্যানেট, মনেট ও ভ্যান গো এর মতো চিত্রশিল্পীরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতায়া জোজাবরো (Tsutaya Juzaburo) এর মতো প্রকাশকেরা বিষয়বস্তু নির্বাচন করে শিল্পীদের দিয়ে অঙ্কন বিষয়ের রূপরেখা তৈরি করত। এরপর কার্ডের ফলক খোদাইকারী দক্ষ শিল্পীরা চিত্রশিল্পীদের দ্বারা তৈরি করা রূপরেখা তথা ছবিগুলোকে কার্ডের ফলকের মধ্যে লাগিয়ে চিত্রশিল্পীদের নক্‌শাগুলোতে পুনরায় রূপদান করত। এই প্রক্রিয়াতে চিত্রশিল্পীদের দ্বারা তৈরি করা আসল চিত্রটি নষ্ট হয়ে যেত। শুধুমাত্র তার প্রতিরূপগুলোই থেকে যেত।

চিত্র 3 – কিতাগাবা উতামারোর দ্বারা তৈরি করা একটি উকিও ছবি।

চিত্র 4(ক) – সকালের একটি দৃশ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুন্মান কুবো-এর দ্বারা তৈরি করা একটি উকিও ছবি।
একজন পুরুষলোক জানালা দিয়ে বাইরের তুষারপাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেখানে মহিলারা চা তৈরি এবং অন্যান্য গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত।

2 ইউরোপে মুদ্রণের আগমন

শতবর্ষ ধরে ইউরোপে রেশম পথের (silk route) মাধ্যমে চিন থেকে রেশমবস্ত্র এবং মশলা দ্রব্য আসত। একাদশ শতাব্দীতে এই রেশম পথের মাধ্যমেই চিনা কাগজ ইউরোপে পৌঁছায়। এই কাগজগুলো লিপিকারদের মাধ্যমে লিখিত পাণ্ডুলিপি তৈরিকে সম্ভবপর করে তোলে। এরপর 1295 সালে মার্কো পোলো নামক একজন বিশিষ্ট অনুসন্ধানকারী বহু বৎসর চিন দেশে গবেষণা করার পর পুনরায় ইটালিতে ফিরে আসেন। যেমনটা তোমরা আগে পড়ে এসেছ যে, চিনের কাছে আগে থেকেই কাঠের ফলকে মুদ্রণের প্রযুক্তি মজুত ছিল। মার্কো পোলো নিজের সঙ্গে করে এই প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান নিয়ে ইটালিতে ফিরে আসেন। তখন ইটালিয়রাও কাঠের ফলকের মধ্যে পুস্তক মুদ্রণ করতে থাকে। এবং শীঘ্রই এই প্রযুক্তি ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাজকীয় সংস্করণগুলি তখনও অত্যধিক মূল্যবান ভেলাম তথা চর্মপত্র-এর উপর হাতে লেখা হত। কারণ সম্ভ্রান্ত শ্রেণি এবং ধর্মীয় গ্রন্থাগারগুলো সাধারণ মুদ্রিত বইগুলোকে সস্তা ও অশ্লীল বলে মনে করত। ব্যবসায়ী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সস্তায় মুদ্রিত পুস্তকগুলোকে ক্রয় করত।

পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্ত ইউরোপের পুস্তক বিক্রেতারা বিভিন্ন দেশে পুস্তকের রপ্তানি শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। পুস্তকের বর্ধিত চাহিদাকে মেটানোর জন্য নতুন পদ্ধতিতে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির উৎপাদানের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়। লিপিকার এবং সুদক্ষ লেখকেরা শুধুমাত্র সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতাতেই রোজগার পেতনা, বরং পুস্তক বিক্রেতারাও তাদের রোজগার দিতে লাগল। প্রায়শই একজন পুস্তক বিক্রেতার অধীনে 50-এরও বেশি লিপিকার কাজ করত।

কিন্তু পুস্তকের অতিরিক্ত চাহিদাগুলো হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি দিয়ে মেটানো যেত না। প্রতিলিপি প্রস্তুত করা অনেক ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। পাণ্ডুলিপিগুলো ভঙ্গুর হত এবং এইগুলোকে পরিচালনা করা, আনা-নেওয়া, বোঝাতে পারা খুব জটিল ছিল। এইজন্যই পুস্তকগুলোর প্রচলন সীমিত ছিল। পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঠের ফলকে মুদ্রণও ধীরে ধীরে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, ইউরোপে ব্যাপকভাবে কাঠের ফলকের ব্যবহার করে বস্ত্র, তাস খেলার পাতা এবং ছোটো ছোটো উপদেশাবলির সহজ সরল ধর্মীয় ছবি ছাপানো হত।

পুস্তক মুদ্রণের জন্য নিঃসন্দেহে একটি দ্রুততর এবং সস্তা মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রয়োজন ছিল। মুদ্রণের একটি নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমেই একমাত্র তা সম্ভব ছিল। 1430 এর দশকে, জন গুটেনবার্গ যখন জার্মানির স্ট্রেসবার্গ শহরে বিখ্যাত মুদ্রণ কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেখানে বিরাট সাফল্য আসে।

নতুন শব্দ

ভেলাম (Vellum)— এক ধরনের চর্মপত্র যা পশুর চামড়া থেকে প্রস্তুত হত।

চিত্র 4(খ) – জিকজি

কেরিয়ার জিকজি নাড়াচাড়াযোগ্য ধাতুর তৈরি ছাপার হরফ দ্বারা মুদ্রিত পুস্তকটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে অন্যতম একটি। এই পুস্তকটিতে জেন (Zen) (বৌদ্ধ ধর্মের এক বিশেষরূপ) বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি ও সূত্রগুলো রয়েছে। পুস্তকটির মধ্যে ভারত, চিন এবং কোরিয়ার প্রায় 150 জন বৌদ্ধ ভিক্ষুর উল্লেখ আছে। যদিও পুস্তকের প্রথম খণ্ডটিকে পাওয়া যায়নি, তবে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডটি ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এই কাজটি মুদ্রণ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত। এই জন্যই পুস্তকটিতে 2001 সালে 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে' লিপিবদ্ধ করা হয়।

কার্যাবলি

কল্পনা করো যে, তুমি মার্কো পোলো। চিনে তুমি মুদ্রণের জগৎ-এ যা কিছু দেখেছ, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি চিঠি লেখো।

2.1 গুটেনবার্গ এবং ছাপাখানা

গুটেনবার্গ ছিলেন একজন ব্যবসায়ীর ছেলে এবং তিনি একটি বিশাল কৃষিজ বাগান অঞ্চলের মধ্যেই বড়ো হয়ে উঠেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি মদ এবং জলপাই-এর তেল তৈরির যন্ত্র দেখে আসছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পাথর মসৃণ করার কলাকৌশলও আয়ত্ত করেন। এরপর তিনি একজন দক্ষ স্বর্ণকার হয়ে উঠেন এবং সিসাকে বিভিন্ন ছাঁচে ঢেলে ক্ষুদ্র অলঙ্কার তৈরি করার দক্ষতাও অর্জন করেন। গুটেনবার্গ এই বিশেষ জ্ঞানকে তার নতুন আবিষ্কারে প্রয়োগ করেন। ছাপাখানার জন্য জলপাইয়ের তেল আদর্শ ছিল, এবং বর্ণমালার অক্ষরগুলোকে ধাতব আকৃতিতে গড়ে তোলার জন্য ছাঁচের প্রয়োগ করা হত। 1448 সালের দিকে গুটেনবার্গ তার প্রযুক্তির কাজটিকে সম্পূর্ণ করেন। তাঁর মুদ্রিত প্রথম পুস্তকটি খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ছিল। বইটির প্রায় 180টি প্রতিলিপি তৈরি করতে তিন বছর সময় লাগে। তৎকালীন সময়ের হিসেবে কাজটি খুব কম সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

কিন্তু এই নতুন প্রযুক্তিটি হাতের মাধ্যমে পুস্তক তৈরির শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে বদলাতে পারেনি।

এমনকি, প্রথমদিকে মুদ্রিত পুস্তকগুলোর আকার-আকৃতি এবং সাজসজ্জাগুলো দেখতে প্রায় পাণ্ডুলিপির মতোই ছিল। ধাতুনির্মিত অক্ষরগুলো হাতের লেখা কারুকার্যময় শৈলীর অনুকরণ করত। পুস্তকগুলোর কিনারাতে ফুল পাতা দিয়ে নকশা তৈরি করা হত, এবং বিভিন্ন ধরনের চিত্র অঙ্কন করা হত। বিত্তবান লোকদের জন্য তৈরি করা পুস্তকের মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলোতে সাজসজ্জা ও কারুকার্যের জন্য স্থান ফাঁকা রাখা হত। প্রত্যেক ক্রেতা নিজেদের রুচিসম্মত নকশা চয়ন করতে পারত এবং চিত্রকলার স্কুলগুলোতে নিজেদের পছন্দসই ছবি অঙ্কন করতো।

1150 থেকে 1550 এই একশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপের অধিকাংশ দেশগুলোতে ছাপাখানা স্থাপিত হয়। জার্মানির মুদ্রকেরা অন্যদেশে গিয়ে নতুন ছাপাখানা চালু করার জন্য সচেষ্ট থাকত। ছাপাখানার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে, পুস্তক উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের বাজারে 2 কোটি মুদ্রিত পুস্তকের জোগান আসে। ষোড়শ শতাব্দীতে পুস্তক মুদ্রণের এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 20 কোটি।

চিত্র 5 – জোহান গুটেনবার্গের একটি প্রতিকৃতি (1584)।

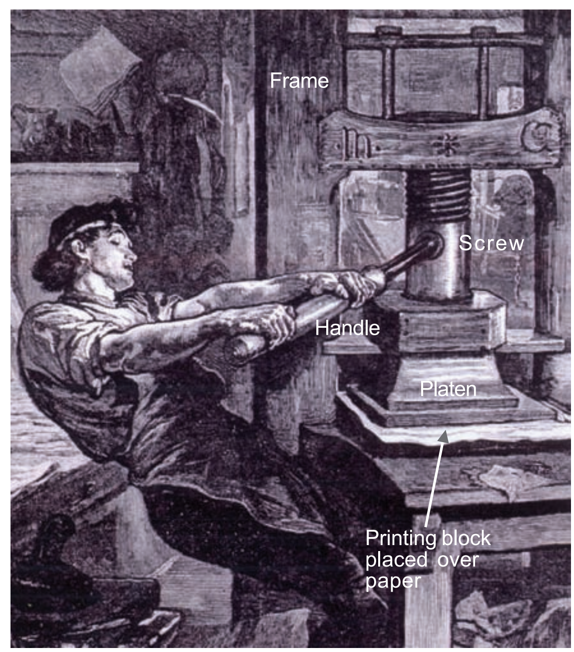

চিত্র 6 – গুটেনবার্গ ছাপাখানা।
স্ক্রু যুক্ত লম্বা হাতলটির দিকে লক্ষ করো। এই লম্বা হাতলের সাহায্যে স্ক্রু ঘুরিয়ে প্লেটেনের বোর্ডটি ভেজা কাগজের উপর চাপ দিত। গুটেনবার্গ রোমান বর্ণমালার 26টি অক্ষরের জন্য ধাতব ছাপার হরফ তৈরি করেন এবং মুদ্রণ যন্ত্রের অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে বইয়ের পৃথক পৃথক শব্দ রচনা করা হত। যদিও এই যন্ত্রটি 'মুভেবল টাইপ মেশিন' নামে পরিচিত ছিল, এবং এই যন্ত্রটিই পরবর্তী 300 বৎসর পর্যন্ত মুদ্রণ প্রযুক্তির ভিত্তিস্বরূপ ছিল। হাতে খোদাই করা কার্ডের খণ্ডের ছাপার ব্লক ব্যবহার করে মুদ্রণের তুলনায় বর্তমানে 'মুভেবল টাইপ মেশিন' ব্যবহার করে আরও দ্রুত বই ছাপা সম্ভব হয়। গুটেনবার্গ মুদ্রণ কারখানাতে প্রতি ঘণ্টায় 250টি পাত একদিকে (on oneside) ছাপানো হত। হস্তচালিত মুদ্রণের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত মুদ্রণের সূচনার ফলেই মুদ্রণ বিপ্লব ঘটে।

নতুন শব্দ

প্লেটেন (Platen)— অক্ষর মুদ্রণে, প্লেটেন একটি বোর্ড যা টাইপ থেকে প্রিন্ট পেতে কাগজের পেছনের দিকে চাপ দিত। প্রথমে প্লেটেন বোর্ড কাঠের হত, পরবর্তী সময়ে এই প্লেটেন বোর্ডকে ইস্পাত দিয়ে তৈরি করা হয়।

চিত্র 7 – ইউরোপের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, গুটেনবার্গ এর রচিত বাইবেলের কিছু পৃষ্ঠা।
গুটেনবার্গ 180টি প্রতিলিপি মুদ্রণ করে, যার মধ্যে 50টির অস্তিত্ব এখনো রয়েছে।
গুটেনবার্গের দ্বারা মুদ্রিত বাইবেল-এর পৃষ্ঠার দিকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ করো। এটা কেবলমাত্র নতুন প্রযুক্তি বিদ্যার অবদানই ছিল না, গুটেনবার্গ ছাপাখানায় পুস্তকগুলোকে ধাতুনির্মিত ছাপার হরফের মাধ্যমে মুদ্রণ করা হত। কিন্তু পুস্তকগুলোর কিনারাগুলোতে কারুশিল্পীরা খুব যত্ন সহকারে নকশা ও ছবি তৈরি করত। কোনো পুস্তকের দুটি প্রতিলিপি দেখতে একরকম হত না। পুস্তকের প্রতিটি পাতার প্রতিলিপি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যদিও প্রথমদিকে দুটি প্রতিলিপিকে দেখতে একইরকম বলে মনে হত, তবে ভালো করে তুলনা করার পরই তার পার্থক্যগুলোকে বোঝা যেত। অভিজাত শ্রেণিরা সর্বক্ষেত্রেই পুস্তকের এই বিশিষ্টতাকে পছন্দ করত। অভিজাত শ্রেণিদের কাছে যেই প্রতিলিপিটি ছিল, সেটাকে তারা অদ্বিতীয় বলে দাবি করতে পারত। কেন না অন্য কারোও কাছে সেই পুস্তকের হুবহু নকল ছিল না।
তোমরা লক্ষ করবে যে, পুস্তকটির কোনো কোনো জায়গায় অক্ষরের মধ্যে রং-এর ব্যবহার করা হয়েছে। এর দুটো উদ্দেশ্য ছিল : পাতাগুলো রঙিন হয়ে যেত এবং তার সাথে সমস্ত ধর্মীয় বাণীগুলো দৃশ্যমান ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে যেত। গুটেনবার্গ পুস্তকগুলোকে কালো রং-এ ছাপত, এবং পরে তার মধ্যে রং দেওয়ার জন্য জায়গা খালি রাখত।

চিত্র 8 – ষোড়শ শতাব্দীতে মুদ্রকদের একটি কারখানা।
ষোড়শ শতাব্দীতে মুদ্রকদের কর্মশালা দেখতে কীরকম হত, তা এই চিত্রটি থেকে বোঝা যায়। সমস্ত কাজকর্ম একই ছাঁদের তলে চলত। ডানদিকের সামনের অংশটিতে অক্ষর যোজকরা কাজ করত। বাদিকে মুদ্রণের ছাঁচ (golleys) তৈরি করা হত এবং ধাতব ছাপার হরফগুলোর উপর কালি প্রয়োগ করা হত। পেছনের দিকে মুদ্রকেরা মুদ্রণযন্ত্রের স্ক্রুটিকে ঘোরাত এবং তার পাশেই অক্ষর সংশোধকরা (Proofreaders) কাজ করত। একেবারে সম্মুখভাবে তৈরিকৃত বস্তু রাখা আছে। দুই পাতা সম্বলিত মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলোকে স্তুপীকৃতভাবে সুন্দর করে রাখা হয়েছে, যেগুলোর বাধানোর কাজ বাকি আছে।

নতুন শব্দ

অক্ষরযোজক (Compositor)— যেই ব্যক্তি পুস্তক মুদ্রণের জন্য অক্ষরকে সাজায়।
মুদ্রণের ছাঁচ (Galley)— ধাতু নির্মিত কাঠামো, যার মধ্যে ছাপার হরফগুলোকে বিছিয়ে পুস্তক তৈরি করা হয়।

3 মুদ্রণ বিপ্লব এবং এর প্রভাব

মুদ্রণ বিপ্লব কী ছিল? এটা শুধুমাত্র বিকাশই ছিল না, পুস্তক প্রকাশনার নতুন এক পথ, যা মানুষের জীবনকে পাল্টে দেয়, পুস্তকের পরিবর্তিত তথ্য এবং জ্ঞান থেকে, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কর্তৃপক্ষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বদলে যায়। এর ফলে লৌকিক চেতনার পরিবর্তন হয়, এবং কোনো কিছুকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন হয়।

চলো আমরা এই পরিবর্তনসমূহকে নিয়ে বিশ্লেষণ করি।

3.1 নতুন পাঠক শ্রেণি

ছাপাখানা আসার ফলে একটি নতুন পাঠক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। মুদ্রণের ফলে পুস্তকের মূল্য হ্রাস পায়। প্রতিটি পুস্তক প্রকাশনা করতে যে পরিমাণ সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হত, তা হ্রাস পায় এবং প্রচুর সংখ্যায় প্রতিলিপিগুলোকে অনায়াসে মুদ্রণ করা যেত। প্রচুর পরিমাণে পুস্তকের জোগানে বাজার ছেয়ে যায় এবং অনবরত পাঠক শ্রেণির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুস্তকের প্রাচুর্যের ফলে পড়াশোনার একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়। প্রথমদিকে পড়াশোনা কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তখন সাধারণ লোকেরা মৌখিক জগতের সংস্কৃতিতে বাস করত এবং তারা ধর্মীয় গ্রন্থের উপদেশ শ্রবণ করত, লোকগাথাকে পাঠ করে শোনানো হত, এবং উপাখ্যানগুলোকে বর্ণন করে শোনাত। মৌখিকভাবে জ্ঞানের আদান-প্রদান চলত। মানুষ সমবেতভাবেই কোনো গল্পের শ্রবণ করত, অথবা কোনো অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করত। তোমরা অষ্টম অধ্যায়ে দেখতে পাবে যে, তখন মানুষ স্বতন্ত্রভাবে এবং নীরবভাবে পাঠ করত না। মুদ্রণ বিপ্লবের আগে পুস্তক শুধুমাত্র ব্যয়বহুলই ছিল না, বরং তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মুদ্রণ করাও অসম্ভব ছিল। এখন সমাজের বিশাল অংশের জনগণের কাছে পুস্তক সহজেই পৌঁছে যায়। প্রথমদিকের মানুষ যদি শ্রোতা হত, তবে বলা যায়, এখন একটি নতুন পাঠক শ্রেণির আবির্ভাব হয়েছে।

কিন্তু এই পরিবর্তন এতটা সহজ ছিল না। পুস্তক শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকেরাই পড়তে পারত, এবং বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশগুলোতে সাক্ষরতার হার অনেক কম ছিল। পুস্তক প্রকাশকদের কাছে একটি প্রশ্ন ছিল যে, কীভাবে সাধারণ লোকেদের মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি আকর্ষিত করা যায়? এর জন্য তাদের, মুদ্রিত কাজকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার কথা স্মরণে রাখতে হত। এমনকি, যারা পড়তে পারত না, তারাও উচ্চারণ করে বই পড়া শুনে আনন্দ পেত। এই জন্য মুদ্রকেরা লোকগাথা এবং উপাখ্যান এর প্রকাশনা শুরু করে এবং এই ধরনের পুস্তকসমূহ সাধারণত ছবির দ্বারা ভালো করে চিত্রিত থাকত। এরপর এইগুলোকে সমবেতভাবে গ্রামীণ সভাতে অথবা শহরে সরাইখানাতে গাওয়া হত এবং পাঠ করে শোনানো হত।

এইভাবে মৌখিক সংস্কৃতি মুদ্রণ সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, এবং মুদ্রণ সামগ্রী মৌখিকভাবে প্রসারিত হয়। মৌখিক এবং পঠন সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভাজন সেটা অস্পষ্ট হয়ে উঠে। এছাড়া শ্রোতা এবং পাঠক শ্রেণি একে অপরের সাথে মিশে যায়।

কার্যাবলি

মনে করো যে, তুমি একজন পুস্তক বিক্রেতা, এবং নতুন মুদ্রিত সস্তা পুস্তকের উপস্থিতির ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দিতে চাও। তোমার দোকানের বাইরে লাগানোর জন্য একটি পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শব্দ

লোকগাথা (Ballad)— ঐতিহাসিক কাহিনি অথবা লোক-কথার স্তবক যেগুলো সাধারণত গাওয়া অথবা শোনানো হত।

সরাইখানা (Taverns)— যেখানে মানুষ একত্রিত হত মদ্যপান, খাওয়া-দাওয়া ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য, এছাড়া জায়গাটিতে খবরাখবরের আদান-প্রদান চলত।

3.2 ধর্মীয় বিবাদ এবং মুদ্রণের ভীতি

মুদ্রণ ব্যবস্থা চিন্তাধারার প্রসারের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং আলোচনা ও বিবাদ সংক্রান্ত একটি নতুন জগতের সূচনা হয়। শাসকগোষ্ঠীর বিচারধারাগুলোর সাথে অসহমত পোষণ করা লোকেরাও তখন নিজেদের বিচারধারাগলোকে মুদ্রণ ও প্রচার করত। মুদ্রিত বার্তার মাধ্যমে তারা মানুষকে আলাদা করে চিন্তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করাতে পারত, এছাড়া তাদের দিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়াতে পারত। সুস্পষ্টভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মুদ্রণের বিশাল তাৎপর্য ছিল।

মুদ্রিত পুস্তককে সবাই স্বাগত জানায়নি, এবং যারা স্বাগত জানিয়েছিল তারাও আবার এই বিষয়ে শঙ্কিত ছিল। মুদ্রিত পুস্তকের ব্যাপক প্রসার এবং মুদ্রিত শব্দের সহজলভ্য তার বিষয়টিকে নিয়ে অনেকের মনে আশঙ্কা ছিল যে, এই মুদ্রিত পুস্তক সাধারণ মানুষের মনে কী প্রভাব ফেলবে। একটা ভয় ছিল, যদি মুদ্রণ এবং পাঠ করা বিষয়গুলোর উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে মানুষের মধ্যে বিদ্রোহী এবং নাস্তিক মনোভাবের প্রসার লাভ করতে পারে। যদি এইরকম হয়, তবে 'মূল্যবান' সাহিত্যের প্রভাবই নষ্ট হয়ে যাবে। ধর্মগুরু এবং সম্রাটদের পাশাপাশি অনেক লেখক এবং চিত্রশিল্পীদের দ্বারা ব্যক্ত করা এই চিন্তাভাবনা, নব-মুদ্রিত এবং নব প্রচারিত সাহিত্যের সুদূর প্রসারী আলোচনার মূল ভিত্তি ছিল।

চলো আমরা দেখি যে, আধুনিক ইউরোপে শুরুরদিকে জীবনের একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্রে তার প্রভাব কী ছিল।

1517 সালে ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথার 'দ্যা নাইটি ফাইভ থিসিস' নামক দলিলে তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতিগুলোর অনেক সমালোচনা করে লিখেছিলেন। এই দলিলের একটি মুদ্রিত প্রতিলিপিকে তিনি বিটেনবার্গ-এর গির্জাঘরের দরজার মধ্যে লাগিয়ে দেয়। এই মুদ্রিত প্রতিলিপিটিতে চার্চের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতি নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয়। লুথারের লেখা নথিগুলো খুব অচিরেই প্রচুর সংখ্যায় মুদ্রিত হয় এবং ব্যাপকভাবে পড়া হতে থাকে। তার ফলস্বরূপ চার্চের মধ্যে বিভেদ চলতে থাকে এবং 'Protestant Reformation' প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মার্টিন লুথারের অনুবাদকরা 'নিউ টেস্টামেন্ট' (New Testament) এর 5000টি প্রতিলিপি বিক্রি হয়ে যায়, এবং তিন মাসের মধ্যে এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ জনসম্মুখে চলে আসে। মুদ্রণের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মার্টিন লুথার বলেন, মুদ্রণ ঈশ্বরের দেওয়া একটি মহানতম দান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। প্রকৃতপক্ষে অনেক বুদ্ধিজীবিরাও মনে করেন যে, মুদ্রণের ফলে নতুন একটি বৌদ্ধিক পরিবেশ তৈরি হয় এবং জনগণের মধ্যে একটি নতুন ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতি ছিল ধর্মসংস্কার আন্দোলন।

*চিত্র 9– জেকবভেন-ডার-শিলে (**J.V. Schley**) লাম্প্রিমেরি (**L'Imprimerie**) 1739. আধুনিক ইউরোপের প্রথমদিকে মুদ্রণযন্ত্রের আগমণের সময় উৎসবযাপনের ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ছবি। ছবিটিতে তোমরা দেখতে পাবে যে, মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে স্বয়ং স্বর্গের দেবী অবতরণ করছে। স্বর্গে দেবীর দুই পার্শ্বে অবস্থান করা মিনার্ভা (বিদ্যার দেবী) এবং মার্কারী (দেবদূত, বিবেক ও বুদ্ধির প্রতীক) যন্ত্রটির উপর কৃপা প্রদর্শন করছে। চিত্রটির সামনের দিকে মহিলারা পৃথক-পৃথক দেশের ছয়জন অগ্রণী মুদ্রকের প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে বসে আছে। মাঝখানে বসা মহিলাটির বা দিকে আড়াআড়িভাবে রাখা প্রতিকৃতিটি হল গুটেনবার্গের।*

নতুন শব্দ

প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলন— ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার আন্দোলন। মার্টিন লুথার ছিলেন প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম একজন। এই আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক খ্রিস্টীয় মত বিরোধী বেশ কিছু মতবাদের উৎপত্তি হয়।

3.3 মুদ্রণ এবং এর বিরোধিতা

মুদ্রিত জনপ্রিয় সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বল্প শিক্ষিত লোকেরা ধর্মমতের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যার সাথে পরিচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ম্যানোচিয়ো (Menocchio) নামে ইটালির একজন মিলের শ্রমিক তার নিজের এলাকায় সহজলভ্য বইগুলো পড়তে থাকে। তিনি বাইবেলের নির্দেশিত বাণীগুলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। এছাড়াও তিনি ঈশ্বর এক সৃষ্টি সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ তৈরি করেন। যার ফলে রোমান ক্যাথলিক চার্চের লোকেরা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই রকম ধর্মমত বিরোধী (heretical) বিচারকে দাবিয়ে রাখার জন্য যখন রোমান চার্চ ইনকুইশন (ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানের জন্য একটি ধর্মীয় বিচারালয়) শুরু করে, তখন ম্যানোচিয়োকে জোর পূর্বক দুইবার গ্রেফতার করা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জনপ্রিয় পুস্তক এবং ধর্মবিশ্বাসকে নিয়ে যেরকম খোলামেলা প্রশ্ন তোলা হয়, এর ফলে রোমান ক্যাথলিক চার্চ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের উপর রোমান চার্চ কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। 1558 সাল থেকে এইসব নিষিদ্ধ পুস্তকগুলোর তালিকা বানানোর কাজ শুরু করে।

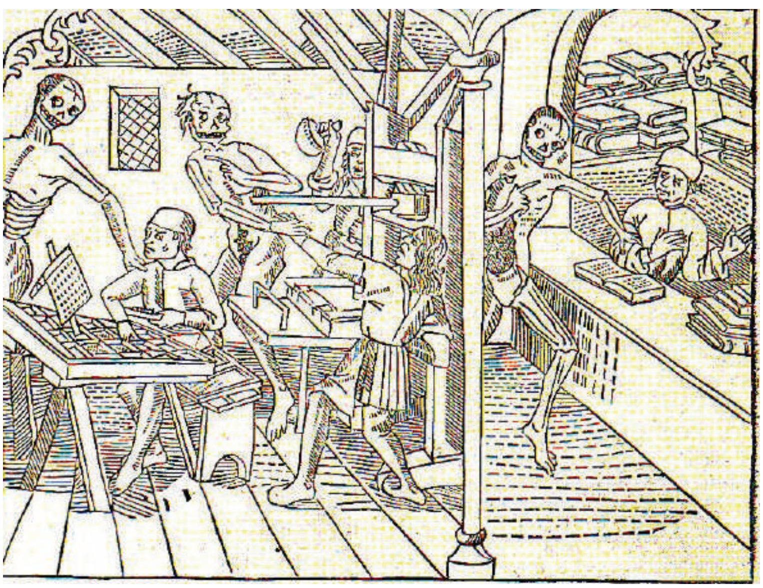

চিত্র 10 – ভীতিপূর্ণ নৃত্য।
ষোড়শ শতাব্দীতে এই ছবিটিতে, মুদ্রণের ভয়কে কীরকম নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করছে, তা দেখানো হয়েছে। এইরকম অতি আকর্ষণীয় কাঠে খোদাই করা মুদ্রণের আগমনকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যুক্ত করা হয়। মুদ্রকদের কারখানাগুলোর ভেতরে মৃত্যু নাচন এর মঞ্চ বানানো হয়। মুদ্রক এবং তার কর্মীরা কঙ্কালের নিয়ন্ত্রণে থাকত, এবং তাদের দিয়ে ইচ্ছেমতো জিনিস মুদ্রণ করাতো।

আলোচনা করো

কিছু লোকের মনে ভয় ছিল যে, মুদ্রণের প্রসারের ফলে ভিন্নমত পোষণকারী ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, এই ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

নতুন শব্দ

ইনকুইজিশান (Inquisition)— ধর্মদ্রোহীদের সনাক্তকরণ এবং শাস্তি প্রদানের জন্য সাবেকি রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় বিচারালয়।

ধর্মমত বিরোধী (Heretical)— মানুষের ধর্মবিশ্বাস যা চার্চের গ্রহণযোগ্যতার প্রতি অসহমত পোষণ করত। মধ্যযুগীয় সময়ে ধর্মদ্রোহীদের প্রতি চার্চের মনোভাব ছিল কঠোর। মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস কী ধরনের হবে তা স্থির করত চার্চ। ধর্মমত বিরোধীদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হত।

পূর্ণ পরিতৃপ্তি (Satiety)— পরিতৃপ্তির মাত্রা ছাড়িয়ে পূর্ণতা প্রাপ্তির অবস্থা।

রাষ্ট্রদ্রোহজনক (Seditious)— শাসক বিরুদ্ধাচরণকারী কাজকর্ম, বক্তব্য বা যে-কোনো লেখা, যেগুলোকে শাসক বিরোধী হিসেবে দেখা হয়।

উৎস (ক)

পুস্তক সম্পর্কে ভীতি

ইরাসমাস ছিলেন একজন ল্যাটিন পণ্ডিত এবং ক্যাথলিক ধর্মসংস্কারক। যিনি ক্যাথলিক ধর্মের বাড়বাড়ন্তকে নিয়ে সমালোচনা করেন। কিন্তু তিনি মার্টিন লুথারের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। মুদ্রণ ব্যবস্থাকে নিয়ে তিনি খুব আশঙ্কিত ছিলেন। 1508 সালে তিনি এডেজেস-এ (Adages) লিখেছেন :

'পৃথিবীর এমন কোন্ প্রান্ত আছে, যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুস্তক পৌঁছায়নি? হতে পারে যে, এখানে-সেখানে জানার উপযোগী কিছু অবদান সে রেখেছে। কিন্তু পুস্তকের বাড়বাড়ন্ত পাণ্ডিত্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। কারণ এটা একটা তাড়াহুড়োর সৃষ্টি করে, এমনকি ভালো কাজ ও পূর্ণতৃপ্তি আসাটা খুবই ক্ষতিকারক ব্যাপার.... [printers] (মুদ্রক) সমগ্র পৃথিবীটা শুধুমাত্র তুচ্ছ বই দিয়েই পরিপূর্ণ হচ্ছে না, (আমার লিখন) বরং অর্থহীন, অজ্ঞানতাপূর্ণ, কুৎসারটনাকারী, আবোল-তাবোল, ধর্মবিরোধী এবং রাষ্ট্রদ্রোহজনক পুস্তক ও মুদ্রিত হত। এইরকম মুদ্রিত (seditious) পুস্তকের সংখ্যা এত বেশি ছিল, যার ফলে মূল্যবান সাহিত্যগুলোর আর মূল্য থাকত না।

Source

4 পড়ার প্রবণতা

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চার্চগুলো গ্রামে স্কুল স্থাপন করে এবং কৃষক ও কারুশিল্পীদের শিক্ষিত করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের কিছু অঞ্চলে সাক্ষরতার হার 60 থেকে 80 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় দেশগুলোতে সাক্ষরতা এবং স্কুলের বিস্তৃতির সাথে সাথে সাধারণ লোকেদের মধ্যে পড়ার প্রবণতাও ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ লোকেরা বই পড়তে চাইত, ফলে মুদ্রকেরা প্রচুর পরিমাণে পুস্তকের মুদ্রণ করতে থাকে।

নতুন পাঠক শ্রেণির রুচির কথা মাথায় রেখে আধুনিক ধরনের জনপ্রিয় সাহিত্যের মুদ্রণ হতে দেখা যায়। গ্রামে গিয়ে ছোটো ছোটো পুস্তক বিক্রি করার জন্য পুস্তক বিক্রেতারা ফেরিওয়ালাদের নিযুক্ত করত। এই পুস্তকগুলোর মধ্যে বর্ষপঞ্জি অথবা আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত দেওয়াল পঞ্জি ছাড়াও লোকগাথা এবং গ্রাম্য উপাখ্যান ছিল। কিন্তু পুস্তকের অন্যান্য বিষয়বস্তুগুলো মূলত বিনোদনের জন্য সাধারণ পাঠকবর্গদের হাতে পৌঁছাতে থাকে। ইংল্যান্ডে ছোটো আকারের পুস্তক (Chapbook) বা ইংল্যান্ডীয় এক পেনিতে পাওয়া পুস্তক বিক্রি করা ফেরিওয়ালাদের Chapman বলা হত। এই পুস্তকগুলোকে গরিব লোকেরাও ক্রয় করতে পারত। ফ্রান্সে 'বিলিউটিক ব্লু' ("Biliotheque Bleue") এর প্রচলন ছিল, স্বল্প মূল্যের এই পুস্তকটি নীল রং-এর মলাটে বাঁধানো থাকত। এছাড়াও চার-পাঁচ পৃষ্ঠার প্রেমের কাহিনি মুদ্রণ করা হয় এবং বাস্তব সঙ্গতি সম্পন্ন কিছু 'ইতিবৃত্ত' ছিল, যেইগুলো থেকে আমরা অতীতের ঘটনাবলি জানতে পারি। বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং সুবিধার কথা মাথায় রেখে পুস্তকগুলোকে বিভিন্ন ধরনের আকৃতিতে তৈরি করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। এই পত্রিকাগুলোতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সাথে বিনোদন জগতের খবরাখবরও পরিবেশিত হত। খবরের কাগজ এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ ও ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্যাবলি ছাড়াও বিভিন্ন দেশের খবরাখবর থাকত।

একইভাবে তখন, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের চিন্তাধারাগুলো সাধারণ মানুষের নাগালের কাছে সহজেই পৌঁছে যেত। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান সম্মত পুস্তকের সংকলন প্রকাশ করা হয়, এছাড়া মানচিত্র তথা নক্শা ও বৈজ্ঞানিক ছবির অঙ্কনগুলো ব্যাপকভাবে মুদ্রিত হয়। আইজ্যাক নিউটনের মতো বৈজ্ঞানিকরা যখন তাদের আবিষ্কারগুলো প্রকাশ করতে শুরু করে তখন বিজ্ঞান মনস্ক এক বিশাল পাঠক সম্প্রদায় এতে অনুপ্রাণিত হয়। থমাস পাইন, ভলতেয়ার, জঁ জ্যাক রুশো এর মতো দার্শনিকদের লিখিত পুস্তকগুলো ব্যাপকভাবে মুদ্রিত ও পড়া হতে থাকে। এইভাবে বিজ্ঞান, যুক্তি তর্ক ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলো জনপ্রিয় সাহিত্যের মধ্যেও জায়গা পেতে থাকে।

নতুন শব্দ

ধর্মীয় সম্প্রদায় (Denominations)— কোন একটি ধর্মের উপগোষ্ঠী।

বর্ষ পঞ্জিকা (Almanac)— একটি বার্ষিক প্রকাশনা, যা আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত সূর্য ও চন্দ্রের গতি, জোয়ার ভাটা এবং গ্রহণের সময়সূচি ও মানুষের প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে দেয়।

ছোট আকারের পুস্তক (Chapbook)— ছোট পকেট আকৃতির পুস্তকের জন্য ব্যবহার করা একটি শব্দ। এইগুলোকে সাধারণত ফেরীওয়ালারা বিক্রি করত। যাদের Chapman বলা হত। ষোড়শ শতাব্দীর মুদ্রণ বিপ্লবের সময় থেকে এইগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

বাক্স- 2

1791 সালে, লন্ডনের একজন প্রকাশক জেমস লেকিনটন তার নিজের ডায়রিতে লিখেছেন—

'গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে সাধারণত বই বিক্রি আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। গরিব শ্রেণির কৃষক এবং গ্রামের লোক, যারা আগে তাদের শীতকালীন সন্ধ্যা অতিবাহিত করত ডাইনে, ভূত, প্রেত ও দুষ্ট পরির কাহিনি শুনে... কিন্তু এখন তাদের সন্তান সন্ততিদের দ্বারা পাঠ করা উপন্যাস ও কাহিনিগুলো মনোযোগ সহকারে শোনার ফলে শীতের রাত্রিও অনেক ছোটো বলে মনে হত। জন (John) যদি, শহরে ঘরের বোঝা নিয়ে যায়, তবে তাঁকে বলা হবে যে, তিনি যেন 'পেরিগ্রিন পিকেলস্ অ্যাডভেঞ্চার' নিয়ে বাড়ি ফিরেন... এবং ডলি (Dolly) যদি ডিম বিক্রি করতে যায়, তবে তাকে বলা হবে, *'দ্যা হিস্ট্রি অফ জোসেফ এনড্রিওস্'* ক্রয় করে আনতে।

4.1 'পৃথিবীর অত্যাচারী শাসকগণ, থর থর করে কাঁপো!'

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এইরকম বিশ্বাস জন্মেছিল যে, পুস্তকের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে অগ্রগতি এবং জ্ঞানের উদয় হয়। অনেক মানুষের এইরকম ধারণা ছিল যে, পুস্তক পৃথিবীটাকে বদলে দিতে পারে, এবং এমন একটি সময় আসবে যখন পুরো পৃথিবী থেকে স্বৈরতন্ত্র ও অত্যাচারী শাসকদের মুক্তি ঘটবে শুধুমাত্র বিবেক এবং বুদ্ধিই এই পৃথিবীবিকে শাসন করবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের একজন ঔপন্যাসিক লুইস সেবাস্তিয়েন মার্সিয়া, ঘোষণা করেন যে, "ছাপাখানা হল প্রগতির সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র। জনসাধারণের মতামতের উপর ভিত্তি করে একদিন 'স্বৈরতন্ত্রবাদের' (despotism) বিদায় ঘটবে। মার্সিয়ারের উপন্যাসগুলোর মধ্যে, নায়কেরা প্রায়ই পুস্তক পাঠ করার মধ্য দিয়ে বদলে যেত। তারা ভালো করে পুস্তকগুলোকে পড়ত, পুস্তকের জগতে তারা হারিয়ে যেত, এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা জ্ঞান অর্জন করত। জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা এবং স্বৈরতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ছাপাখানার ব্যর্থ ক্ষমতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন মার্সিয়া। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "পৃথিবীর অত্যাচারী শাসকগণ, এখন তোমরা থর থর করে কাঁপবে! শক্তিশালী লেখকদের লেখনির সামনে তোমরা কেঁপে উঠবে!"

4.2 মুদ্রণ সংস্কৃতি ও ফরাসি বিপ্লব

অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, মুদ্রণ সংস্কৃতির ফলেই ফরাসি বিপ্লবের জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমরা কি এই দুটোর মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি?

সাধারণত এখানে তিন ধরনের মতামত রাখা হয়েছে।

প্রথমত, মুদ্রণের ফলে জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রসার হয়। তাদের পুস্তকগুলোতে একসাথে পরম্পরাগত ঐতিহ্য, অন্ধবিশ্বাস এবং স্বৈরতন্ত্রবাদের উপর সমালোচনামূলক মন্তব্য করা হয়েছে। তারা প্রচলিত রীতি নীতির পরিবর্তে বিবেক বুদ্ধির দ্বারা শাসন পরিচালনার উপর জোর দিয়েছিল, এবং সবকিছুকে বিবেক বুদ্ধি এবং যৌক্তিকতার প্রয়োগের মাধ্যমেই বিচার করার দাবি তোলে। তারা চার্চের ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং রাজ্যের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার উপর আঘাত হানেন, এর ফলে পরম্পরাগত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সমাজ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পরে। ভলতেয়ার এবং রুশোর লিখিত পুস্তকগুলোকে ব্যাপকভাবে পাঠ করা হয়। যারা এই বইগুলোকে পড়ে, তারা এই বিশ্বকে নতুন করে প্রশ্ন, বুদ্ধি এবং সমালোচনার চোখে দেখতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রণ ভাববিনিময় এবং তর্ক-বিতর্কের একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। সমস্ত ধরনের নিয়ম এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূনর্মূল্যায়ন করা হয়, এবং সেইসব জনসাধারণের দ্বারা বিচার করা হয়, যারা বিবেক বুদ্ধির ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। তৎকালীন চিন্তাধারা এবং বিশ্বাসের উপর প্রশ্ন তোলার প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়েছিল। এইভাবে 'সর্বজনীন কৃষ্টির' মধ্য থেকে সামাজিক বিপ্লবের নতুন ধারণার উৎপত্তি হয়।

তৃতীয়ত, 1780 এর দশকের দিকে রাজকীয় ক্ষমতা এবং তার নৈতিকতাকে নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করা সাহিত্যের ভিড় তথা ঢল দেখা যায়। সাধারণত ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রগুলো দেখে ধারণা করা যায় যে, রাজ্যের শাসনকর্তারা আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় মগ্ন

উৎস (খ)

মার্সিয়ার নিজের এখটি পুস্তকে মুদ্রিত শব্দ ও অধ্যয়নের শক্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছে :

'যদি কেউ আমাকে পাঠরত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি হয়তো আমাকে একজন অতি তৃষ্ণার্ত মানুষের সাথে তুলনা করবে, যারা বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার পর ঢোক ঢোক করে পান করতে থাকে... ভালো করে লণ্ঠনের আলো জ্বালানোর পর আমি নিজেকে পুস্তক পাঠ করার মধ্যে বিলিয়ে দিতাম। অনর্গলভাবে আমি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে চলতাম। নীরবতাপূর্ণ সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ি বেজে চলত, এবং তা আমি শুনতে পেতাম। তেলের অভাবে আমার লণ্ঠনের আলো কমে গিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দেখা যেত, কিন্তু তখনও আমি পড়তেই থাকতাম। এমনকি, আমি লণ্ঠনের আলো বাড়ানোর সাহসও করতাম না, কারণ আমার পড়ার আনন্দে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে। এইসব নতুন চিন্তাধারা কীকরম বেগে আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করত! আমার বুদ্ধি কীভাবে তাদের গ্রহণ করত!'

উদ্ধৃত অংশটি 1995 সালের রবার্ট ডার্নটনের পুস্তক 'দ্য ফরবিডেন বেস্ট সেলার অফ প্রি-রিভিওলুস নারী ফ্রান্স' থেকে নেওয়া।

নতুন শব্দ

স্বৈরতন্ত্রবাদ (Despotism)— এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা, যেখানে কোন একজন ব্যক্তি বিশেষই সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। এবং সেই ব্যক্তি আইনি ও সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকেন।

ছিল। যেখানে সাধারণ নাগরিকদের অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করতে হত। এই সাহিত্যটি গোপনে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠে।

আমরা কীভাবে এই যুক্তি তর্কগুলোকে বুঝব? এতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, মুদ্রণ চিন্তার ধারণার প্রসারে অনেক সাহায্য জুগিয়েছে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই একটি কথা স্মরণ রখতে হবে যে, মানুষ শুধুমাত্র একধরনের সাহিত্যই পাঠ করে না। একদিকে যদি তারা ভলতেয়ার এবং রুশোর লিখিত পুস্তক পাঠ করত, অন্যদিকে আবার তারা রাজতন্ত্র এবং চার্চের ধর্মনীতি ও মতপ্রচারের জন্যও কাজ করত। তারা যা কিছু পড়ত বা দেখত এই সব কিছু থেকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত হতো না। তারা কিছু বিচারধারা ও মতকে স্বীকার করে নেয়, আবার কিছু বিচারধারার প্রত্যাখানও করে। তারা বস্তুগুলোকে নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করত। মুদ্রণ যদিও সরাসরিভাবে তাদের মনকে পরিবর্তন করতে পারেনি। কিন্তু এটি অন্য একভাবে চিন্তা করার সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দেয়।

কার্যাবলি

মনে করো যে, তুমি ফরাসি বিপ্লবের আগের একজন ব্যাঙ্গা চিত্রকার। কোনো একটি কাগজের মধ্যে একটি ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রের নকশা তৈরি করো।

চিত্র 11 – অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি ব্যাঙ্গাচিত্রে, ফরাসি বিপ্লবের পূর্বের অভিজাত শ্রেণি এবং সাধারণ জনগণকে দেখানো হয়েছে।

এই ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ—কৃষক এবং কারুশিল্পী—অন্যান্য শ্রমিকেরা কীরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে, যেখানে অভিজাত শ্রেণিরা আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করছে ও সাধারণ জনগণদের শোষণ করে চলছে। ফরাসি বিপ্লবের আগে এই ধরনের ব্যাঙ্গাচিত্রের প্রচারের ফলে সাধারণ লোকের চিন্তাধারার উপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

আলোচনা করো :

কিছু ঐতিহাসিকগণ কেন এইরকম মনে করেন যে, মুদ্রণ সংস্কৃতিই ফরাসি বিপ্লবের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল?

5 ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে গণসাক্ষরতার ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। শিশু, মহিলা ও শ্রমিকদের মধ্যে নতুন পাঠকশ্রেণি তৈরি হয়।

5.1 শিশু, মহিলা এবং শ্রমিক

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামুলক করা হলে, শিশুরা গুরুত্বপূর্ণ পাঠকশ্রেণিতে পরিণত হয়। প্রকাশন শিল্পের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছাপানো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 1857 সালে ফ্রান্সে শুধু শিশু সাহিত্য প্রকাশনার জন্য একটি প্রেস বা ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এই ছাপাখানা থেকে নতুন বইয়ের পাশাপাশি পুরাতন রূপকথার গল্প ও লোকগাঁথাও প্রকাশিত হয়। জার্মানির গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় অনেক বছর ধরে কৃষকদের কাছ থেকে ঐতিহ্যগত লোককাহিনি সংগ্রহ করে। সংগৃহীত গল্পগুলো সম্পাদনা করে 1812 সালে বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হয়। শিশুদের জন্য অনুপযুক্ত বিষয়, বা অভিজাত সম্প্রদায় যেসব বিষয়ক অশ্লীল বলে মনে করতেন তা প্রকাশিত সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এইভাবে গ্রামীণ লোকগাথাগুলো নতুন রূপ পায়। মুদ্রণ যন্ত্র আসার ফলে এই প্রাচীন গল্পগুলো লিপিবদ্ধ হতে থাকে, তবে গল্পগুলোর রূপে কিছু পরিবর্তন ও আসে।

মহিলারা পাঠক এবং লেখিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। পেনি ম্যাগাজিনগুলো (12 নং চিত্র দেখো) বিশেষভাবে মহিলাদের জন্যই ছাপা হত। আবার সঠিক আচরণ ও গৃহস্থালি বিষয়ক নির্দেশাবলি মহিলাদের জন্যই লেখা হত। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন উপন্যাস লেখা শুরু হয়, তখন মহিলাদেরকেই গুরুত্বপূর্ণ পাঠক হিসেবে দেখা হয়েছিল। কিছু বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন নারী : যেমন— জেন অস্টিন, বোন্টে সিস্টার্স, জর্জ এলিয়ট, তাঁদের লেখার মাধ্যমে নারীদের নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় : এমন নারী যাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা ছিল।

চিত্র 12 – পেনি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদপট।
1832 এবং 1835 সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে 'সোসাইটি ফর দি ডিফুসন অব ইউজফুল নলেজ' দ্বারা পেনি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল। এটি মূলত শ্রমিক শ্রেণির জন্য প্রকাশিত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ঋণ হিসেবে বই দেওয়ার বিভিন্ন গ্রন্থাগার চালু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ইংল্যান্ডে ঋণ দেওয়ার গ্রন্থাগারগুলো কর্মচারী, কারিগর এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত হত। কখনো কখনো স্ব-শিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির লোকেরা নিজেরাই নিজেদের জন্য লিখতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে দৈনিক কাজের সময়সীমা ধীরে ধীরে কম হয়ে যায়। এর ফলে শ্রমিকরা নিজেদের উন্নতিসাধন এবং আত্ম অভিব্যক্তির জন্য বেশ কিছুটা সময় পায়। তারা অধিক সংখ্যায় রাজনৈতিক পুস্তিকা ও আত্মজীবনী লিখতে শুরু করে।

বাক্স- 3

থমাস উড নামে ইয়র্কশায়ার এর একজন মেকানিক বলেন যে, তিনি পুরানো সংবাদপত্র ভাড়া করে এনে সন্ধ্যায় আগুনের আলোতে পড়তেন, কারণ তাঁর মোমবাতি কেনার সামর্থ্য ছিল না। গরিব মানুষদের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, তারা বিভিন্ন বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে কীভাবে সংগ্রাম করেছে : বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার বিপ্লবী লেখক ম্যাক্সিম গোর্কীর 'আমার ছেলেবেলা' এবং 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে এইসব সংগ্রামের কাহিনি জানা যায়।

** মাই চাইল্ডহুড (আমার ছেলেবেলা)*
** মাই ইউনিভার্সিটি (আমার বিশ্ববিদ্যালয়)*

5.2 নতুন কিছু উদ্ভাবন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধাতু দিয়ে মুদ্রণযন্ত্র তৈরি করা হয়। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মুদ্রণ শিল্পের প্রযুক্তিতে ক্রমাগত উন্নতি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিউইয়র্কের রিচার্ড এম. হো. শক্তিচালিত নলাকাযুক্ত মুদ্রণযন্ত্রকে এক অভিনব নতুনত্ব প্রদান করেন। এটি প্রতি ঘণ্টায় 8000 পাতা কাগজ ছাপতে পারত। এই মুদ্রণযন্ত্র বিশেষভাবে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অফসেট প্রেস চলে আসে, যেখানে এক সাথে ছয়টি রঙ ছাপানো সম্ভব ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিদ্যুৎ পরিচালিত মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারের ফলে মুদ্রণের কাজ দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করে। আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নতিসাধন হতে লাগল। যেমন— মেশিনে কাগজ ঢোকানোর পদ্ধতি উন্নত হয়, প্লেটের গুণমান আরো ভালো হয়, স্বয়ংক্রিয় কাগজের রিল এবং রঙের জন্য ফটো-ইলেকট্রিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক উন্নতির ফলে মুদ্রিত গ্রন্থের চেহারাই বদলে যায়।

মুদ্রক এবং প্রকাশকরা নিজেদের গ্রন্থ বিক্রি করার জন্য ক্রমাগত নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্রিকাগুলো উপন্যাসগুলিকে ধারাবাহিকভাবে ছাপাতে শুরু করে। যার ফলে উপন্যাস লেখার একটি বিশেষ শৈলী বিকশিত হয়। ১৯২০ এর দশকে, ইংল্যান্ডে জনপ্রিয় গ্রন্থগুলো খুব সস্তায় বিক্রি হয় যা 'শিলিং শৃঙ্খলা' নামে পরিচিত 'বুক জ্যাকেট' বা ডাস্ট কভার ও বিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবন। 1930-এর দশকে প্রবল আর্থিক মন্দা শুরু হলে প্রকাশকরা তাদের বই বিক্রি হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে। তাই, পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য তারা বইয়ের সস্তা টেঁকসই পেপারব্যাক সংস্করণ ছাপাতে শুরু করে।

কার্যাবলি

13 নং চিত্র দেখো। এই ধরনের বিজ্ঞাপন মানুষের মনে কী প্রভাব ফেলবে? তুমি কি মনে কর যে, মুদ্রিত উপকরণ দেখে সবার একই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়?

চিত্র 13 – ইংল্যান্ডের এক রেল স্টেশনে লাগানো বিজ্ঞাপন, অল্ফ্রেড কোঙ্কানেন দ্বারা তৈরি লিথোগ্রাফ, 1874
মুদ্রিত বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞপ্তিগুলো রাস্তার দেওয়াল, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম এবং সর্বজনীন ভবনগুলিতে লাগানো হত।

6 ভারত এবং মুদ্রণ জগৎ

চলো, আমরা দেখি, ভারতবর্ষে মুদ্রণের কাজ কবে শুরু হয়, এবং মুদ্রণ যুগ শুরু হওয়ার আগে তথ্য ও ধারণাগুলো কীভাবে লেখা হত।

6.1 মুদ্রণ যুগের আগের পাণ্ডুলিপি

ভারতবর্ষে সংস্কৃত, আরবি, ফার্সির পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির একটি সমৃদ্ধ ও পুরাতন ঐতিহ্য ছিল। পাণ্ডুলিপিগুলি তালপাতা বা হাতে তৈরি কাগজে লেখা হত। কখনো কখনো কিছু পৃষ্ঠায় সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হত। তারপর এই পাণ্ডুলিপিগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য কাঠের কভার দিয়ে বাঁধানো হত অথবা একসাথে সেলাই করে দেওয়া হত। তবে মুদ্রণ শিল্প আবিষ্কারের পরও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ অব্দি পাণ্ডুলিপি ছাপার কাজ চলতে থাকে।

তবে পাণ্ডুলিপি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ক্ষণস্থায়ী। প্রথম, এগুলোকে খুব সাবধানে ধরতে হত, দ্বিতীয় লিপিগুলো বিভিন্ন শৈলীতে লেখা হত, তাই সহজে পড়া যেত না।

চিত্র 14 – জয়দেবের গীত গোবিন্দ কাব্যের কিছু পৃষ্ঠা, অষ্টাদশ শতাব্দী।
এটি তালপাতায় অ্যাকর্ডিয়ন শৈলিতে লেখা পাণ্ডুলিপির একটি নমুনা।

চিত্র 15 – হাফিজের 'দিওয়ান' নামক গ্রন্থের কিছু পৃষ্ঠা, 1824.
হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীর কবি ছিলেন, যার সংগৃহীত কবিতা সমগ্র 'দিওয়ান' নামে পরিচিত, পৃষ্ঠায় সুন্দর হাতের লেখা, ছবি নকশা লক্ষ করো। লেটারপ্রেসে মুদ্রণ পদ্ধতি আগমণের পরেও এই ধরনের পাণ্ডুলিপি ধনি ব্যক্তিবর্গের জন্য তৈরি করা হত।

তাই দৈনন্দিন জীবনে পাণ্ডুলিপি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত না। যদিও প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল। তথাপি শিক্ষার্থীরা সাধারণত বই পড়ত না। তারা শুধুমাত্র লেখা শিখত, শিক্ষকরা তাদের স্মৃতিশক্তির সাহায্যে কোনো গ্রন্থের কিছু অংশ পড়ে শোনাতেন এবং শিক্ষার্থীরা তা লিখে রাখত। এইভাবে অনেক মানুষ কোনো বই না পড়েই অক্ষরজ্ঞান লাভ করত।

চিত্র 16 – ঋগ্‌বেদের কিছু পৃষ্ঠা।
মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পরও ভারতে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হত। ছবিতে দেওয়া পাণ্ডুলিপিটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মালয়ালম ভাষায় রচিত হয়েছিল।

6.2 ভারতে মুদ্রণ যন্ত্রের আগমণ

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগিজ মিশনারিদের মাধ্যমে ভারতে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্রের আগমণ ঘটে। জেসুইট যাজকরা কোঙ্কণি ভাষা শিখে এবং সেই ভাষায় অনেক বই মুদ্রণ করে। 1674 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোঙ্কনি এবং কন্নড় ভাষায় প্রায় 50টি বই ছাপা হয়। 1579 খ্রিস্টাব্দে কোচিনে ক্যাথলিক যাজক কর্তৃক তামিল ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় এবং 1713 খ্রিস্টাব্দে মালয়ালম ভাষার প্রথম বইও তাঁরাই মুদ্রণ করেন। 1710 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওলন্দাজ প্রোটেস্টান্ট ধর্মপ্রচারকারীরা 32টি তামিল বই মুদ্রণ করে যার মধ্যে অনেকগুলো পুরোনো বইয়ের অনুবাদ ছিল।

ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি যদিও সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ভারতে মুদ্রণ যন্ত্রের আমদানি করতে শুরু করে, তথাপি ইংরেজি ভাষার মুদ্রণ যন্ত্র ভারতবর্ষে অনেকদিন পর্যন্ত বিকশিত হয়নি।

জেমস্ অগাস্টাস হিকি 1780 খ্রিস্টাব্দ থেকে 'বেঙ্গাল গেজেট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেন। এই পত্রিকাটি 'সবার জন্য প্রকাশিত একটি বাণিজ্যিক কাগজ, কিন্তু কারোর দ্বারা প্রভাবিত নয়,' বলে নিজেকে পরিভাষিত করে। এটি এমন এক পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ শুরু করে ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত এবং নিজের স্বাধীনতা নিয়ে গর্বিত ছিল। এই পত্রিকায় হিকি সাহেব অনেক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, যার মধ্যে ক্রীতদাসদের আমদানি এবং বিক্রয় সম্পর্কিত বিষয়ও ছিল। কিন্তু তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অনেক গুজবও প্রচার করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে, গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস হিকির বিরুদ্ধে মামলা করেন। ঔপনিবেশিক সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন তথ্যকে মোকাবিলা করার জন্য, হোস্টিংস সরকার অনুমোদিত সংবাদপত্র প্রকাশনার উৎসাহ দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যেও অনেকে নিজেদের পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম প্রচেষ্টা হল গঙ্গাধর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গাল গেজেট'। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

উৎস (গ)

সাম্প্রতিককালে উইলিয়াম বোল্ট নামে এক ব্যক্তি 1768 সালে কলকাতায় একটি সর্বজনীন প্রাসাদে একটি নোটিশ জারি করেন :

জনসাধারণের অবগতির জন্য : মিস্টার বোল্টস জনগণকে অবহিত করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি মনে করেন যে, এই শহরে ছাপাখানার ব্যবসায় খুব মন্দা, ... তাই তিনি এমন কাউকে উৎসাহ দিতে ইচ্ছুক যিনি ছাপাখানার ব্যবসার সাথে পরিচিত।

কিন্তু শীঘ্রই বোল্ট মহাশয় ইংল্যান্ডে চলে গেলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি কোনো কাজে আসেনি।

7 ধর্মীয় সংস্কার এবং সর্বজনীন বিতর্ক

তোমরা জান, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তন সংঘঠিত হয়, সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ প্রচলিত রীতি-নীতির সমালোচনা করে তা সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে কেউ কেউ সমাজ সংস্কারকদের যুক্তির বিরোধিতা করেন। এইসব বিতর্ক সম্পর্কে সংবাদপত্রে ছাপা হয় এবং প্রকাশ্যেও আলোচনা হয়। পুস্তক এবং সংবাদপত্র শুধু নতুন ধারণার প্রসার করেনি, বরং তারা আরও তর্ক-বিতর্কের সুযোগ করে দেয়। ফলে সাধারণ জনগণ ব্যাপকভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারত। এইভাবে মতামত আদান-প্রদানের ফলে নতুন নতুন ধারণা উদ্ভুত হয়।

এটি এমন একটি সময় ছিল যখন সমাজ এবং ধর্ম সংস্কারক এবং হিন্দু রক্ষণশীলদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা, একেশ্বরবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং মূর্তিপূজার মতো বিষয়গুলো নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছিল। বঙ্গাদেশে এই বিতর্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে পুস্তক ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি তর্ক ছড়িয়ে পড়ে। অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এইসব যুক্তি তর্কগুলো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত কথ্যভাষায় ছাপা হয়। 1821 খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ‘সংবাদ কৌমুদী’ প্রকাশ করেন এবং হিন্দু রক্ষণশীলবাদীরা তাঁর মতামতের বিরোধিতা করার জন্য ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ এর সহায়তা নেয়। 1822 খ্রিস্টাব্দে ‘জাম-এ-জাঁহানামা’ এবং ‘শামসুল আখবার’ নামে দুটি ফরাসি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই বৎসরই ‘বোম্বে সমাচার’ নামে একটি গুজরাটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

উত্তর ভারতে মুসলিম রাজবংশের পতনকে নিয়ে উলেমারা উদ্বিগ্ন ছিল। তাদের ভয় ছিল যে, ঔপনিবেশিক শাসকরা ধর্মান্তরিত করতে উৎসাহিত করবে এবং মুসলিমদের নিজস্ব আইনকে পরিবর্তন করবে। এই অবস্থাকে প্রতিহত করার জন্য তারা সস্তা লিথোগ্রাফী মুদ্রণ পদ্ধতি (পাথর বা ধাতুর পাত্র থেকে নকশা বা ছবি ছাপার পদ্ধতি) ব্যবহার করে ধর্মগ্রন্থগুলোকে ফারসি এবং উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে এবং ধর্মীয় সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা ছাপায়। 1867 খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত দেওবান্দ সেমিনারি (যেখানে যাজক হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়) মুসলমান পাঠকদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের পরিচালনা পদ্ধতি এবং ইসলামি মতবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করে মুসলমমানদের জন্য কয়েক হাজার ফতোয়া জারি করে। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে অনেক মুসলিম সম্প্রদায় এবং সেমিনারির উদ্ভব হয়েছিল যারা ধর্ম নিয়ে নিজ নিজ ব্যাখ্যা দেয়। প্রতিটি সম্প্রদায় নিজের প্রভাব সম্প্রসারিত করতে এবং বিরোধী সম্প্রদায়ের প্রভাবকে খর্ব করতে চায়। উর্দু ভাষায় বিভিন্ন লেখার মুদ্রণ জনসাধারণের মধ্যে এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

মুদ্রণ শিল্পের প্রসার হিন্দুদেরও বিশেষ করে মাতৃভাষায়, ধর্মীয় গ্রন্থ পড়তে উৎসাহিত

নতুন শব্দ

Ulama উলেমা— ইসলামি আইন ও শরিয়া।

Fatwa ফতোয়া— আইনি অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট করার জন্য ইসলামি আইন সম্পর্কে মুফতি (ইসলামিক আইন বিশেষজ্ঞ) কর্তৃক দেওয়া বিধান।

করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর তুলসীদাস রচিত গ্রন্থ ‘রামচরিত’-এর প্রথম সংস্করণ 1810 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সস্তা

লিথোগ্রাফিক সংস্করণে উত্তর ভারতের বাজার ছেয়ে যায়, 1880 এর দশকে লখনৌতে নব্য কিশোর প্রেস এবং বোম্বের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর প্রেস স্থানীয় ভাষায় বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে। ধর্মগ্রন্থগুলো মুদ্রণ করার ফলে এবং আনা নেওয়া সহজসাধ্য হওয়ার ফলে ধার্মিক জনগণ যে-কোনো জায়গায়, যে কোন সময় এগুলো পড়তে পারত, অশিক্ষিত নারীপুরুষদের জটলাতে ও ধর্মগ্রন্থগুলো জোরে জোরে পড়ে শুনানো যেত।

এর অর্থ, ধর্মীয় গ্রন্থগুলো ব্যাপক জনসম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছেছিল, যা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আলোচনা, বিতর্ক এবং বাদানুবাদে উৎসাহিত করে।

মুদ্রণ শিল্প ভারতের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে শুধুমাত্র বিবাদ বিতর্কে উৎসাহিত করেছিল তা নয়, এটি ভারতের বিভিন্ন অংশের সম্প্রদায় এবং জনগণকে একসাথে যুক্তও করেছিল। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সংবাদপত্র একটি ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

উৎস (ঘ)

সংবাদপত্র কেন?

পুনার বাসিন্দা কৃষ্ণাজি ত্রিম্বুক রানাডে মারাঠি ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যেখানে স্থানীয় বিষয়ের উপযোগী তথ্য প্রদানের সুযোগ থাকে। এতে সাধারণ উপযোগিতার বিষয়বস্তু, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছাড়াও পরিসংখ্যান, কৌতূহল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস ও ভূগোলের ধারণা পাওয়া যাবে— এখানে সকলের পৃষ্ঠপোষকতাও সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা হয়, যারা জ্ঞানের বিস্তার ও জনগণের কল্যানে আগ্রহী।

বোম্বে টেলিগ্রাফ অ্যান্ড কুরিয়ার, 6 *জানুয়ারি* 1849

দেশীয় সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্সের বিরোধী দলের মতোই ছিল, তার মানে হল এইসব প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতিগুলোর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করে জনগণের উপকারে অক্ষম অংশগুলোকে অপসারণ বা এগুলিকে পরিমার্জন করে। এছাড়াও এগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে।

এই সমিতিগুলো নির্দিষ্ট বিষয়গুলো বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে, দেশের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি কী করা সম্ভব এবং কী করা উচিত তা ঠিক করবে, এবং এটা নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

‘নেটিভ ওপিনিয়ন’ 3রা এপ্রিল 1870

৪ প্রকাশনার নতুন রূপ

মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন লেখার প্রতি রুচি তৈরি হয়। লোকেরা যত বেশি বই পড়তে শুরু করল তত তাদের নিজের জীবন, অভিজ্ঞতা, আবেগ এবং সম্পর্কগুলোকে সেইসব বইয়ের পৃষ্ঠায় ছাপা অক্ষরে দেখতে চাইল। ইউরোপে বিকশিত 'উপন্যাস' নামক সাহিত্যিক নিবন্ধ জনগণের এইসব প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণ করতে সক্ষম ছিল। শীঘ্রই এটি ভারতীয় গঠন ও শৈলীর এক নিজস্ব রূপ অর্জন করে নেয়। এটি পাঠকদের বিশ্বকে অনুভব করতে শেখায়, এবং মানুষের জীবন বৈচিত্র্যের একটি প্রাণবন্ত ধারণা দেয়।

সাহিত্যের অন্যান্য নতুন শাখাগুলো যেমন গান, ছোটো গল্প, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধ ইত্যাদি নিজস্ব ধারায় মানব জীবন এবং অন্তরঙ্গ অনুভূতি রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ম কানুনের উপর জোর দেয়, যেগুলো তাদের নিজস্ব রূপে ফুটে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একটি নতুন ধরনের দৃশ্য-সংস্কৃতিও আকার নিচ্ছিল। মুদ্রণালয় বা ছাপাখানায় ক্রমবর্ধমান বিস্তারের সাথে সাথে ছবির নকল বা প্রতিবিম্ব খুব সহজেই তৈরি করা যেত। রাজা রবি বার্মার মতো চিত্রশিল্পীরা ব্যাপক প্রচারের জন্য চিত্র আঁকতেন। কাঠের তক্তায় চিত্র খোদাইকারী গরিব হস্তশিল্পীরা লেটারপ্রেস ছাপাখানার সামনে তাদের দোকান তৈরি করে, এবং মুদ্রকের কাছ থেকে কাজ পায়। বাজার থেকে সস্তা ছবি এবং ক্যালেন্ডার কিনে এনে গরিবরা নিজেদের ঘর এবং কাজের জায়গাকে সাজাত। এই মুদ্রিত ছবিগুলো ধীরে ধীরে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য, ধর্ম ও রাজনীতি এবং সমাজ ও সংস্কৃতির জনপ্রিয় ধারণাগুলো জনসাধারণের মধ্যে রূপায়ণে সহায়তা করেছিল।

1870 এর দশক থেকে সংবাদপত্রগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ব্যাঙ্গাচিত্র এবং কার্টুন ছাপাতে শুরু করে। কিছু কিছু ব্যাঙ্গাচিত্র শিক্ষিত ভারতীয়দের পাশ্চাত্য পোশাক এবং পশ্চিমের প্রতি অনুরাগকে নিয়ে উপহাস করে। অন্যরা সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সাম্রাজ্যবাদীদের উপহাস করা হত। পাশাপাশি জাতীয়তাবাদীরাও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমালোচনা করত।

চিত্র 17 – রাজা ঋতুধ্বজ ভূতদের বন্দিদশা থেকে রাজকুমারী মদলসাকে উদ্ধার করছেন। রবি বার্মার আঁকা চিত্র।
রাজা রবি বার্মা পৌরাণিক গল্পের বিষয় নিয়ে প্রচুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। যার মুদ্রণ তাঁর নিজের 'রবি বার্মা প্রেসে' সম্পন্ন হত।

8.1 নারী এবং মুদ্রণ

সে সময় নারীদের জীবন এবং তাদের অনুভূতিগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে এবং প্রাণবন্ত করে লেখা হত। ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারে মহিলাদের শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উদারবাদী পিতা এবং স্বামীরা তাদের মেয়ে এবং স্ত্রীদের বাড়িতে শিক্ষাদান করতে শুরু করে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন বড়ো বড়ো শহরে মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয় তখন তাদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করে। অনেক সংবাদপত্র নারীদের লেখা ছাপাতে শুরু করে এবং নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আলোচনা করে। তারা পাঠ্যক্রম ও মুদ্রণ করত এবং সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পাঠ্যসামগ্রীও মুদ্রণ করত, যা ঘরোয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত।

কিন্তু সব পরিবার এত উদারবাদী ছিল না, রক্ষণশীল হিন্দুরা বিশ্বাস করত যে, শিক্ষিত মেয়েরা বিধবা হয়ে যায় এবং একইভাবে মুসলমানদের ভয় ছিল যে, উর্দু প্রেমের গল্প পড়ে শিক্ষিত নারীদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। কখনো কখনো বিদ্রোহী নারীরা এইসব প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকারও করে। আমরা উত্তর ভারতের মুসলমান পরিবারের এমন এক মেয়ের গল্প জানি, যিনি গোপনে উর্দু পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে শুধুমাত্র আরবি কোরান পড়াতে চেয়েছিল যা তিনি বুঝতে পারেননি। তাই তিনি নিজের পছন্দের একটি ভাষা পড়তে এবং শিখতে চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, পূর্ববঙ্গে কট্টর রক্ষণশীল পরিবারের বিবাহিতা কন্যা রাসসুন্দরী দেবী রান্নাঘরে বসে গোপনে পড়তে শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি 'আমার জীবন' নামক আত্মকথা লিখেছিলেন যা 1876 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম সম্পূর্ণ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

যেহেতু সামাজিক সংস্কার এবং উপন্যাস ইতিমধ্যেই নারীর জীবন এবং আবেগে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই নারীদের লেখা আত্মজীবনী পড়ার জন্য পাঠকদের প্রচুর আগ্রহ ছিল। কৈলাসবাসিনী দেবীর মতো মহিলারা 1860 এর দশকে মহিলাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে শুরু করেন— তাদের কীভাবে ঘরে বন্দি রাখা হয় এবং অশিক্ষিত করে রাখা হয়, কীভাবে তাদের ঘরের কাজ করাতে বাধ্য করা হয় এবং তারা যাদের সেবা করে তারাই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।

বর্তমানে যে রাজ্য মহারাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত, সেখানে 1880 এর দশকে তারাবাঈ সিন্ধে এবং পণ্ডিতা রমাবাঈ এর মতো লেখিকারা উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের, বিশেষ করে বিধবাদের দুঃখজনক জীবন সম্পর্কে ক্রোধের সাথে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ নারীদের কাছে লেখাপড়া কী মাহাত্ম্য রাখে সে সম্পর্কে একটি তামিল উপন্যাসে একজন নারী লিখেছেন.. "অনেক কারণেই আমার পৃথিবী অনেক ছোটো', ... আমার জীবনের অর্ধেকের বেশি সুখ বই থেকে এসেছে।"

উর্দু, তামিল, বাংলা এবং মারাঠি ভাষায় মুদ্রণ সংস্কৃতির বিকাশ খুব শীঘ্রই হয়, কিন্তু গুরুত্ব সহকারে হিন্দি ভাষায় মুদ্রণ শুরু হয়েছিল 1870-এর দশকে। শীঘ্রই এর একটি বড় অংশ নারীশিক্ষায় নিজেদের সমর্পন করে।

চিত্র 18 – 'ইন্ডিয়ান চারিবারী' নামক সাময়িক পত্রিকার আবরণ পৃষ্ঠা।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকাশিত ব্যাঙ্গ ও বিদ্রুপের (ক্যারিকেচার)।
অনেক পত্রিকার মধ্যে একটি ছিল ইন্ডিয়ান চারিবারী।
লক্ষ করো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ছবিটি ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। তিনি আধিকারিক ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিমূর্তি। স্থানীয় নাগরিকরা কি করবে কি না, তা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। স্থানীয় নাগরিকরা বিনয়ের সাথে নতজানু হয়ে তাঁর দুই পাশে বসেছে। ভারতীয়দের ব্যাঙ্গ-চিত্র ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য পাঞ্চের একটি প্রতিলিপি হিসেবে দেখানো হচ্ছে। ছবিটি দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজ মালিক বলছেন— "এটাই সঠিক আদর্শ, যাও গিয়ে এটির ভারতীয় সংস্করণ বের করো।"

উৎস (ঙ)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং লেখিকা বেগম রোকেয়া শেখাবত হুসেন 1926 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধর্মের নামে নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার জন্য তীব্রভাবে পুরুষদের নিন্দা করেন :

'নারী-শিক্ষার বিরোধীরা বলে যে, নারীরা পড়াশোনা করলে অবাধ্য হয়ে যাবে... ছিঃ। তারা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু ইসলাম দ্বারা নারীর শিক্ষার সমান অধিকারের মৌলিক নীতির বিরোধিতা করে।"

পুরুষরা যদি শিক্ষিত হয়ে বিপথে চালিত না হয়, তাহলে নারীরা কেন বিপথে যাবে?'

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারীদের জন্য লেখা এবং কখনো কখনো তাদের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকা, অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তারা নারীশিক্ষা, বিধবাদের জীবন, বিধবা বিবাহ এবং জাতীয় আন্দোলনের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিল। কিছু কিছু পত্রিকা মহিলাদের গৃহস্থালীর এবং ফ্যাশনের শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে ছোটো গল্প এবং ধারাবাহিক উপন্যাসের মাধ্যমে তাদের মনোরঞ্জন করত।

পাঞ্জাবেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক জনপ্রিয় লোকসাহিত্য প্রচুর পরিমাণে ছাপা হয়। নারীদের কীভাবে বাধ্য স্ত্রী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে রাম চাড্ডা 'স্ত্রী ধর্ম বিচার' নামক বই লিখেন যা খুব দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। 'খালসা ট্রেক সোসাইটি' এরকম বার্তা দিয়ে সস্তা পুস্তিকা ছাপায়। এগুলির বেশির ভাগই একজন ভালো মহিলার গুণাবলি সম্পর্কে উপদেশ সংলাপের আকারে দেওয়া হয়েছিল।

বাংলায়, কোলকাতার কেন্দ্রস্থলের 'বটতলা' নামক একটি অঞ্চল জনপ্রিয় বই প্রকাশনার জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল। এখানে ধর্মীয় গ্রন্থ এবং পুস্তিকার সস্তা সংস্করণ তো কিনতেই পাওয়া যেত, সেই সাথে যেসব সাহিত্য অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ বলে মনে করা হত, সেগুলিও পাওয়া যেত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এমন অনেক বইয়ে কাঠের তক্তা এবং রঙিন লিথোগ্রাফের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে ছবি চিত্রিত করা হয়েছিল। ফেরিওয়ালারা বটতলায় প্রকাশিত বইগুলো নিয়ে ঘরে ঘরে ফেরি করত, যার ফলে মহিলারা অবসর সময়ে তাদের পছন্দমতো বই পড়তে পারত।

চিত্র 19 – ঘোরকলি (প্রলয়কাল) উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রঙিন কাষ্ঠচিত্র।
শিল্পীর দৃষ্টিতে পরিবারের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কল্পনা। এখানে স্বামী সম্পূর্ণরূপে তার স্ত্রী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সে তার স্বামীর কাঁধে চড়ে বসেছে। তার মার প্রতি নিষ্ঠুর, মাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পশুর মতো টানছে।

চিত্র 20 – এক ভারতীয় দম্পত্তি সাদা কালো কাষ্ঠচিত্র।
পাশচাত্যের সংস্কৃতি কীভাবে ভারতীয় পারিবারিক ব্যবস্থাকে উল্টে দিয়েছে এ মর্মে চিত্রশিল্পী এখানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। লক্ষ করো যে, এই ছবিতে পুরুষ বীণা বাজাচ্ছে এবং নারীটি হুঁকোয় ধূমপান করছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নারীশিক্ষার অগ্রগতি হওয়ার ফলে ঐতিহ্যগত পারিবারিক ভাঙ্গানে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল।

চিত্র 21 – এক ইউরোপীয় দম্পত্তি উনবিংশ শতাব্দীর কাষ্ঠচিত্র। এই ছবিটি প্রথাগত পারিবারিক ভূমিকার সুপারিশ করছে। সাহেব হাতে সুরার বোতল ধরে আছেন, এবং মেমসাহেব ভায়োলিন বাজাচ্ছেন।

8.2 মুদ্রণ এবং দরিদ্র জনগণ

উনবিংশ শতাব্দীতে মাদ্রাজের নগরগুলোকে খুব সস্তা দামের চটি বই বাজারে আনা হত এবং রাস্তার চৌমাথায় তা বিক্রি করা হত, যার ফলে দরিদ্র লোকেরাও বাজার থেকে এই বই কিনে নিয়ে যেতে পারত। বিংশ শতকের প্রথমদিকে সর্বজনীন গ্রন্থাগার (Public Library) স্থাপিত হতে থাকে, যার ফলে বই বিস্তৃতভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে থাকে। এই গ্রন্থাগারগুলো বেশিরভাগই শহরে এবং কখনো কখনো সমৃদ্ধ গ্রামেও অবস্থিত ছিল। স্থানীয় ধনী লোকেদের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করা মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখা হত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন পুস্তিকা এবং প্রবন্ধে বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে লেখা শুরু হয়। 'নিম্ন বর্ণের' প্রতিবাদ আন্দোলনের মারাঠি অগ্রদূত জ্যোতিবা ফুলে তাঁর 'গুলামগিরি' (1871) তে বর্ণ ব্যবস্থার অবিচার সম্পর্কে লিখেছেন। বিংশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ভীমরাও আম্বেদকর, এবং মাদ্রাজের ই.ভি. রামাস্বামী নায়কর যিনি 'পেরিয়ার' নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। তাঁরা জাতিভেদ প্রথা নিয়ে জোরদারভাবে লিখেছিলেন এবং তাদের লেখা পুরো ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্থানীয় বিদ্রোহকারীরা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করতে শুরু করে। তারা একটি নূতন ভবিষ্যতের কল্পনা করে অনেক জনপ্রিয় পত্রিকা এবং পুস্তিকা ছাপায়।

কারখানার শ্রমিকদের দিয়ে অনেক বেশি কাজ করানো হত, এবং তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সঠিকভাবে লেখার শিক্ষাও প্রাপ্ত ছিল না। কিন্তু কানপুরের মিলের শ্রমিক কাশীবাবা 1938 খ্রিস্টাব্দে 'ছোটো এবং বড়ো কা সাওয়াল' প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি জাতি তথা শ্রেণি শোষণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করেন। 1935 থেকে 1955 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'সুদর্শন চক্র' ছদ্মনামে কানপুরের আরেকজন মিল শ্রমিক 'সাচ্চি কবিতায়ে' নামে এক পুস্তিকায় তাঁর কবিতা ছাপেন। 1930 এর দশকে ব্যাঙ্গালোরের সুতোকলের শ্রমিকরা বোম্বের কর্মীদের অনুসরণ করে নিজেদেরকে শিক্ষিত করার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করে। সমাজ সংস্কারকরা এই ধরনের প্রয়াসের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকরা যাতে নেশা না করে, সাক্ষরতা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠে।

কার্যাবলি

19, 20 এবং 21নং চিত্র ভালো করে লক্ষ করো।

- সমাজের যেসব সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সে বিষয়ে শিল্পীরা কী মন্তব্য করেছেন?
- সমাজে কোন্ ধরনের পরিবর্তনকে নিয়ে শিল্পীরা এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল?
- তুমি কি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত?

9 মুদ্রণ এবং সেন্সরশিপ

1798 খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনের কোনো ঔপনিবেশিক রাজ্য 'সেন্সরশিপ' (কোনো বক্তব্য অথবা কথনের প্রচার দমিয়ে রাখা) এর সাথে বেশি পরিচিত ছিল না। মজার ব্যাপার হল, মুদ্রিত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার প্রাথমিক পদক্ষেপ সেইসব ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। যারা কোম্পানির এবং কোম্পানির কর্মকর্তাদের সমালোচনা করেছিল, কোম্পানির ভয় ছিল যে, এইসব সমালোচনাকে হাতিয়ার করে ব্রিটিশ সমালোচকরা ভারতে তাদের বাণিজ্যিক একাধিপত্যের উপর হামলা করতে পারে।

কলকাতা সুপ্রিমকোর্ট 1820 এর দশকে প্রেসের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু আইন পাশ করে এবং কোম্পানি ব্রিটিশ শাসনের গুণকীর্তনে আগ্রহী ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশনাকে উৎসাহ দেয়। ইংরেজি এবং দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের সম্পাদকরা আবেদন করলে গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক প্রেস আইন সংশোধন করতে সম্মত হন। থোমাস ম্যাকাওলে নামে একজন উদারবাদী ঔপনিবেশিক আমলা সংবাদ মাধ্যমের পূর্বতন স্বাধীনতাকে বহাল রেখে নতুন আইন প্রণয়ন করেছিলেন।

1857 খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি মনোভাব পরিবর্তিত হয়। ক্ষিপ্ত ইংরেজরা দেশীয় সংবাদপত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য দাবি জানায়। যেসব দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে সংবাদ প্রকাশ করে, তাদেরকে ঔপনিবেশিক সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 'আইরিন প্রেস অ্যাক্ট' অনুসারে 1878 খ্রিস্টাব্দে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' পাশ হয়। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে ছাপা সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর 'সেন্সর' আরোপ করার অধিকার লাভ করে। এখন থেকে সরকার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুদ্রিত সংবাদপত্রের উপর নিয়মিত নজরদারি করতে শুরু করে। যদি কোনো প্রতিবেদন সরকার-বিরোধী বলে আখ্যায়িত হত তাহলে সেই সংবাদপত্রকে প্রথমে সতর্ক করা হত, এবং যদি কোনো সংবাদপত্র সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করত তাহলে সেই সংবাদপত্র এবং মুদ্রণ যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা হত।

সরকার কর্তৃক এই ধরনের দমনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও ভারতের সব অঞ্চলেই জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারা জনগণকে ঔপনিবেশিক কুশাসনের ফলাফল সম্পর্কে বোঝায় এবং জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমে উৎসাহিত করে। এই জাতীয়তাবাদী আলোচনাকে বন্ধ করার জন্য সরকার যে সমস্ত প্রচেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই ধরনের ঘৃণ্য ও প্রতিবাদ আন্দোলনের একটি নূতন চক্র শুরু হয়। 1907 খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের বিদ্রোহীদের যখন দ্বীপান্তরিত করা হয়; তখন বালগঙ্গাধর তিলক নিজের 'কেশরী' পত্রিকায় তাঁদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। এর ফলে 1908 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, যার ফলে সারা ভারতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়।

বাক্স- 4

কখনো কখনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত সংবাদপত্রের জন্য সম্পাদক খুঁজে বের করা সরকারের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে যেত। 1877 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র 'স্টেটসম্যান'-এর সম্পাদক পদের জন্য যখন স্যান্ডার্সের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তখন তিনি রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, স্বাধীনতা বিসর্জনের জন্য তাকে কত টাকা দেওয়া হবে। 'দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' নামক সংবাদপত্র সরকারি সাহায্য নিতে অস্বীকার করে, কারণ তাদের ভয় ছিল যে, সরকারি সাহায্য নিলে তাদের সরকারি আদেশ মেনে চলতে হবে।

বাক্স- 5

কাগজে ছাপা অক্ষরের ক্ষমতা কতটুকু ছিল, সেটা প্রায়ই সরকার দ্বারা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার মাধ্যমে বোঝা যায়। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ভারতে প্রকাশিত সব বই ও সংবাদপত্রের উপর নজর রাখত এবং মুদ্রণ শিল্প নিয়ন্ত্রণে বহু আইন পাস করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ভারতের প্রতিরক্ষা আইন অনুযায়ী 22টি সংবাদপত্রকে জামানত দিতে হয়েছিল। এর মধ্যে 18টি পত্রিকা সরকারি আদেশে মেনে চলার পরিবর্তে সংবাদপত্র প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়। রাউলাট এর অধীনে সিডিসন কমিটি 1919 খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনকে আরও শক্তিশালী করে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের উপর জরিমানা আরোপ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইন পাস করা হয়, যাতে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিষয়ের রিপোর্টের নিরীক্ষণ করা যায়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমস্ত রিপোর্ট এভাবেই নিরীক্ষণ (censor) করা হয়েছিল। 1942 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রায় 90টির মতো সংবাদপত্রকে দমন করা হয়েছিল।

উৎস (চ)

1922 খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি বলেছেন :

'বাক স্বাধীনতা... সংবাদপত্রের স্বাধীনতা... সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা। ভারত সরকার এখন জনগণের মতামত প্রকাশ এবং চর্চা করার তিনটি শক্তিশালী মাধ্যমকে দমন করার চেষ্টা করছে। স্বরাজ, খিলাফতের... জন্য লড়াই হল এই ধরনের বিপন্ন স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ।

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

1. কারণ ব্যাখ্যা করো :
   a) কাষ্ঠশিল্পের ছাপার কাজ 1295 খ্রিস্টাব্দের পর ইউরোপে এসেছিল।
   b) মার্টিন লুথার মুদ্রণের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি খোলাখুলি এই শিল্পের প্রশংসা করেন।
   c) রোমান ক্যাথলিক চার্চ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে 'নিষিদ্ধ হওয়া' বইয়ের সূচক রাখতে শুরু করেন।
   d) মহাত্মা গান্ধি বলেন স্বরাজ হল বাক স্বাধীনতার লড়াই, সংবাদপত্র এবং সম্প্রদায়ের জন্য লড়াই।
2. ছোটো টীকা লেখো :
   a) গুটেনবার্গ প্রেস।
   b) ছাপা বই নিয়ে ইরাসমাসের মতামত।
   c) দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন (ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট)।
3. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে মুদ্রণ-সংস্কৃতি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কী অভিপ্রায় ছিল?
   a) নারী।
   b) গরিব জনতা।
   c) সমাজ সংস্কারক।

আলোচনা কর :

1. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কিছু মানুষের কেন এমন মনে হয় যে, মুদ্রণ সংস্কৃতি স্বৈরতন্ত্রের অবসান করে জ্ঞানালোক বিতরণ করবে?
2. কিছু লোক সহজলভ্য মুদ্রিত বই নিয়ে কেন চিন্তিত ছিল? ইউরোপ এবং ভারত থেকে একটি করে উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।
3. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে গরিব জনসাধারণের উপর মুদ্রণ সংস্কৃতির কী প্রভাব পড়েছিল?
4. মুদ্রণ সংস্কৃতি কীভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, তা ব্যাখ্যা করো।

প্রকল্প :

গত 100 বছর ধরে মুদ্রণ সংস্কৃতিতে হওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে খোঁজ করো। পরিবর্তনগুলোর কারণসমূহ এবং তাদের পরিণতি কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে লেখো।

উপন্যাস, সমাজ এবং ইতিহাস
(Novels, Society and History)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তোমরা পড়েছ যে কীভাবে মুদ্রণ সংস্কৃতির উত্থান এবং যোগাযোগের নতুন মাধ্যম মানুষকে একে অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করতে এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছে। তোমরা এটাও লক্ষ করেছ যে, মুদ্রণ সংস্কৃতি সাহিত্যের নতুন রূপ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। এই অধ্যায়ে আমরা সাহিত্যের এমনই একটি নতুন রূপ - উপন্যাস - সম্পর্কে পড়ব যা আধুনিক চিন্তাভাবনা তৈরির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমে আমরা পাশ্চাত্যের উপন্যাসের ইতিহাস এবং পরে ভারতের কিছু অঞ্চলে এর বিকাশ সম্পর্কে অধ্যয়ন করব। তোমরা দেখবে যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন অংশে লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে অনেক বিষয়ে মিলও রয়েছে।

1 উপন্যাসের উত্থান

উপন্যাস হল সাহিত্যের আধুনিক রূপ। মুদ্রণ নামক যান্ত্রিক আবিষ্কার থেকে-এর জন্ম হয়েছে।

আমরা মুদ্রিত বই ছাড়া উপন্যাসের কল্পনাও করতে পারি না। তোমরা দেখেছ (সপ্তম অধ্যায়ে) প্রাচীনযুগে পাণ্ডুলিপি হাতে লেখা হত। এটি খুব কম মানুষের কাছেই পৌঁছাত। কিন্তু মেশিনে মুদ্রিত হওয়ার কারণে উপন্যাসগুলোর ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন শুরু হয় এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময় লণ্ডনের মতো বড়ো শহরগুলো দ্রুতগতিতে বিকশিত হচ্ছিল এবং মুদ্রণ ও উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে ছোটো শহর বা গ্রামীণ এলাকাগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। শহরের নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন শ্রেণির পাঠকের মধ্যে উপন্যাস একই ধরনের আগ্রহ তৈরি করেছিল। কাহিনিতে পাঠকবর্গের প্রবেশ করা মাত্রই কাল্পনিক চরিত্রগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং প্রেম ও বিবাহ তথা স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারে চিন্তা করতে শুরু করে।

প্রথমে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে উপন্যাস তার শিকড় বিস্তার করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই উপন্যাস লেখা শুরু হয় কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় । ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে চিরাচরিত অভিজাত ও সুশীল সমাজের পাশাপাশি নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জনগণ যেমন দোকানদার এবং করনিকগণ উপন্যাসের নতুন পাঠকসমাজে সামিল হয়।

পাঠকবর্গ এবং বইয়ের বাজার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে লেখকদের আয়ও বৃদ্ধি পায়। এটা অভিজাত শ্রেণির আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা থেকে লেখকদের মুক্তি দেয় এবং তার বিভিন্ন সাহিত্যিক রচনাশৈলীর পরীক্ষানিরীক্ষা করার স্বাধীনতা পায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে হেনরি ফিল্ডিং নামক একজন ঔপন্যাসিক দাবি করেছিলেন যে, "তিনি নিজের জন্য একটি আলাদা লিখন পরিসর গড়ে তোলেন, যেখানে তিনি নিজের আইন নিজেই তৈরি করতে পারতেন। লিখন শৈলীর ক্ষেত্রে উপন্যাস নমনীয়তা প্রদান করে। ওয়াল্টার স্কট স্কটিশ লোকগাথাকে স্মরণ এবং সংগ্রহ করে স্কটিশ গোষ্ঠীর যুদ্ধ নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাসগুলোতে সেগুলো ব্যবহার করেন। অন্যদিকে পত্র সম্বন্ধীয় উপন্যাসে কাহিনি বলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ব্যবহার করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা স্যামুয়েল রিচার্ডসনের উপন্যাস "পামেলা"-এর পুরো গল্পটি দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে বলা হয়েছে। এই চিঠিগুলো থেকে নায়িকার মনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ব্যাপারে পাঠকরা জানতে পারে।

1.1 প্রকাশনার বাজার

দীর্ঘদিন ধরে গরীবরা প্রকাশনার বাজার থেকে দূরে ছিল। প্রথমদিকে উপন্যাস গ্রন্থ সস্তায় পাওয়া যেত না। হেনরি ফিল্ডিং-এর টম জোন্স (১৭৪৯) নামক উপন্যাস ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রতিটি খণ্ডের দাম ছিল তিন শিলিং, যা একজন সাধারণ শ্রমিকের এক সপ্তাহের বেতনের সমান।

নতুন শব্দ

ভদ্র সমাজ (Gentlemanly classes) — যারা উঁচু বংশের জন্মগ্রহণ করেন এবং উঁচু সামাজিক অবস্থানের দাবী করেন। তাঁরা সমাজে যথাযথ আচরণের মান নির্ণায়ক হিসাবে কাজ করতেন।

পত্র সম্বন্ধীয় (Epistolary) — চিঠিরূপে ধারাবাহিকভাবে লেখা।

কিন্তু শীঘ্রই ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ার ফলে মানুষের কাছে বই খুব সহজলভ্য হয়ে পড়ে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে বই ছাপানোর খরচ কমে যায় এবং বাজারজাতকরণের নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে বই-এর বিক্রি বেড়ে যায়। ফ্রান্সের প্রকাশকরা দেখল প্রতি ঘন্টা হিসেবে উপন্যাসের বই ভাড়া দিয়ে প্রচুর লাভ করা যায়। উপন্যাস ছিল প্রথম বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত এবং বিক্রি হওয়া সামগ্রির মধ্যে একটি। এর জনপ্রিয়তার বিভিন্ন কারণ ছিল। উপন্যাস দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ ছিল চিত্তাকর্ষক এবং বিশ্বাসযোগ্য, এবং আপাতদৃষ্টিতে বাস্তব। উপন্যাস পড়ার সময় পাঠক অপর ব্যক্তির জগতে চলে যেত এবং উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অভিজ্ঞতায় নিজের জীবনকে দেখতে শুরু করত। এছাড়া উপন্যাসগুলো ব্যক্তিকে একান্তে পড়ার আনন্দ যোগাত, পাশাপাশি প্রকাশ্যে পড়া বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গল্পগুলো আলোচনা করার আনন্দও পাওয়া যেতো। গ্রামাঞ্চলে মানুষ তাদের মধ্যে একজনের উপন্যাসের সরব পাঠ শোনার জন্য একত্রিত হত এবং প্রায়ই তারা উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ত। স্পষ্টতই ইংল্যান্ডের স্লঘের (Slough) এক দল পাঠক রিচার্ডসনের জনপ্রিয় উপন্যাসের নায়িকা পামেলার কথা শুনতে খুব পছন্দ করত যার বিয়ে তাদের গ্রামেই হয়েছিল। তারা প্যারিস চার্চে ছুটে এসে চার্চের ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে!

১৮৩৬-এ একটি লক্ষনীয় ঘটনা ঘটেছিল যখন চার্লস ডিকেনসন্স-এর *পিক্যুইক প্যাপারস* একটি পত্রিকায় **ধারাবাহিকভাবে** প্রাকশিত হয়। চিত্রিত এবং সস্তা হওয়ায় পত্রিকাগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। ধারাবাহিক প্রকাশন পাঠকবৃন্দকে গল্পের উদ্বেগ আস্বাদনে সহায়তা করত। বর্তমানকালের টেলিভিশনে প্রচারিত ধারাবাহিকগুলোর দর্শকদের মতো তৎকালীন পাঠকবৃন্দ উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে নিয়ে আলোচনা করত ফলে সেগুলো পাঠকবৃন্দের মনে কয়েক সপ্তাহ ধরে জীবন্ত হয়ে থাকত।

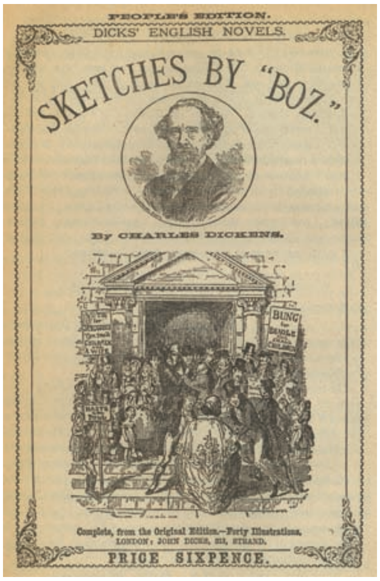

চিত্র 1 – বোজের চিত্রাবলীর প্রচ্ছদ
চার্লস ডিকেন্সের প্রথম প্রকাশন 'স্কেচেস বাইবোজ' (1836) ছিল সাংবাদিকতা সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন।

নতুন শব্দ

Serialised (ধারাবাহিক) — এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোন গল্পকে কয়েকটি কিস্তিতে ছাপা হয়, প্রত্যেকটি কিস্তি পত্রিকার পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশিত হয়।

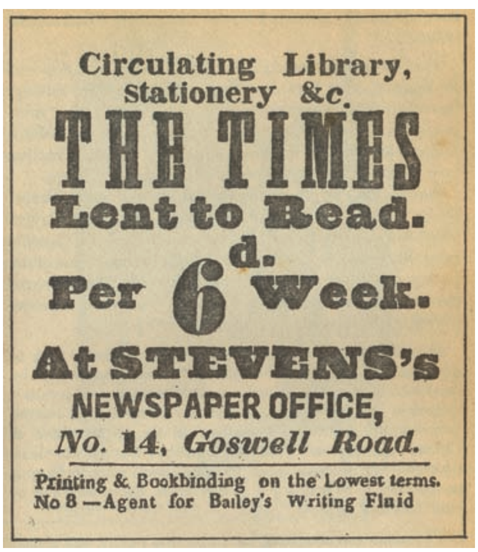

চিত্র 2 – গ্রন্থাগারের নোটিশ
গ্রন্থাগারগুলোর অধিক প্রচার করা হত।

"THE STORY OF OUR LIVES FROM YEAR TO YEAR."—SHAKESPEARE.

ALL THE YEAR ROUND.
A WEEKLY JOURNAL.
CONDUCTED BY CHARLES DICKENS.
WITH WHICH IS INCORPORATED HOUSEHOLD WORDS.

No. 84.] SATURDAY, DECEMBER 1, 1860. [PRICE 2d.

GREAT EXPECTATIONS.
BY CHARLES DICKENS.
CHAPTER I.

চিত্র 3 – 'অল দ্য ইয়ার রাউন্ড' পত্রিকার প্রচ্ছদ
চার্লস ডিকেন্স দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকা 'অল দ্য ইয়ার রাউন্ড' এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এতে চার্লস ডিকেন্স এর উপন্যাস ধারাবাহিক রূপে ছাপা হত। পত্রিকার এই সংস্করণ ধারাবাহিক উপন্যাসের একটি খণ্ড দিয়ে শুরু হয়েছে।

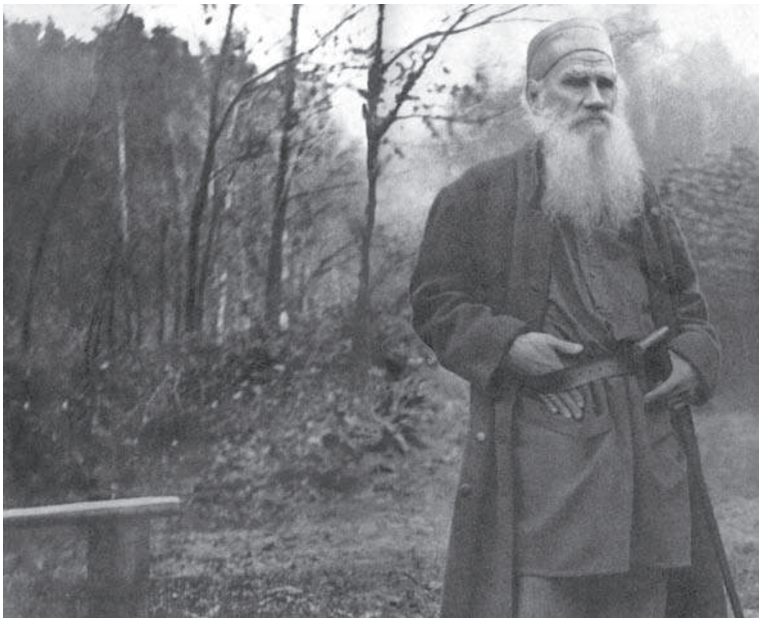

চিত্র 4 – লিও টলস্টয় (1828-1910).
টলস্টয় ছিলেন প্রসিদ্ধ রাশিয়ান ঔপন্যাসিক যিনি গ্রামীণ জীবন ও সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন।

1.2 উপন্যাসের জগৎ

পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য লেখার তুলনায় উপন্যাস সাধারণ মানুষের জীবনের আরো কাছাকাছি চলে এসেছিল। কোনো রাজ্য বা সাম্রাজ্যের ভাগ্য বদলে দেওয়ার কার্যকলাপ অথবা মহান লোকের জীবনীর উপর এগুলো আলোকপাত করে না। এর পরিবর্তে সেগুলো সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নিয়ে কথা বলে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ শিল্প যুগে প্রবেশ করে। সেখানে নতুন নতুন কারখানা স্থাপিত হয়। বাণিজ্যে মুনাফা বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। কিন্তু এর সাথে সাথে শ্রমিকরা সমস্যার মুখোমুখি হয়। শহরগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিস্তার লাভ করে। শহরগুলো অধিক শ্রম অথচ কম মজুরী প্রাপ্ত শ্রমিকে পূর্ণ হয়ে যায়। দরিদ্র বেকার শ্রমিকরা কাজের খোঁজে রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে এবং গৃহহীনরা 'ওয়ার্ক হাউসে' আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে মুনাফা লাভ করাটাই বাণিজ্যের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শ্রমিকদের হেয় প্রতিপন্ন করা এবং দুর্বল ভাবার প্রবৃত্তি চালু হয়। এইসব ঘটনার কড়া নিন্দা করে, চার্লস ডিকেন্সের মতো ঔপন্যাসিকেরা মানুষের জীবন ও চরিত্রের উপর শিল্পায়নের গুরুতর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখা উপন্যাস *'হার্ড টাইমস্'* (১৮৫৪)-এ বর্ণিত কোকটাউন নামক শহরটি একটি কাল্পনিক শিল্পনগরী। সেখানে মেশিনের ঘড়ঘড় আওয়াজ, ধোঁয়া বেড়োনোর চিমনী, দূষিত নদী এবং ঘরবাড়ীগুলো সব একইরকম দেখতে ছিল। শ্রমিকরা এখানে 'হাত' হিসেবে পরিচিত ছিল যেন মেশিন চালক ছাড়া তাদের আর কোনো পরিচয় ছিল না। ডিকেন্স শুধু মুনাফা লাভের প্রতি লোভ নিয়ে আলোচনা করেননি, বরং তিনি ওই ধারণাগুলোর কড়া সমালোচনা করেছেন, যার দ্বারা মানবজাতিকে উৎপাদনের সহজলভ্য উপকরণের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়।

ডিকেন্স তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলোতেও শিল্পবিপ্লবের দরুন পুঁজিবাদের অধীন শহুরে

আলোচনা করো :

নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার উপন্যাস দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে—

- পত্র সম্বন্ধীয় উপন্যাস
- ধারাবাহিক উপন্যাস

প্রতিটি শৈলীর লেখার একজন করে লেখকের নাম লিখ।

চিত্র 5 – চার্লস ডিকেন্স (1812-1870).

জীবনযাত্রার ভয়ানক অবস্থার উপর আলোকপাত করেন। তাঁর *'ওলিভার টুইস্ট'* (১৮৩৮) উপন্যাসটি হল একজন দরিদ্র অনাথের গল্প যে ছোটো খাটো অপরাধী এবং ভিক্ষুকদের দুনিয়ায় বসবাস করতো। একটি যন্ত্রনাদায়ক ওয়ার্ক হাউস (৬নং চিত্র দেখ) বা কারখানায় প্রতিপালিত হওয়ার পর অলিভারকে অবশেষে একজন ধনী ব্যক্তি দত্তক নেন এবং সে সুখে বসবাস করতে থাকে। তবে গরীবদের জীবন নিয়ে লেখা সব উপন্যাস পাঠকদের আনন্দদায়ক পরিসমাপ্তি দেয় নি। ফ্রান্সের একজন তরুন খনি শ্রমিককে নিয়ে লেখা এমিল জোলার উপন্যাস *'জার্মিনেল'* (১৮৮৫)-এ খনি শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার রূঢ় বর্ণনা দেওয়া হয়। এই উপন্যাসে লেখক একটি দুঃখজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন; গল্পের নায়ক যে হরতাল আহ্বান করেন তা অসফল হয় এবং তাঁর সহকর্মী শ্রমিকরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং সব আশা চুর্ণ হয়ে যায়।

চিত্র 6 – ক্ষুধার্ত অলিভার আরো খাবারের জন্য অনুরোধ করে, এদিকে কারখানার অন্যান্য বাচ্চারা ভয়ের সাথে তার দিকে তাকাচ্ছে। অলিভার টুইস্টের উপর চিত্রিত।

চিত্র 7 – এমিল জোলা, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড মেনেট দ্বারা চিত্রিত।
ম্যানেট দ্বারা অঙ্কিত ফরাসী লেখক জোলার প্রতিকৃতি, যেখানে দেখানো হচ্ছে লেখক তাঁর লেখার টেবিলের সামনে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছেন। এই চিত্রে লেখকের সাথে বইয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিবরণ পাওয়া যায়।

1.3 সম্প্রদায় এবং সমাজ

উপন্যাসের পাঠকবর্গের অধিকাংশই শহরে বসবাস করত। উপন্যাস তাদেরকে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নিয়তির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করার অনুভূতি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক হামাস হার্ডি, ইংল্যান্ডের দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে

যাওয়া ঐতিহ্যগত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো সম্পর্কে লিখেছেন। এটি বস্তুতপক্ষে এমন একটি সময় ছিল যখন বড়ো কৃষকরা তাদের জমিকে পরিবেষ্টিত করে এবং মেশিন ও শ্রমিক নিয়োগ করে। তারা বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন শুরু করে। যে সমস্ত স্বাধীন কৃষকরা পুরোনো সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিল তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হার্ডির *'মেয়র অব ক্যাস্টরব্রিজ'* (১৮৮৬) থেকে আমরা এই পরিবর্তনের একটি ধারণা পাই। এটি মাইক্যাল হ্যাচার্ড নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা গল্প। তিনি প্রথমে একজন সফল শস্য ব্যবসায়ী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে কেস্টারব্রিজ শহরের মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি একজন স্বাধীনচেতা লোক, যিনি ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নিজস্ব শৈলী অনুসরণ করেন। তিনি তাঁর কর্মচারীদের প্রতি কখনো কখনো খুব দয়ালু এবং কখনো কখনো নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। ফলস্বরূপ, তিনি তাঁর ব্যবস্থাপক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ফারফ্রির মতো ছিলেন না। ডোনাল্ড ফারফ্রি একজন দক্ষ পরিচালক ছিলেন। তাঁর বাণিজ্য পরিচালনা ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল এবং তিনি সবার সাথে একই ধরনের ব্যবহার করতেন। তাই লোকে তাঁকে পছন্দ করত। আমরা আরো দেখতে পাই যে এই গল্পে হার্ডি অধিকতর ব্যক্তিগতভাবে সাজানো পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি সে সময়ের সমস্যাগুলোর সঙ্গে পরিচিত এবং নতুন যুগের সুবিধাগুলোর সম্পর্কে সচেতন।

চিত্র 8 – থমাস হার্ডে (1840-1928).

উপন্যাসে স্থানীয় ভাষা (Vernacular), অর্থাৎ জনসাধারণের কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হত। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের ভাষা কাছাকাছি চলে আসার ফলে উপন্যাস একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ বিশ্বের রচনা করে। এভাবে উপন্যাস ভাষার বিভিন্ন শৈলী থেকেও উপাদান সংগ্রহ করে। একটি উপন্যাসে একসাথে ধ্রুপদী ভাষা এবং স্থানীয় ভাষাকে একত্রিত করে উপন্যাসের নিজস্ব ভাষা শৈলিতে প্রকাশ করা যায়। রাষ্ট্রের মতো উপন্যাসও অনেক সংস্কৃতিকে একত্রিত করে।

1.4 নারীর নতুন রূপ

উপন্যাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল মহিলাদের সাথে যুক্ত হওয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্তরা আরো সমৃদ্ধশালী হয়। ফলে মহিলারা উপন্যাস লেখা ও পড়ার আরোও বেশি অবসর পায়। উপন্যাস নারীদের জগৎ - তাদের আবেগ এবং পরিচয়, তাদের অভিজ্ঞতা এবং সমস্যাগুলোর অন্বেষণ করতে শুরু করে।

অনেক উপন্যাস গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছিল। এখানে নারীদের কোনো একটি বিষয় নিয়ে কর্তৃত্বের সাথে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পারিবারিক জীবনের গল্প লিখে জনসাধারণের স্বীকৃতি অর্জন করেন।

নতুন শব্দ

Vernacular (মাতৃভাষা) — কোনো একটি ভাষার স্বাভাবিক কথ্যরূপ যা কিনা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার বিধিসম্মত রূপ থেকে পৃথক।

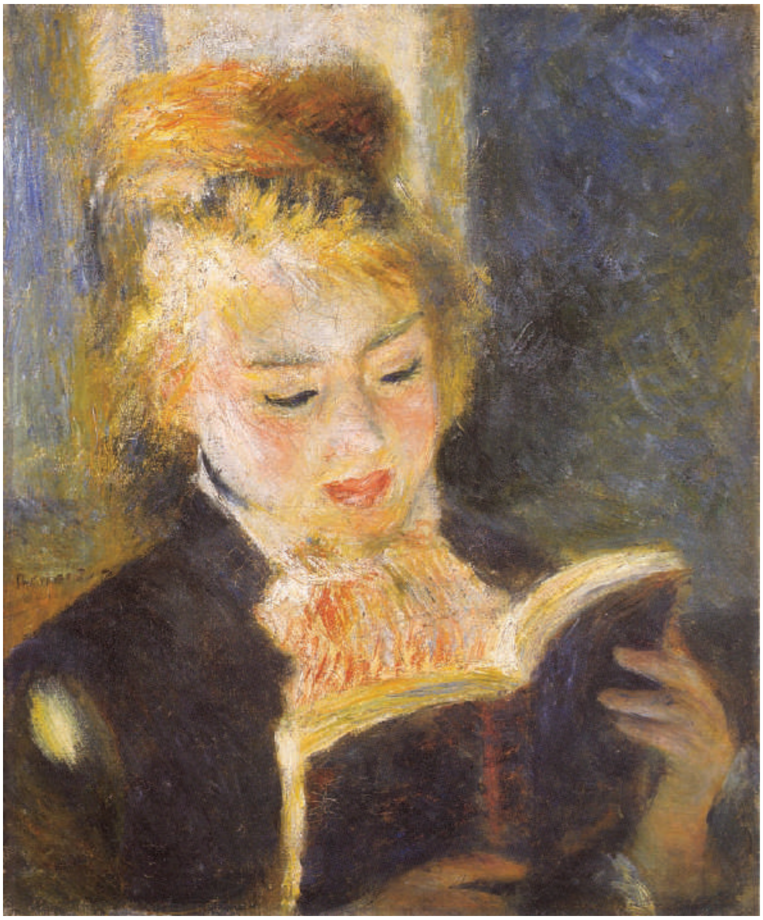

চিত্র 9 – একটি মেয়ের বই পড়ার দৃশ্য। চিত্রকর জ্যঁা রেনইরের (1841-1919) আঁকা একটি ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ঘরের ভিতরে একান্তে চুপচাপ পাঠরতা মহিলাদের ছবি ইউরোপীয় চিত্রে অনেক দেখা যেত।

চিত্র ***10*** **–** একজন লেখিকার ঘর। জর্জ ক্রুইকশ্যঙ্ক (***George Cruikshank***) কর্তৃক আঁকা ছবি। যখন মহিলারা উপন্যাস লেখা শুরু করে দেয় তখন অনেক লোক এটা ভেবে ভীত হয়ে পড়েন যে, এখন 'পত্নী' এবং 'মা' এর ঐতিহ্যগত ভূমিকা পালনে তাঁরা অবহেলা করবেন এবং বাড়িঘরে অব্যবস্থা দেখা দেবে।

জেন অস্টিনের উপন্যাসগুলোতে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটেনের গ্রামীণ সুশীল সমাজের আভাস দেখতে পাই। আমাদের এমন একটি সমাজের ব্যাপারে চিন্তা করার প্রেরণা আসে, যেখানে মহিলাদের ধনী তথা সম্পদশালী স্বামী খুঁজে ভালো বিয়ে (good marriages) করার জন্য উৎসাহিত করা হতো। জেন অস্টিনের উপন্যাস 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস্' (*Pride and Prejudice*) এর প্রথম লাইনে বলা আছে : "এটা একটা চিরসত্য কথা যে, একজন অবিবাহিত পুরুষ লোক যদি ভাগ্যবান তথা প্রচুর অর্থের মালিক হন তবে অবশ্যই উনি একজন পত্নীর অপেক্ষায় থাকবেন"। এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা প্রধান চরিত্রগুলোর আচরণ বুঝতে পারি, যারা বিয়ে এবং টাকা-পয়সার চিন্তাতেই মগ্ন - যা কিনা অস্টিনের সমাজ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো।

চিত্র 11 – জেন অস্টিনের ছবি (1775-1817).

কিন্তু মহিলা ঔপন্যাসিকগণ শুধুমাত্র মহিলাদের সাংসারিক ভূমিকাকে জনপ্রিয় করে তুলেননি। প্রায়শই: তাদের উপন্যাসগুলোতে আমরা এমন নারী চরিত্র খুঁজে পাই যারা সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পূর্বে এগুলো লঙ্ঘন করতো। এই ধরনের গল্পগুলো পড়ে পাঠিকারা বিদ্রোহী কার্যকলাপের সাথে সহমর্মিতা পোষণ করতো। ১৮৪৭ খ্রীঃ প্রকাশিত শার্লট ব্রন্টির (Charlotte Bronte) 'জেন আইর' (*Jane Eyre*) নামক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তরুণী জেনকে স্বাধীন এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেসময় পর্যন্ত মেয়েরা শান্ত এবং অনেক ভদ্র হবে বলে আশা করা হতো, কিন্তু দশ বছর বয়সেই বড়োদের ভণ্ডামির

চিত্র 12 – বিয়ের চুক্তি। উইলিয়াম হগার্থের (1697-1764) আঁকা ছবি।
তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, ছবির সামনের দিকে বসা দুইজন পুরুষলোক বিয়ের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করাতে ব্যস্ত। আর মহিলারা পেছনদিকে বসে আছেন।

বিরুদ্ধে জেন-এর কঠোর প্রতিবাদ পাঠকবর্গকে চমকে দেয়। তার সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করা কাকিমাকে সে বলে, "লোকে ভাবে আপনি একজন ভালো মহিলা, কিন্তু আসলে আপনি খারাপ ... আপনি প্রবঞ্চক! এই জীবনে আমি কখনো আপনাকে কাকিমা বলে ডাকবো না'।

চিত্র 13 – শার্লট ব্রন্টি (1816-1855).

বক্স 1

মহিলা ঔপন্যাসিকগণ

জর্জ এলিয়ট (George Eliot) (1819-1880) ছিলো মেরি এন ইভান্স (Mary Ann Evans) এর ছদ্মনাম। তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উপন্যাসগুলো মহিলাদের নিজেদের মুক্তভাবে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। প্রত্যেক মহিলাই গল্প বা উপন্যাস লিখতে সক্ষম :

'গল্প রচনা সাহিত্যের একটি বিভাগ যেখানে মহিলারা নিজেদের নিজস্ব ভঙ্গিমায় পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারে ... কোনওরকম শিক্ষাগত প্রতিবন্ধকতা মহিলাদের গল্পের উপাদান থেকে বঞ্চিত করতে পারে না, এবং শিল্পকলার এমন কোনোও বিভাগ নেই যেটি বাঁধাধরা প্রয়োজনীয়তা হতে ত্রুটি মুক্ত।'

1856 খ্রীঃ প্রকাশিত জর্জ এলিয়টের 'সিলি নভেলস্ বাই লেডি নভেলিস্টস্' থেকে নেওয়া।

1.5 তরুণদের জন্য উপন্যাস

কিশোরদের জন্য রচিত উপন্যাসগুলোতে এক নতুন ধাঁচের আদর্শ পুরুষকে দেখানো হয় - যারা খুবই শক্তিশালী, দৃঢ়চেতা, স্বাধীন এবং সাহসী ছিলেন। এধরনের অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমি ছিলো ইউরোপ থেকে দূরের কোনোও জায়গা এবং যেগুলো রোমাঞ্চকর অভিযানের বর্ণনায় পূর্ণ ছিলো। উপনিবেশ স্থাপনকারীদের বীর এবং সম্মানীয় হিসেবে দেখানো হয়। কারণ তারা অজানা পরিবেশে দেশীয় লোকেদের মুখোমুখি হয় এবং দেশীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয় তথা দেশীয় জীবনযাত্রাকে পাল্টে দেয়। অনেক ভূ-ভাগে তারা উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সেখানে রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটায়। আর. এল. স্টিভেনসনের *'ট্রেজার আইল্যান্ড'* (১৮৮৩) অথবা রুডইয়ার্ড কিপলিঙয়ের *'জঙ্গল বুক'* (১৮৯৪) এর মতো বইগুলো খুবই সফল হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর সময়ে জি.এ.হেন্টির লেখা ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনীমূলক উপন্যাসগুলো শিশু-কিশোরদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেগুলো পাঠকদের মনে অজানা ভূমি দখল করার উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এই উপন্যাসগুলোর পটভূমি ছিলো মেক্সিকো, আলেকজান্দ্রিয়া, সাইবেরিয়া এবং আরোও অনেক দেশ। এই উপন্যাসগুলোতে সবসময় কিশোর বয়সের ছেলেদের মহান ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হিসেবে দেখানো হতো যারা কোনোও সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করতো এবং তাকে 'ইংরেজদের' সাহসিকতা, বলে অভিহিত করতো। এই সময়ে, বিশেষ করে আমেরিকায় কিশোরী মেয়েদের জন্য রচিত প্রেম-ভালোবাসার গল্পগুলো প্রথম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হেলেন হান্ট জ্যাকসন রচিত *'রামোনা' Ramona* (1884) এবং

বক্স 2

জি.এ.হেন্টি. (G.A. Henty) (1832-1902):

'আন্ডার ড্রেক্স ফ্ল্যাগ' (1883 খ্রীঃ) নামক বইতে দু'জন তরুণ এলিজাবেথান অভিযানকারী দৃশ্যতঃ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়ে কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অহংকার ত্যাগ করতে রাজী নয় যে, তারা ইংরেজ : 'দেখো নেড, ভাগ্য আমাদের আশাতীতভাবে সাহায্য করেছে। হয়তো বা আমরা সেদিনই মারা যেতাম যেদিন আমরা এখানে পৌঁছেছিলাম। আমরা সমতলভূমিতে শিকার করতে করতে মজাদার ছয়টি মাস কাটিয়ে দিলাম। আমাদের যদি মারা যেতেই হয়, তবে চলো আমরা ইংরেজ তথা খ্রিস্টানদের মতো ব্যবহার করি।

সুসান কলিজ (Susan Collidge) ছদ্মনামে সারাহ চাউনসি ওলসির (Sarah Chauncey Woolsey) কয়েকটি খণ্ডে রচিত 'হোয়াট কেটি ডিড' (What Katy Did 1872) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

1.6 উপনিবেশবাদ এবং তার পরবর্তী সময়

ইউরোপে এমন একটা সময়ে উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল যখন সে সারা বিশ্বে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলো। উপনিবেশবাদের শুরুর দিকের উপন্যাসগুলোর অবদান এটাই ছিলো যে, সেগুলো পাঠকবর্গের মনে ঔপনিবেশিকদের মহান সমাজের অংশীদার হওয়ার অনুভূতি জাগায়, ড্যানিয়েল ডেফোর লেখা 'রবিনসন ক্রুসো' (1719 খ্রীঃ) বইয়ের নায়ক সাহসিক অভিযাত্রী হওয়ার সাথে সাথে একজন দাস-ব্যাপারীও ছিল। একটি দ্বীপে জাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার পর ক্রুসো কালো মানুষদের সাথে এমনভাবে ব্যবহার করে যে, ওই লোকগুলো যেন তার মতো কোনো মানুষ নয় বরং নীচু প্রজাতির কোনো জীব। সে একজন দেশীয় লোককে (Native) বাঁচায় এবং তাকে তার দাস বানিয়ে নেয়। সে ঐ লোকটির নাম পর্যন্ত জানার চেষ্টা করেনি বরং অহংকার করে তার নাম রাখে ফ্রাইডে। তবুও ঐ সময়ে ক্রুসোর ব্যবহারকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি, বরঞ্চ এটাকে সবাই গ্রহণ করেছিলো। ঐ সময়ের অধিকাংশ লেখকই উপনিবেশবাদকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতেন। উপনিবেশগুলোর বাসিন্দাদের আদিম, বর্বর এবং মানবেতর জীব হিসেবে ধরা হতো। তাদেরকে সুসভ্য করে সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত করার জন্য ঔপনিবেশিক নিয়মকানুন খুবই প্রয়োজনীয় হিসেবে মনে করা হতো। বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে জোশেফ কনরাডের (1857-1924) মতো লেখকরা নিজেদের উপন্যাসগুলোতে উপনিবেশবাদের অন্ধকার দিকটি দেখিয়েছেন।

উপনিবেশগুলোর বাসিন্দারা বিশ্বাস করতেন যে, উপন্যাসগুলো তাদের নিজস্ব পরিচয় এবং সমস্যাগুলোকে তথা জাতীয় বিষয়গুলোকে খুঁজে বের করার সুযোগ করে দেয়। চলো আমরা দেখি, কীভাবে ভারতবর্ষে উপন্যাস জনপ্রিয় হয় এবং সমাজের উপর এদের কী প্রভাব ছিল?

2 ভারতবর্ষে উপন্যাসের আগমন

গদ্যরীতিতে গল্পরচনা ভারতবর্ষের জন্য নতুন বিষয় নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে বানভট্ট সংস্কৃত ভাষায় *'কাদম্বরী'* রচনা করেন। এইরকম আরেকটি উদাহরণ হল 'পঞ্চতন্ত্র'। এছাড়া ফার্সি ও উর্দুতেও দুঃসাহসিক অভিযান, শৌর্য ও বীরত্বপূর্ণ গদ্য কাহিনীর একটি সুদীর্ঘ পরম্পরা ছিল, যেগুলোকে *'দাস্তান'* বলা হতো।

যদিও বর্তমানযুগে উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি, তার থেকে ঐ রচনাগুলো একটু ভিন্ন ছিল। ভারতীয়দের পাশ্চাত্য উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিতির সাথে সাথে, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আধুনিক উপন্যাসের বিকাশ ঘটে। দেশীয় ভাষায় মুদ্রণ এবং পাঠক শ্রেণির উদ্ভব এই উপন্যাস রচনার প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয়। শুরুর দিকের কিছু ভারতীয় উপন্যাসকে বাংলা এবং মারাঠা ভাষায় রচনা করা হয়। 1857 সালে প্রকাশিত, বাবা পদ্মানজীর লেখা মারাঠী ভাষায় সর্বপ্রথম উপন্যাস ছিল 'যমুনা পর্যটন'। যার মধ্যে বিধবাদের দুরবস্থা সংক্রান্ত গল্পকাহিনী সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে লক্ষ্মণ মোরেশ্বর হাল্বে (Lakshman Moreshwar Halbe's) 1861 সালে *'মুক্তমালা'* উপন্যাসটি রচনা করেন। এটি কোন বাস্তবধর্মী উপন্যাস ছিল না বরং কাল্পনিক 'রোমান্টিক' কাহিনির সাথে নৈতিক উদ্দেশ্যগুলোকে তাতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকরা কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই উপন্যাসগুলো রচনা করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসকেরা সমকালীন ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট হিসেবে গণ্য করত। অন্যদিকে ভারতীয় ঔপন্যাসিকরা দেশের আধুনিক সাহিত্যের বিকাশের উদ্দেশ্যে এমন সাহিত্যের রচনা করেছেন, যা মানুষের মধ্যে দেশের প্রতি আনুগত্য বোধ জাগিয়ে তোলে এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের সাথে তাদের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যতা গড়ে তোলে।

আঞ্চলিক ভাষায় উপন্যাসগুলো অনুবাদ হওয়ায় এইগুলোর জনপ্রিয়তা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন অঞ্চলে উপন্যাসগুলো বিকশিত হতে থাকে।

বক্স 3

সমস্ত মারাঠী উপন্যাসগুলো বাস্তবধর্মী ছিল না, নারু সদাশিব ঋষবাদ তাঁর মারাঠী উপন্যাস *'মঞ্জু ঘোষ'* (1868) এ তিনি অত্যন্ত আলঙ্কারিক ভাষার শৈলী ব্যবহার করেন। এই উপন্যাসটি মজাদার ঘটনায় ভরপুর ছিল। উপন্যাসের মধ্যে তার এইরকম শৈলী বাছাইকরণের পেছনে একটি কারণ ছিল।

তিনি বলেন —

'বিবাহের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্য বহু কারণেই হিন্দুদের জীবনে না কোন চিত্তাকর্ষক উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় থাকে, না থাকে কোনো আকর্ষণীয় মূল্য ....। যদি আমরা প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখি, তবে তাতে বিনোদনের কিছুই থাকবে না। এইজন্যই যদি আমাদের মনমুগ্ধকর পুস্তক লিখতে হয়, তবে আমাদের কিছু আনন্দদায়ক বিষয়বস্তু পুস্তকের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতেই হবে।'

2.1 দক্ষিণ ভারতের উপন্যাস

ঔপনিবেশিক শাসন চলাকালীন সময়ে উপন্যাসগুলো দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমদিকের বেশ কিছু উপন্যাস ছিল ইংরেজী উপন্যাসের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের প্রচেষ্টার ফল। উদাহরণস্বরূপ, ও. চন্দুমেনন নামের মালাবারের একজন উপ-বিচারপতি, যিনি বেঞ্জামিন ডিসরায়লির ইংরেজী উপন্যাস *'হেনরিয়াটা টেম্পল'* (*Henrietta Temple*) কে মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়াস করেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার কেরালার পাঠকগণ ইংরেজী উপন্যাসগুলোর মধ্যে বর্ণিত চরিত্রগুলোর জীবনযাত্রা, পোষাক পরিচ্ছদ, কথা বলার ধরন এবং আদব কায়দা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। ইংরেজী ভাষায় উপন্যাসগুলোর সরাসরি অনুবাদ তাদের কাছে ভীষণ বিরক্তিকর বলে মনে হতো। এইজন্যই তিনি অনুবাদ করার চিন্তাধারা ছেড়ে দেন এবং এর পরিবর্তে তিনি ইংরেজী উপন্যাসের ধাঁচে একটি মালয়ালম কাহিনি রচনা করেন। 1889 সালে *'ইন্দুলেখা'* নামক মনমুগ্ধকর উপন্যাসের প্রকাশনা হয়, যা মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত প্রথম আধুনিক উপন্যাস ছিল।

চিত্র14 – চন্দু মেনন (1847-1899).

অন্ধ্রপ্রদেশের ঘটনাও অদ্ভুতভাবে একইরকম ছিল। অলিভার গোল্ড স্মিথ-এর রচিত *'ভিকার অফ ওয়েক ফিল্ড'* (*Vicar of Wakefield*)-এর তেলেগু অনুবাদ করা শুরু করেন কান্ডুকুরি বিরেসালিঙ্গাম্ (1848-1919)। কিন্তু তিনিও একই কারণে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং তার পরিবর্তে 1878 সালে তিনি 'রাজশেখর চরিতামু' নামে একটি মৌলিক তেলেগু উপন্যাস রচনা করেন।

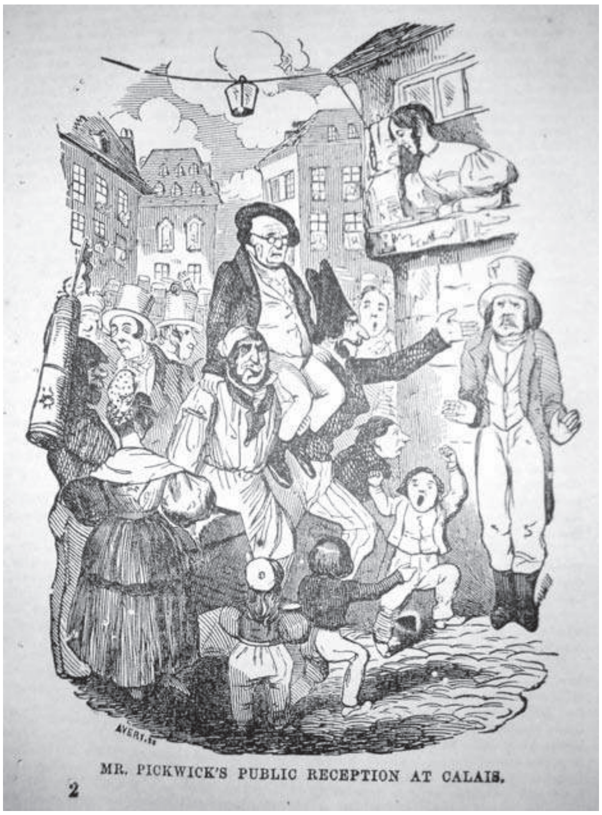

চিত্র 15 – 'পিক উইক্ এবব্রড' নামক পুস্তক থেকে নেওয়া একটি ছবি।
জী. ডব্লু. এম রেনল্ড এর দ্বারা লিখিত পুস্তক *'পিকউইক এবব্রড'* থেকে নেওয়া একটি চিত্রাঙ্কন।
উনবিংশ শতাব্দীতে রেনল্ড. এফ. মরিয়ন ক্রাফোর্ড এবং মেরী কোরেলী এর মতো ছোটো মাপের ইংরেজ ঔপন্যাসিকরা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাদের উপন্যাসগুলো ঐতিহাসিক প্রেমকথা, দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনি এবং জ্বলন্ত সমস্যার উপর ভিত্তি করে রচিত। এই উপন্যাসগুলো সহজলভ্য ছিল এবং উপন্যাসগুলোকে বেশ কিছু ভারতীয় ভাষায় গ্রহণ তথা অনুবাদ করা হয়। চার্লস ডিকেনস্ এর মূল *'পিক্ওইক্ পেপারস্'* (1837) এর তুলনায় রেনল্ড এর রচিত 'পিকওইক্ এব্রড' (1839) পুস্তকটি ভারতবর্ষে অধিক জনপ্রিয় ছিল।

2.2 হিন্দি উপন্যাস

উত্তর ভারতের ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ছিলেন আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের পথিকৃৎ, যিনি নিজের পরিচিত সাহিত্যিক মহলের বহু কবি এবং লেখকদের অন্যভাষায় পুনঃ রচনা এবং অনুবাদ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। তার অনুপ্রেরণায় বহু উপন্যাস কার্যত ইংরেজী অথবা বাংলা থেকে হিন্দি ভাষায় গ্রহণ এবং অনুবাদ করা হয়। কিন্তু হিন্দিতে প্রথম যথাযথ আধুনিক উপন্যাস রচনা করেন দিল্লির শ্রীনিবাস দাস।

1882 সালে প্রকাশিত, শ্রীনিবাস দাসের উপন্যাসটির শীর্ষক ছিল *পরীক্ষা-গুরু*। এই উপন্যাসে স্বচ্ছল পরিবারের যুবকদের অসৎসঙ্গের কুপ্রভাব এবং নৈতিক স্খলন-এর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল।

'পরীক্ষা গুরু' এই উপন্যাস থেকে সদ্য উদীয়মান মধ্যবিত্তদের অভ্যন্তরীণও বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে জানা যায়। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে ঔপনিবেশিক সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার অসুবিধার সাথে সাথে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার মতো কঠিন পরিস্থিতিতে পরতে দেখা যায়। ঔপনিবেশিক জগতের আধুনিকতাকে একসাথে ভীতিপূর্ণ এবং অদম্য বলে তাদের মনে হতো। উপন্যাসগুলো পাঠকদের

জীবনযাত্রার সঠিক পথ দেখাতে চেষ্টা করে এবং সমস্ত 'বিচক্ষণ' লোকেদের থেকে এই প্রত্যাশা করা হত যে, তারা যেন বিশ্বজ্ঞানী এবং কর্মে দক্ষ হয়। তার সাথে নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে যেন গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে, এবং একই সঙ্গে তারা যেন মর্যাদা ও সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

আমরা দেখি যে, উপন্যাসের চরিত্রগুলো তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পৃথক দুটি জগতের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার চেষ্টা করে। তারা নতুন কৃষি প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে, ব্যবসা বাণিজ্যে আধুনিকীকরণের ছোঁয়া লাগায়, ভারতীয় ভাষার প্রয়োগের পরিবর্তন করে, যাতে করে তারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভারতীয় দর্শন - এই দুটোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। যুবকদের কাছে সংবাদপত্র পাঠ করার 'সুঅভ্যাস' রপ্ত করার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু উপন্যাসে এই বিষয়ের উপর বেশি করে জোর দেওয়া হয় যে, মধ্যবিত্ত পরিবারের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের বিনিময়ে যাতে এইগুলো অর্জন না করা হয়। 'পরীক্ষা গুরু' এই উপন্যাসটির মধ্যে সব ভালো ভালো অভিমত দেওয়া সত্ত্বেও, এই উপন্যাসটি পাঠক শ্রেণির মন জয় করতে পারে নি। সম্ভবত এই উপন্যাসটির মধ্যে অতিরিক্ত কিছু নীতি কথা ছিল।

হিন্দি উপন্যাসের একটি পাঠক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় দেবকী নন্দন খাটরীর সাহিত্য রচনা থেকে। তাঁর সর্বাধিক বিক্রিত বইটির নাম ছিল 'চন্দ্রকান্তা'। এই উপন্যাসটি একটি চমকপ্রদ কাল্পনিক প্রেম কাহিনিতে ভরপুর ছিল। এই উপন্যাসটি তৎকালীন সময়ের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে হিন্দি ভাষা এবং নাগরি লিপির জনপ্রিয়তাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে মনে করা হয়। যদিও এই উপন্যাসটিকে শুধুমাত্র 'পড়ার আনন্দের' জন্যই রচনা করা হয়। এই উপন্যাসটি তার পাঠক শ্রেণির ভয় এবং প্রত্যাশার মধ্যে কিছু আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টিও দেয়।

প্রেমচাঁদের রচিত উপন্যাসগুলোর সাথে হিন্দি উপন্যাস চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তিনি উর্দুতে উপন্যাস রচনার পর হিন্দিতেও উপন্যাস রচনা করতে থাকেন এবং দুটো ভাষাতেই তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি ঐতিহ্যপূর্ণ *'কিস্যাগাই'* অথবা গল্পবলার কৌশল গ্রহণ করেন। অনেক সমালোচক মনে করেন যে, 1916 খ্রিঃ প্রকাশিত উনার *'সেবাসদন'* উপন্যাসটি, হিন্দি উপন্যাসকে কল্পনা, নীতিবাক্য তথা উপদেশ, সাধারণ বিনোদনের জগৎ থেকে তুলে এনে সাধারণ জনগণ এবং সামাজিক সমস্যার উপর গভীরভাবে প্রতিফলন ঘটাতে সাহায্য করে। এই উপন্যাসটিতে সমাজে মহিলাদের দুরবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথার মতো সামাজিক সমস্যাগুলো এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসে আমরা আরোও দেখতে পাই যে, ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে স্বশাসনের জন্য পাওয়া অল্প স্বল্প সুযোগ সুবিধাগুলোকে কীভাবে কাজে লাগায়।

2.3 বাংলায় উপন্যাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের বাংলা উপন্যাসগুলো দুটি ভিন্ন জগতে বাস করত। এইগুলোর অধিকাংশেরই পটভূমি ছিল অতীতকাল। এইগুলোর চরিত্র, ঘটনা বিবরণী এবং ভালবাসার গল্পগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নেওয়া। উপন্যাসের অন্য একটি সঙ্কলন সমকালীন গার্হস্থ জীবনের অভ্যন্তরীণ দুনিয়ার বর্ণনা করে। পারিবারিক

আলোচনা কর :

গোড়ার দিকে হিন্দি উপন্যাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখো।

চিত্র 4

অসম রাজ্যের উপন্যাস

অসম রাজ্যের শুরুর দিকের উপন্যাসগুলো রচনা করেন মিশনারীরা। এইগুলোর মধ্যে 'ফুলমণি' এবং 'করুণা' এই দুটোর অনুবাদ বাংলা ভাষা থেকে করা হয়। 1888 খ্রিঃ কোলকাতায় অসমীয়া ছাত্রছাত্রীরা 'অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধন' সভার প্রতিষ্ঠা করে, যা জোনাকী নামক একটি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ করে। এই সাময়িক পত্রিকা নতুন লেখকদের উপন্যাস লেখার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। রজনীকান্ত বড়দলই আসামে মনোমতি (1900) শিরোনামে প্রথম বড়ো মাপের এক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাসের পটভূমি ছিল বর্মীদের (Burmese) আক্রমণ। সম্ভবত লেখক, বৃদ্ধ সৈনিকদের কাছ থেকে এইসব আক্রমণের গল্প কাহিনী শুনেন, যারা 1819 খ্রিঃ সংগঠিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। এই উপন্যাসে দুটি শত্রুতাপূর্ণ পরিবারের দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, যারা যুদ্ধের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পুনর্মিলন ঘটে।

চিত্র16(ক) --- লক্ষ্মীনাথ বেজ-বড়ুয়া (1868–1938)

তিনি ছিলেন আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের একজন চূড়ামণি। তার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলোর মধ্যে 'বুড়ি আয়র সাধু (ঠাকুরমার কাহিনী) ছিল অন্যতম। 'ও মোর আপুনার দেশ' - শীর্ষক জনপ্রিয় গানটি তিনি রচনা করেন।

উপন্যাসগুলো প্রায়শই সামাজিক সমস্যা এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে ভালোবাসার সম্পর্ক তা নিয়ে আলোচনা করত।

কোলকাতার পুরনো সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরা সঙ্গীত সমাবেশ, নৃত্যানুষ্ঠান এবং *কবির লড়াই* তথা কাব্য প্রতিযোগিতার মতো বিনোদনগুলোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যদিকে নতুন ভদ্রলোক সম্প্রদায় নিজস্ব পড়ার জগতে উপন্যাস পড়তে স্বচ্ছন্দ বোধ করতো। তারা স্বতন্ত্রভাবে উপন্যাস পড়তো। দলগতভাবেও উপন্যাস পড়া হত। বাংলা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক সময় তাঁর ঘরের প্রাঙ্গনে যাত্রা পালার আয়োজন করতেন, যেখানে তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও জড়ো হতো। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য চর্চার কক্ষে সাহিত্য জগতের বন্ধুরা সমবেত হয়ে, সাহিত্য কৃতিগুলোকে পাঠ করে তার মূল্যায়ন করত। বঙ্কিম চন্দ্র যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী' (1865) কে সাহিত্য জগতের বন্ধুদের সামনে পাঠ করে শুনান, তখন উপস্থিত শ্রোতারা এটা উপলব্ধি করে অবাক হয়ে যান যে, বাংলা সাহিত্য এতো তাড়াতাড়ি তার শ্রেষ্ঠত্বের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে গেছে।

ঘোরানো প্যাচানো নিখুঁত প্রেক্ষাপট এবং রহস্যাবৃত হওয়ার সাথে সাথে উপন্যাসগুলো ভাষার নিপুণতার জন্য প্রশংসনীয়ও ছিল। গদ্য রচনা শৈলীর আনন্দ দানের একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। শুরুর দিকে বাংলা উপন্যাসগুলোতে শহুরে জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত চলিত ভাষার রীতি প্রয়োগ হত। মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত মেয়েলী ভাষারীতিরও ব্যবহার হত। এই শৈলী খুব দ্রুত বদলে যায়, তার স্থান দখল করে বঙ্কিম চন্দ্রের সংস্কৃত ভাষারীতি। কিন্তু এইগুলোতে দেশীয় রীতিও লক্ষ করা যায়।

বাংলায় (Bengal) উপন্যাস খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বিংশ শতাব্দীর দিকে, বিখ্যাত কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (1876-1938) সহজ সরল ভাষায় গদ্য উপন্যাস রচনার কারণে তিনি বাংলা তথা পুরো ভারতবর্ষে এক জনপ্রিয় সাহিত্যিক হয়ে উঠেন।

চিত্র 16(খ) — বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (1838-1894).
পুস্তকের উপর হাত রাখা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি এটা নির্দেশ করে যে, তাঁর সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদার ভিত্তি ছিল পুস্তক রচনা।

বক্স 5

উড়িয়া ভাষায় লেখা উপন্যাস

1877-78 সালের দিকে, নাট্যকার রামশঙ্কর রায় তাঁর 'সৌদামণি' নামক প্রথম উড়িয়া উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশনা শুরু করেন। কিন্তু এই উপন্যাসটিকে তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে, উড়িষ্যাতে ফকীর মোহন সেনাপতি (1843-1918) নামে একজন বড়ো মাপের ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। তার একটি উপন্যাসের শিরোনাম ছিল 'ছা মানা আঠা গুণ্ঠা' (1902) যাকে বাংলা করলে দাঁড়ায় 'ছয় একর এবং বত্রিশ শতক জমি'। এটি একটি নতুন ধরনের উপন্যাসের সূচনা করে, যেগুলো জমি এবং তার অধিগ্রহণের প্রশ্নের সাথে জড়িত ছিল। এই উপন্যাসটির মধ্যে রামচন্দ্র মঙ্গারাজের কাহিনি রয়েছে, যে ছিল জমিদারের একজন ম্যানেজার। সে তার মদ্যপ এবং অলস প্রকৃতির মালিকের সাথে প্রতারণা করে এবং এরপরে, তার নজর পরে ভাগিয়া এবং সারিয়া নামের এক সন্তান হীন তাঁতী দম্পতির উর্বর ফসলী জমির উপর। মঙ্গারাজ এই দম্পতিকে বোকা বানিয়ে তাদের জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য, তাদের ঋণগ্রস্ত করে। এই উপন্যাসটি এমন একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়, যাতে গ্রামীণ সমস্যাগুলোকে শহুরে চিন্তা ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখানো যেত। এই উপন্যাস রচনার মাধ্যমে ফকীর মোহন, বাংলা তথা অন্যান্য অঞ্চলে অনেক লেখকদের জন্য নতুন রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন।

চিত্র 17 – মন্দির এবং বৈঠকখানা
ছবির ডানদিকে, কক্ষটিতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য সদস্যরা একত্রিত হতো। এছাড়া বাদিকে অবস্থিত বৈঠকখানাতে বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর কিছু নির্বাচিত বন্ধুদের সাথে নতুন সাহিত্য কর্মগুলোকে নিয়ে চর্চা করতেন। তোমরা লক্ষ করো যে, পরম্পরাগত এবং আধুনিক - এই দুই রকমের জায়গা একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। তা থেকে বোঝা যায় যে, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবিরা ভিন্ন রকমের জীবনযাত্রার শৈলীতে অভ্যস্ত ছিল, যা সাধারণদের থেকে আলাদা।

3 ঔপনিবেশিক বিশ্বে উপন্যাস

যদি আমরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপন্যাসের ইতিহাস অনুসরণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই সেখানে অনেক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু সেখানেও একই ধরনের লিখনগত সাদৃশ্যতা রয়েছে। লেখকদের উপন্যাস লেখার প্রেরণা কোথা থেকে আসত ? উপন্যাসগুলোর পাঠক কারা ছিল ? উপন্যাস পাঠের সংস্কৃতি কীভাবে বিকশিত হয় ? ঔপনিবেশিক সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যার সাথে উপন্যাস কীভাবে জড়িত হয়েছে? উপন্যাস পাঠকদের সামনে কি ধরনের জগৎকে তুলে ধরে ? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের প্রাথমিকভাবে তিনটি ভিন্ন অঞ্চলের এই তিন জন লেখকের রচনার দিকে নজর দিতে হবে : চন্দু মেনন, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রেমচাঁদ।

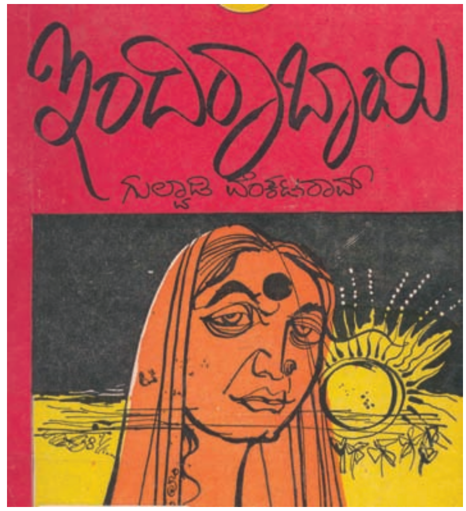

চিত্র 18 – উপন্যাস ইন্দিরাবাঈ-এর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা উপন্যাস ইন্দিরাবাঈ আজও জনপ্রিয় এবং নিয়মিতভাবে এর পুনঃমুদ্রণ হচ্ছে। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাটি সাম্প্রতিক কালের একটি সংস্করণের।

3.1 উপন্যাসের ব্যবহার

ভারতের ঔপনিবেশিক শাসকগণ উপন্যাসের মধ্যে স্বদেশীয় জীবনের রীতিনীতির সাথে যুক্ত কিছু বহুমূল্য তথ্য খুঁজে পায়। ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় ও জাতির শাসনের জন্য এইসব তথ্য উপযোগী ছিল। বহিরাগত হিসাবে ব্রিটিশদের ভারতীয় ঘরোয়া জীবন সম্পর্কে সামান্য ধারণা ছিল। ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এই নতুন উপন্যাসগুলিতে প্রায়শই গার্হস্থ্য জীবনের বর্ণনা পাওয়া যেতো। উপন্যাস পড়ে মানুষের পোষাক পরিধান, ধর্মীয় পূজাপাঠ এবং তাদের বিশ্বাস ও অনুশীলন সম্পর্কে জানা যায়। এই বইগুলোর মধ্যে কিছু বই ব্রিটিশ প্রশাসক ও খ্রীস্টান মিশনারীরা ইংরেজীতে অনুবাদ করে।

ভারতীয়রা তাদের সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি দিকগুলোর সমালোচনা ও তার প্রতিকার করার জন্য উপন্যাসকে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। বীরসালিঙ্গামের মতো লেখকগণ প্রধানত সমাজ সম্পর্কিত নিজস্ব চিন্তাধারা পাঠকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে দেবার জন্য উপন্যাসকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন।

উপন্যাসের সাহায্যে অতীতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যেতো। অনেক উপন্যাসে অতীত দিনের ষড়যন্ত্রে ভরা রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক গল্পের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালকে মহিমান্বিত করে এই উপন্যাসগুলো পাঠকের কাছে রাষ্ট্রীয় গৌরব ভাবনা সঞ্চার করতে সাহায্য করে।

এরই সঙ্গে সমাজের সকল জনগণ যারা একটি নির্দিষ্ট ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিল তারা ঐ ভাষায় রচিত উপন্যাসগুলো পড়তে পারত। এভাবে নিজস্ব ভাষার ভিত্তিতে যৌথ একাত্মতার চেতনা সৃষ্টি হত। তুমি লক্ষ করেছ যে, বিভিন্ন অঞ্চলের লোক একই ভাষাকে পৃথক পৃথকভাবে বলে, অনেক সময় একই বস্তুর জন্য ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে আবার অনেক সময় একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করে। উপন্যাসের আগমনের সাথে সাথে এই ধরনের বিভিন্নতাগুলো মুদ্রণ জগতে প্রথমবার প্রবেশ করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো যেভাবে কথা বলত সেটা তাদের অঞ্চল, শ্রেণি

বক্স 6

সংশোধনের বার্তা

পূর্বের অনেক উপন্যাসে সমাজ সংস্কারের বার্তা স্পষ্টভাবে বহন করত। উদাহরণস্বরূপ ১৮৯৯ খ্রীঃ গুলাবড়ী ভেঙ্কটরাও রচিত কন্নড় উপন্যাস ‘ইন্দিরাবাঈ’-এ নায়িকাকে খুব অল্প বয়সে এক বৃদ্ধ লোকের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। খুব শীঘ্রই তার স্বামী মারা যায় এবং তাকে বিধবার জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়। নিজের পরিবার এবং সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইন্দিরাবাঈ তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অবশেষে সে আবার বিয়ে করে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এক প্রগতিশীল ব্যক্তিকে। ঐ সময় কর্ণাটকের সমাজ সংস্কারকের সামনে যে সমস্যাগুলো গুরুত্ব পায় সেগুলো হল নারী শিক্ষা, বিধবাদের দুর্দশা, মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদি।

বক্স 7

তামিল ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় ইতিহাসবিদ ঔপন্যাসিক আর. কৃষ্ণমূর্তি কল্কি ছদ্মনামে লিখতেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রসিদ্ধ তামিল পত্রিকা 'আনন্দভিকতন' ও 'কল্কির' সম্পাদক ছিলেন। সহজ সরল ভাষায় লেখা এবং পরাক্রম, রোমাঞ্চ, রহস্যে ভরা কল্কির উপন্যাসগুলো তামিল ভাষাভাষী লোকদের একটি সমগ্র প্রজন্মকে মাতিয়ে রেখেছিল।

চিত্র 19 – কল্কির দ্বারা লেখা এবং 'কাল্ক' নামক পত্রিকায় 1951 খ্রিঃ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস পৌন্নিয়ন সেলবন-এর একটি পৃষ্ঠা

অথবা জাতির পরিচয়ের ইঙ্গিত দিতে শুরু করে। এভাবে দেশের অন্য অঞ্চলের লোকরা তাদের ভাষায় কীভাবে কথা বলত এর সাথে উপন্যাসগুলো পাঠকদের পরিচয় ঘটায়।

3.2 আধুনিকতার সমস্যা

যদিও উপন্যাসের কাহিনিগুলো কাল্পনিক তবুও সেগুলো প্রায়শই পাঠকদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে বলে। তবে উপন্যাসে সবসময় বাস্তবকে হুবহু দেখানো হয়নি। অনেক সময় বাস্তব জগৎ কেমন হতে পারে তার নমুনা উপন্যাসে পাওয়া যেত। সামাজিক ঔপন্যাসিকরা প্রায়ই আদর্শ গুণাবলি সম্পন্ন নায়ক ও নায়িকা তৈরি করত, যাদের দ্বারা পাঠকরা মুগ্ধ হত এবং তারা তাদের অনুকরণ করত। কীভাবে এই আদর্শ গুণাবলি সংজ্ঞায়িত হয়? ঔপনিবেশিক সময়ের অনেক উপন্যাসে আদর্শ ব্যক্তি তার প্রধান দ্বিধার সফলতাপূর্বক মোকাবিলা করেছে, যেমন-চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ না করে কীভাবে আধুনিক হওয়া যায় অথবা নিজ পরিচয় বর্জন না করে কীভাবে পশ্চিমী ভাবধারা গ্রহণ করা যায় ইত্যাদি।

চন্দু মেনন তাঁর উপন্যাসে ইন্দুলেখা নামে যে নারী চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন সেই অপূর্ব সুন্দরী বৌদ্ধিক ও শিল্পীসুলভ প্রতিভার অধিকারিনী এবং সেই সাথে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। উপন্যাসের নায়ক মাধবন চরিত্রটিকেও আদর্শ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত নায়ার শ্রেণির সদস্য ছিলেন। তিনি আবার সংস্কৃতের প্রথম সারির পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য বস্ত্র পরিধান করতেন। কিন্তু পাশাপাশি তিনি নায়ার রীতি অনুযায়ী লম্বা চুলের টিকি রাখতেন।

অধিকাংশ উপন্যাসেই নায়ক এবং নায়িকারা আধুনিক জগতের বাসিন্দা ছিল। এইভাবে তারা ভারতের প্রাচীন কাব্য সাহিত্যে বর্ণিত আদর্শ অথবা পৌরাণিক চরিত্র থেকে অনেকটাই আলাদা। ঔপনিবেশিক শাসনকালে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণি পাশ্চাত্য জীবনযাপন এবং চিন্তা ধারার প্রতি আকর্ষিত হয়। কিন্তু তাদের এই ভয়ও ছিল যে এই পাশ্চাত্য মূল্যবোধ গ্রহণের ফলে তাদের চিরাচরিত জীবনধারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ইন্দুলেখা এবং মাধবন চরিত্র দ্বারা পাঠকদের দেখানো হয়েছে কীভাবে ভারতীয় ও বিদেশী জীবন ধারার মধ্যে আদর্শের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব।

3.3 পাঠের আনন্দ

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো উপন্যাস ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিনোদনের জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠে। মুদ্রিত বইয়ের প্রচারের পর মানুষের আমোদ প্রমোদের নতুন পথ তৈরি হয়। সচিত্র পুস্তক, বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত বই, জনপ্রিয় সঙ্গীত যা অনেক সময় সমসাময়িক ঘটনার উপর রচিত হত, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্প এসবই বিনোদনের নতুন সাধন হয়ে উঠে। মুদ্রণের এই নতুন সংস্কৃতির আগমনে উপন্যাস খুব শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

উদাহরণস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকে প্রকাশনার জগতে তামিল উপন্যাসের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য গোয়েন্দা এবং রহস্য উপন্যাস প্রায়শই মুদ্রিত হত। তার মধ্যে কিছু ২২ বারও পুনঃমুদ্রণ হয়।

উপন্যাসের সহায়তায় নীরব পাঠ জনপ্রিয় হয়। বর্তমানে আমরা নীরবে বই পড়ায় এমন অভ্যস্ত হয়েছি যে আমাদের চিন্তা করাও কঠিন হচ্ছে যে, এই অভ্যাস সাধারণত অতীতে প্রচলিত ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং হয়ত বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেও লিখিত বইয়ের সরব পাঠ করা হত যাতে একসাথে সবাই শুনতে পায়। অনেক সময় উপন্যাসও এভাবে পাঠ করা হত, কিন্তু সাধারণত উপন্যাস একা নীরবে পড়াকেই উৎসাহিত করত। ঘরে একা বসে কিংবা রেলগাড়িতে ভ্রমণের সময় লোকে উপন্যাস পড়া উপভোগ করত। এমনকি কোনো জনবহুল কক্ষেও পাঠক উপন্যাস পড়ে এক বিশেষ কাল্পনিক জগতে ডুবে সবকিছু ভুলে যেত। এভাবে উপন্যাস পাঠ করা দিবা স্বপ্ন দেখার মতো ছিল।

চিত্র 20 – কন্নড় পত্রিকা কথাঞ্জলির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা। কথাঞ্জলি ১৯২৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হতে শুরু হয় এবং এতে নিয়মিতভাবে ছোটো গল্প ছাপা হত। চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে এক মা তার শিশুদের একটি বই থেকে গল্প পড়ে শোনাচ্ছে।

4 নারী এবং উপন্যাস

উপন্যাসের প্রভাবে পাঠকরা বাস্তব জগত থেকে সরে কাল্পনিক জগতে চলে যেত যেখানে যা কিছুই ঘটতে পারত, তা নিয়ে অনেক মানুষ উদ্বিগ্ন ছিল তাদের মধ্যে অনেকে সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনে লিখে পরামর্শ দিত মানুষ যেন উপন্যাসের কুপ্রভাব থেকে দূরে থাকে। বিশেষ করে নারী এবং শিশুদের উদ্দেশ্যে এমন পরামর্শ দেওয়া হত : কারণ এমন ধারণা ছিল যে, তারা খুব সহজেই বিকৃতির শিকার হয়।

অনেক পিতামাতা উপন্যাসকে তাদের শিশুদের নাগালের বাইরে ঘরের চিলে কোঠায় লুকিয়ে রাখত। যুব সম্প্রদায় প্রায়শই গোপনে এগুলি পড়ত। এই উৎসাহ কেবল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃদ্ধ মহিলারা - যাদের মধ্যে অনেকেই পড়তে পারত না - তারা তাদের নাতি নাতনিদের কাছ থেকে জনপ্রিয় তামিল উপন্যাসগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনতো। যা ঠাকুরমার গল্পের উলট পুরাণ ছিল।

কিন্তু নারীরা কেবল পুরুষদের লেখা গল্পের পাঠক হিসাবেই থেমে থাকে নি; তারাও শীঘ্রই উপন্যাস লেখা শুরু করে। নারীরা প্রথমদিকে বেশকিছু ভাষায় কবিতা, প্রবন্ধ বা আত্মজীবনীমূলক খণ্ড রচনা করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকে দক্ষিণ ভারতের নারীরা উপন্যাস ও ছোটো গল্প লিখতে শুরু করে। নারীদের মধ্যে উপন্যাসের জনপ্রিয়তার একটি কারণ হল সেখানে নারিত্বের এক নতুন ধারণাকে স্বীকার করে। অনেক উপন্যাসের মূল বিষয় ছিল প্রেম কাহিনী-সেখানে দেখানো হয় নারীরা স্বয়ং তাদের সঙ্গী এবং সম্পর্ক নির্বাচন অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারত। এতে প্রমাণিত হয় যে, নারীদের নিজের জীবনের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিছু মহিলা ঔপন্যাসিকগণ মহিলাদের সম্বন্ধেও লিখে গেছেন যারা নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের জগতকেও পরিবর্তন করেছিল।

বুকেয়া হুসেন (১৮৮০-১৯৩২) একজন সমাজ সংস্কারক, যিনি তার বিধবা হওয়ার পর কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ইংরেজীতে 'সুলতানাস ড্রিম' (১৯০৫) নামক এক বিদ্রুপাত্মক কাল্পনিক গল্প লিখেন। এখানে এক বিপরীত জগতের কথা বলেন সেখানে নারীরা পুরুষদের স্থান দখল করে। তাঁর উপন্যাস 'পদ্মরাগ'এ ও দেখানো হয় নারীরা নিজেদের দ্বারাই নিজেদের অবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছিল।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, নারীদের দ্বারা উপন্যাস লেখা বা পড়া অনেক পুরুষই

নতুন শব্দ

বিদ্রুপ — লিখন, অঙ্কন ও চিত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে গঠন করা এমন বিবরণ যেখানে রসিক ও চতুর ভঙ্গিতে সমাজের সমালোচনা করা হয়।

চিত্র 21 – একজন উপন্যাস পাঠরতা নারী সত্যেন্দ্রনাথ বিশী দ্বারা তৈরি কাঠে খোদাই করা চিত্র।
এই চিত্রে দেখানো হয়েছে কীভাবে নারীরা মজার সাথে পড়া উপভোগ করছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নারীদের বই পড়ার ছবি ভারতের জনপ্রিয় ম্যাগাজিনগুলোতে প্রায়শই দেখা যেত।

উৎস-ক

নারীদের কেন উপন্যাস পড়তে নেই?

১৯২৭ খ্রিঃ প্রকাশিত তামিল প্রবন্ধ থেকে নেওয়া —
'প্রিয় শিশুরা, এই উপন্যাসগুলো পড়বে না। এমনকি তাদের স্পর্শও করবে না। তোমাদের জীবন নষ্ট হতে পারে। তোমরা রোগ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবে। তোমাদের ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছেন — এত কোমল বয়সে প্রাণশক্তি হারানোর জন্য? রোগে আক্রান্ত হবার জন্য? তোমাদের ভাই, আত্মীয় পরিজনদের এবং চারপাশের লোকদের কাছ থেকে ঘৃণা পাওয়ার জন্য? না! না!
তোমাদের অবশ্যই মা হতে হবে; তোমাদের সুখী জীবন যাপন করতে হবে; এটাই হবে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তোমাদের জন্ম হয়েছে এই মহানতম উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, নাকি তোমাদের এই ঘৃণ্য উপন্যাসের পিছনে পাগল হয়ে নিজের জীবন নষ্ট করা উচিত?
থিরু. ভি. কা-এর প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন এ.আর. ভেঙ্কটছলাপতি।

সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই সন্দেহভাজন লোক ছিল। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক এবং বাংলার প্রথম উপন্যাস হিসাবে খ্যাত "করুণা ও ফুলমণির বিবরণ" (১৮৫২) এর লেখক হান্না মুলেন্স তার পাঠকদের বলেন যে, তিনি গোপনে লেখালেখি করতেন। বিংশ শতাব্দীর একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শৈলবালা ঘোষ জায়া শুধুমাত্র এই কারণেই তাঁর লেখালেখি চালিয়ে যেতে পেরেছেন কারণ তার স্বামী তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করতেন। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি যে নারী এবং বালিকাদের উপন্যাস পাঠকে প্রায়শই নিরুৎসাহ করা হত।

বক্স 8

বই হাতে নারী

"আজকাল আমরা নারীদের কালো পাড়ের শাড়ী পড়ে ভারী বই হাতে নিয়ে ঘরের ভেতরে পায়চারী করতে দেখতে পাই। তাদের হাতে বই দেখে অনেক সময় তাদের ভাই বা স্বামী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে - যেন তারা বই-এ দেওয়া কোনো শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা না করে বসে।"

4.1 জাতিপ্রথা, 'নিম্নজাতি' এবং সংখ্যালঘু

তোমরা দেখেছ *ইন্দুলেখা* একটি প্রেম কাহিনী ছিল। উপন্যাসটি লেখার সময় একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল যা ছিল উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। ওটা ছিল কেরালার হিন্দু উচ্চ জাতির বৈবাহিক রীতি সম্বন্ধীয়, বিশেষ করে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ ও নায়ারদের নিয়ে। ঐ সময়ে নাম্বুদ্রীরা কেরালার বড়ো জমিদার ছিল, এবং নায়ারদের একটা বড়ো অংশ ভাড়াটে কৃষক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কেরালায় নায়ারদের ইংরেজি শিক্ষিত এক তরুণ প্রজন্ম, যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় ধন ও সম্পত্তি অর্জন করে, তারা নায়ার মহিলাদের সাথে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ শুরু করে। তারা চেয়েছিল বিবাহ ও সম্পত্তি নিয়ে নতুন আইন তৈরি হউক।

ইন্দুলেখার কাহিনীতে ও এই বিবাদটি প্রকাশ পায়। সুরী নাম্বুদ্রী নামক এক নির্বোধ জমিদার যিনি ইন্দুলেখাকে বিয়ে করতে আসেন তিনি এই উপন্যাসে বিদ্রুপের পাত্র হয়ে উঠেন। বুদ্ধিমতি নায়িকা ইন্দুলেখা তাকে অস্বীকার করেন এবং শিক্ষিত, সুশ্রী নায়ার সম্প্রদায়ের মাধবনকে স্বামী নির্বাচন করেন। তারপর এই যুব দম্পত্তি মাদ্রাজে চলে যান সেখানে মাধবন সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। সুরী নাম্বুদ্রী সঙ্গী পাওয়ার খোঁজে মরিয়া হয়ে, পরিশেষে একই সম্প্রদায়ের এক গরীব মেয়ের সাথে বিবাহ করেন এবং এমনভাব দেখান যে, তিনি ইন্দুলেখাকেই বিয়ে করেছেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে চন্দুমেনন স্পষ্টই চেয়েছিলেন যে, তাঁর পাঠকরা নায়ক এবং নায়িকার নতুন মূল্যবোধের প্রশংসা করবে এবং সুরী নাম্বুদ্রীর অজ্ঞতা এবং নীতিবোধহীনতার সমালোচনা করবে।

'ইন্দিরাবাঈ' ও 'ইন্দুলেখার' মতো উপন্যাসগুলো উচ্চজাতির লোক দ্বারা লিখিত এবং এতে প্রধান চরিত্রগুলো উচ্চজাতিরই ছিল। কিন্তু সকল উপন্যাস এমন ছিল না।

উত্তর কেরালার পাথরী কুঞ্জাম্বু নামক এক নিম্ন জাতির লেখক ১৮৯২ খ্রিঃ 'সরস্বতী বিজয়ম' নামে উপন্যাস লিখেন, যেখানে জাতি নিপীড়নকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়। এই উপন্যাসে দেখানো হয় যে 'অস্পৃশ্য' জাতির এক যুবককে তার ব্রাহ্মণ জমিদারের নিষ্ঠুরতার দরুন গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করতে হয়। সে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করে এবং স্থানীয় আদালতের বিচারকের পদে আসীন হয়ে ফিরে আসে। গ্রামের লোকরা মনে করে যে জমিদার তাকে হত্যা করে ফেলেছে, এবং তারা ইতোমধ্যে আদালতে মামলা দায়ের করে। আদালতের বিচারের ফয়সালা

চিত্র 22 – মালাবার সুন্দরী, রবি ভার্মার আঁকা চিত্র
চন্দু মেনন মনে করেন যে উপন্যাসের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার নতুন প্রবণতার সাদৃশ্য রয়েছে।
ওই সময়ের শীর্ষস্থানীয় তৈল চিত্রশিল্পী ছিলেন রাজা রবি ভার্মা (১৮৪৮-১৯০৬)। চন্দুমেনন তাঁর নায়িকাকে যেভাবে বর্ণনা করতেন তার মধ্যে অনেক চরিত্রই রবিভার্মার চিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত।

হওয়ার পূর্বে বিচারক তার আসল পরিচয় উদঘাটন করে, নাম্বুদ্রী জমিদার অনুতপ্ত হন এবং নিজেকে সংশোধন করেন। 'সরস্বতী বিজয়ম' এভাবে নিম্ন জাতির উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

১৯২০ এর দশক থেকে বাংলায় এক নতুন ধরনের উপন্যাস উদিত হয়, যেখানে নিম্নবর্ণ ও কৃষকদের জীবন বর্ণিত হয়। অদ্বৈত মল্ল বর্মনের (১৯১৪-৫১) 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মল্লদের জীবন কাহিনি তুলে ধরেন। এই মল্ল সম্প্রদায় তিতাস নদীতে মাছ ধরে জীবন ধারণ করত। এই উপন্যাস মল্লদের তিন প্রজন্ম ও তাদের দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে। এর প্রধান চরিত্র অনন্ত নামক একটি শিশুর, যার পিতামাতা বিবাহের রাতেই আলাদা হয়ে যায়। অনন্ত নিজ সমাজ ত্যাগ করে শিক্ষার জন্য অন্য শহরে চলে যায়। এই উপন্যাসে মল্ল সম্প্রদায়ের জীবনধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন-তাদের হোলি এবং কালীপূজা অনুষ্ঠান, নৌকা দৌড়, ভাটিয়ালি গান, কৃষকদের সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ও শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক এবং উচ্চবর্ণের নিপীড়ন। ধীরে ধীরে শহর থেকে আগত নতুন সংস্কৃতির প্রভাবে মল্ল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গান ধরে। তার ফলে মল্লরা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে। মল্ল সমাজ এবং তিতাস নদীর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সমাপ্তি একসাথেই হয় যখন নদী শুকিয়ে যায় তখন মল্ল সম্প্রদায়ও মৃত্যুবরণ করে। অদ্বৈত মল্ল বর্মনের পূর্বেও অনেক ঔপন্যাসিক তাদের উপন্যাসে নিম্ন শ্রেণির লোকদের প্রধান চরিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন। তবে তিতাস এই কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, লেখক নিজেই একজন নিম্ন জাতির মৎসজীবী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

সময়ের সাথে সাথে উপন্যাসের মাধ্যমে এমন সম্প্রদায়কেও স্থান দেওয়া হয়েছে যারা সাহিত্যিক নাট্যমঞ্চে তখনও নজরে আসেনি। উদাহরণস্বরূপ বৈক্কম মহম্মদ বসির ছিলেন (১৯০৮-৯৪) প্রথম দিকের মুসলিম লেখকদের মধ্যে এমন একজন যিনি মালায়লাম ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিলেন। বসিরের প্রথাগত শিক্ষা কম ছিল। তাঁর বেশির ভাগ লেখা ছিল ব্যক্তিগত অনুভবের উপর, কোনো পূর্বের বই থেকে অর্জিত নয়। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় বসির গৃহত্যাগ করে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশে এমন কী আরবে যান, জাহাজে কাজ করেন, সুফি এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের সাথে বসবাস করেন এবং মল্ল যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন।

বসিরের ছোটো উপন্যাস ও গল্পগুলোর কথোপকথন সাধারণ ভাষায় লিখিত। বসির তার উপন্যাসে ব্যঙ্গ কৌতুকের দ্বারা মুসলিম পরিবারের প্রতিদিনের জীবন প্রণালীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতেন। তিনি দরিদ্র, উন্মাদ এবং বন্দিদের জীবন নিয়ে লিখে গেছেন যা মালয়লাম রচনা শৈলীতে এক বিরল ঘটনা।

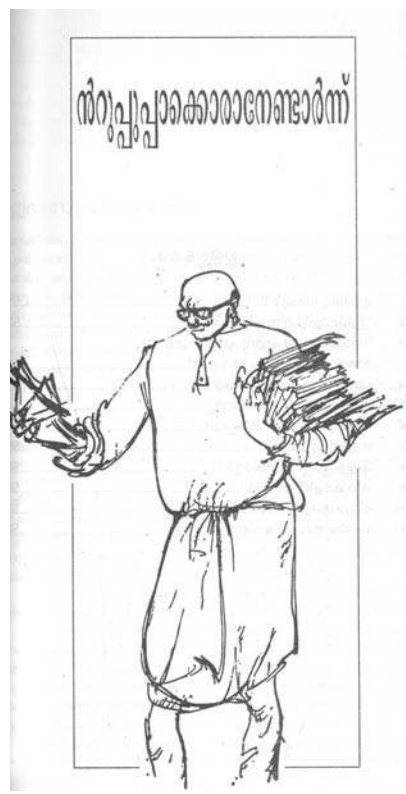

চিত্র 23 – বই বহনরত বসির
লেখক হিসাবে প্রারম্ভিক জীবনে বসির বই লিখে খুব বেশি রোজগার ও জীবনধারণ করতে পারেন নি। তিনি নিজেই নিজের লেখা বই বহন করে বাড়ি বাড়ি ও দোকানে বিক্রি করতেন। বসির তার কিছু কাহিনীতে ঐসব দিনের কথা লিখে গেছেন যখন তিনি নিজের লেখা বই নিজেই বিক্রি করতেন।

5 রাষ্ট্র এবং তার ইতিহাস

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকগণ দ্বারা লিখিত ইতিহাসে ভারতীয়দের দুর্বল, বিভক্ত এবং ব্রিটিশদের উপর নির্ভরশীল হিসেবে বর্ণনা করা হত। এইসব ইতিহাস নতুন ভারতীয় শাসকদের এবং বুদ্ধিজীবীদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এমনকী ইংরেজ শাসনের অধীনে কর্মরত শিক্ষিতরা ও দেবতাদের, অসুরদের চমৎকার এবং অপার্থিব সম্বলিত অতীতের ঐতিহ্যবাহী পৌরাণিক কাহিনিগুলো বিশ্বাস করে নি। এইরকম চেতনা সম্পন্ন লোকগুলোর অতীতকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে যেখানে ভারতীয়দের স্বাধীনচেতা হিসাবে দেখানো যেতে পারে এবং ইতিহাসেও সেরকমই ছিল। উপন্যাস-এর একটি সমাধান প্রদান করে। এতে রাষ্ট্রকে এমন এক অতীতে কল্পনা করা যেত যেখানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র, স্থান, ঘটনা এবং তারিখের উল্লেখ রয়েছে।

চিত্র 24 – 'চেম্মিন' ছায়াছবি থেকে নেওয়া চিত্র।
অনেক উপন্যাসের উপর ছায়াছবি তৈরি হয়। ঠাকাজি শিবশঙ্কর পিল্লাই (১৯১২-৯৯) এর চেম্মিন উপন্যাসটি (চিংড়ি, ১৯৫৬) কেরালার জেলে সম্প্রদায়ের উপর কেন্দ্র করে রচিত এবং উপন্যাসের চরিত্রগণ এই অঞ্চলে মৎস্যজীবি সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন মালয়ালাম ভাষায় কথা বলে। রামু কারিয়াট-এর নির্দেশিত চেম্মিন ছায়াছবিটি ১৯৬৫ সালে তৈরি হয়।

বাংলায় অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাস মারাঠা এবং রাজপুতদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এই উপন্যাসগুলো অখিল ভারতীয় একাত্মতার ধারণার জন্ম দেয়। তাদের কল্পিত রাষ্ট্র দুঃসাহসিক কাজ, বীরতা, প্রণয় এবং ত্যাগে পরিপূর্ণ ছিল — এই গুণগুলো যা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের কার্য্যালয়গুলোতে এবং রাস্তাগুলোতে খুঁজে পাওয়া যেত না। এই উপন্যাস উপনিবেশিতদের প্রত্যাশাগুলোকে বাস্তব রূপ দিতে সুযোগ করে দিয়েছিল। ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৯৪) *অঙ্গুরীয় বিনিময়* (১৮৫৭) হল বাংলায় রচিত প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর নায়ক শিবাজী চতুর এবং বিশ্বাসঘাতক ঔরঙ্গাজেবের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে রত ছিলেন। মান সিংহ শিবাজীকে ঔরঙ্গাজেবের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে রাজি করান। এটা বুঝতে পেরে ঔরঙ্গাজেব শিবাজীকে গৃহবন্দী করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শিবাজী পলায়ন করেন এবং ঔরঙ্গাজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিরে আসেন। এই যুদ্ধে তাঁকে সাহস এবং জিদ যুগিয়েছিল তাঁর এই বিশ্বাস যে, তিনি হিন্দুদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে রত একজন জাতীয়তাবাদী।

চিত্র 25 – কানাড়া চলচ্চিত্র চুমানা দুদি থেকে নেওয়া একটি স্থির চিত্র (চুমার ঢোল, ভি.বি.কারন্থ, কর্তৃক 1975 সালে নির্দেশিত)।
এই চলচ্চিত্র 1730 সালে প্রসিদ্ধ কানাড়া ঔপন্যাসিক শিবরাম কারণ্থ (1902-1997) দ্বারা লিখিত এই একই শিরোনামের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

উপন্যাসটির কল্পিত রাষ্ট্র এত শক্তিশালী ছিল যে, এটা প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রেরণা দিতে পারতো। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২) হল এমন একটি উপন্যাস যেখানে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গুপ্ত হিন্দু সৈন্যবাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে। এটা ছিল এমন এক উপন্যাস যা বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উৎসাহিত করে।

এইরকম অনেক উপন্যাস রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তাধারার বিভিন্ন সমস্যাও প্রকাশ করে। ভারত কী শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দেশে পরিণত হবার কথা ছিল? এই দেশের বাসিন্দা হবার স্বাভাবিক দাবি কাদের ছিল?

5.1 উপন্যাস এবং রাষ্ট্র নির্মাণ

বীরত্বপূর্ণ অতীতকে কল্পনা করার মাধ্যমে উপন্যাস একই রাষ্ট্রের অধিবাসী হবার চেতনাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে। আরেকটি জনপ্রিয় উপায় ছিল উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাতে এই শ্রেণিগুলোকে একই বিশ্বের বিভিন্ন অংশ

রূপে দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে প্রেমচাঁদের উপন্যাসের কথা বলা যায় যেখানে সমাজের সমস্ত অংশের সমস্ত ধরনের শক্তিশালী চরিত্রে পূর্ণ। তাঁর উপন্যাসে অভিজাতবর্গ এবং ভূস্বামীদের মধ্যবিত্ত কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের মধ্যবিত্ত পেশাদার এবং সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা চরিত্রগুলোকে তোমরা দেখতে পাবে। মহিলা চরিত্রগুলো বিশেষ করে নিম্নশ্রেণির মহিলারাও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন এবং তারা আধুনিক ছিলেন না। তাঁর সমসাময়িক অন্য অনেকের বিপরীতে প্রেমচাঁদ প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিবেদনাতুর আকুল আবেশকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর উপন্যাস ইতিহাসের অতীতের গুরুত্বকে না ভুলে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা প্রেমচাঁদের চরিত্রগুলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল একটি সমাজ গঠন করে। তাঁর উপন্যাস রঙ্গাভূমির (দ্য এরিনা) কেন্দ্রীয় চরিত্র সূরদাস তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' সম্প্রদায় থেকে আসা একজন অন্ধ ভিক্ষুক। উপন্যাসটিতে এমন একজন ব্যক্তিকে নায়ক বেছে নেওয়ার কাজটি উল্লেখযোগ্য। এটা দেখায় যে, সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত অংশের লোকরাও সাহিত্যের বিষয় হতে পারে।

আমরা দেখি তামাক কারখানা স্থাপনের জন্য তার জমির জবরদস্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সূরদাস সংগ্রাম করেছেন। গল্প পড়তে পড়তে সমাজ এবং জনসাধারণের উপর শিল্পায়নের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পেরে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। এর ফলে কারা লাভবান হয়? এর জন্য কী বেঁচে থাকার অন্য উপায়গুলোকে উৎসর্গ করার দরকার আছে? সূরদাসের এই গল্পটি গান্ধিজীর ব্যক্তিত্ব এবং ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল।

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত গোদান (গরু উপহার) প্রেমচাঁদের সবচেয়ে জনপ্রিয় কীর্তি। এটা ভারতীয় কৃষকদের উপর লিখিত একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু কৃষক দম্পতি হরি এবং তার স্ত্রী ধানিয়ার হৃদয়বিদারক গল্প। সমাজে ক্ষমতাধর লোক — জমিদার, মহাজন, পূজারি এবং ঔপনিবেশিক আমলাগণ — নিপীড়নের একটি চক্র তৈরি করে তাদের জমি লুঠ করে এবং তাদেরকে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত করে। এত কিছুর পরও হরি এবং ধানিয়া শেষ পর্যন্ত তাদের মর্যাদা ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

কার্যাবলি

গোদান উপন্যাসটি পড়। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর বর্ণনা দাও :

- প্রেমচাঁদ তার উপন্যাসে কৃষকদের জীবনকে কীভাবে বর্ণনা করেন।
- মহামন্দার সময় কৃষকদের জীবন সম্পর্কে এই উপন্যাস আমাদের কী বার্তা দেয়।

বক্স 9

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা উপন্যাসকে আরও বিকশিত করেন। তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ছিল : পরবর্তীকালে তিনি পারিবারিক সম্পর্কের উপর বিভিন্ন গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু ছিল মহিলাদের অবস্থা এবং জাতীয়তাবাদ। এই উভয় চিন্তা তাঁর 'ঘরে বাইরে' (1916) উপন্যাসে দেখা যায়। এটি ১৯১৯ সালে ইংরেজীতে 'দ্য হোম এণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে অনূদিত হয়। এই গল্পটির মূল চরিত্র হল নিখিলেশের পত্নী বিমলা। নিখিলেশ হলেন একজন উদারবাদী জমিদার যিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশের গরিব এবং প্রান্তীয় অংশের লোকদের জীবনকে ধীরে ধীরে উন্নত করার মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু বিমলা তাঁর স্বামীর বন্ধু সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হন যিনি একজন চরমপন্থী। সন্দীপ ব্রিটিশদের উৎখাত করতে এত উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, গরিব 'নীচ' জাতিগুলোর দুর্ভোগ এবং মুসলিমদের বিদেশী হওয়ার বোধ ও তার কাছে কিছুই নয়। সন্দীপের দলে যোগদানের পর বিমলার মনে আত্মমহত্ব এবং আত্মসম্মান জেগে উঠে। রবীন্দ্রনাথ মহিলাদের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হবার অন্তরবিরোধী প্রভাবও দেখান। দলের যুবা সদস্যরা বিমলাকে প্রশংসা করলেও সে তাদের সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে নি। বস্তুত সন্দীপ বিমলাকে আন্দোলনের জন্য চাঁদা তোলার কাজে ব্যবহার করে। রবি ঠাকুরের উপন্যাসগুলো এই কারণে আকর্ষণীয় যে, এগুলো স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক এবং জাতীয়তাবাদ উভয় বিষয়ে আমাদের পুনরায় ভাবতে বাধ্য করে।

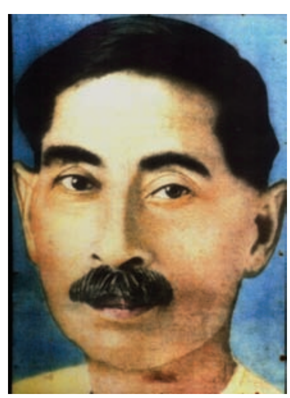

চিত্র 26 – প্রেমচাঁদের প্রতিকৃতি (1880-1936).

উপসংহার

আমরা দেখেছি কীভাবে কালের প্রবাহে পাশ্চাত্য এবং ভারত উভয়ক্ষেত্রে উপন্যাস বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনের অঙ্গো পরিণত হয়। মুদ্রণ প্রযুক্তির উন্নয়ন উপন্যাসকে তার পাঠকদের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেয় এবং পড়ার নতুন পথের পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু উপন্যাসগুলো এমন সব মানুষের জীবনের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করত যারা প্রায়শই শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির পরিচিত ছিল না। আমরা প্রেমচাঁদের উপন্যাসে এগুলোর কিছু উদাহরণ দেখেছি, কিন্তু অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনায়ও এগুলো একইরকমভাবে বর্তমান।

বিভিন্ন শ্রেণির লোকরা একত্রিত হলে একই সমাজের অন্তর্গত হওয়ার অনুভূতি জাগে। এই ঐক্যবদ্ধ সমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপ হল রাষ্ট্র। একথাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, শক্তিশালী এবং দুর্বল উভয় অংশের লোকদের এবং তাদের সংস্কৃতিগুলোকে একসঙ্গো এনে উপন্যাস এই সমাজগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। এরপর আমরা বলতে পারি যে, উপন্যাস অংশীদারিত্বের অনুভূতি তৈরি করে এবং বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন মূল্যবোধ এবং বিভিন্ন সমাজকে বোঝার বা জানার ব্যাপারটি তুলে ধরে। একই সঙ্গো সেগুলো অন্বেষণ করে কীভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের পরিচিতিকে প্রতিফলিত করে অথবা সেগুলোকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে।

সংক্ষেপে লেখো

1. নিম্নলিখিতগুলোর ব্যাখ্যা করো ঃ
   (ক) ব্রিটেনে আসা সামাজিক পরিবর্তনগুলোর ফলে পাঠিকাদের সংখ্যা বেড়ে যায়।
   (খ) রবিনসন ক্রুসোর এমন কী ক্রিয়াকলাপ যে তাঁকে সাধারণভাবে উপনিবেশস্থাপনকারী বলে আমাদের মনে হয়।
   (গ) ১৭৪০-এর পর দরিদ্রতর লোকও উপন্যাসের পাঠকবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু হয়।
   (ঘ) ঔপনিবেশিক ভারতের ঔপন্যাসিকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন।
2. প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সমাজে আসা পরিবর্তনগুলোর রূপরেখা উল্লেখ করো যার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে উপন্যাসের পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
3. নিম্নলিখিতগুলোর উপর একটি টীকা লেখো ঃ
   (ক) উড়িয়া উপন্যাস
   (খ) জৈন অস্টিনের উপন্যাসে মহিলাদের বর্ণনা
   (গ) ‘পরীক্ষা গুরু’ নামক উপন্যাসে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্ণনা

আলোচনা করো :

1. ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে কিছু সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করো যার সম্পর্কে থমাস হার্ডি এবং চার্লস ডিকেন্স লিখেছিলেন।
2. ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এবং ভারত উভয় জায়গায় উপন্যাস পড়া পাঠিকাবৃন্দ সম্পর্কে যে চিন্তার উদয় হয় এই বিষয়ে সংক্ষেপে লেখো। এ থেকে মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কী জানা যায়?
3. ঔপনিবেশিক ভারতে উপন্যাস কীভাবে উপনিবেশ স্থাপনকারীর পাশাপাশি জাতীয়াবাদীদের জন্য কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছিল?
4. ভারতের উপন্যাসগুলোতে জাতিগত সমস্যা কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় বর্ণনা করো। যে কোনো দুটি উপন্যাসের উল্লেখ করে তৎকালিন সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে তারা যে উপায়গুলোর মাধ্যমে পাঠকবর্গকে চিন্তা করার প্রেরণা যুগিয়েছিল তা আলোচনা করো।
5. ভারতীয় উপন্যাসগুলো যে উপায়গুলোর মাধ্যমে সর্বভারতীয় একাত্মতার চেতনা সৃষ্টি করতে চেস্টা করেছিল তা আলোচনা করো।

প্রকল্প :

কল্পনা করো যে, 3035 খ্রিস্টাব্দের তুমি একজন ঐতিহাসিক। তুমি এইমাত্র দুটি উপন্যাস দেখেছ যেগুলো বিংশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল। এই উপন্যাসগুলোতে ঐ সময়ের সমাজ এবং রীতি নীতিগুলো সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়?